এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস:

তীর্থাঞ্জলি

ত্রিপিটক সূত্র

জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি

নারায়ণ চক্রবর্তী

১৯৩৩

কলকাতা

অ্যাল্ফা-বিটা পাবলিকেশন্স্

উৎসর্গ

সাহিত্যিকাগ্রগণ্য শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র

করকমলেষু

সূচীপত্র

× আদর্শ
×
×
×
×
×
×
×
×
×

নিরবচ্ছিন্ন বেকার জীবন যাপন করছি আজ তিন মাস। রোজ ক' ক্রোশ হাঁটতে হয় কে জানে, তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে পদযুগলের করুণ বিলাপ মূর্ছিত সুরঝঙ্কারের মত মনের প্রান্তে গুমরে মরে। জামা আর গেঞ্জী, গায়ের ঘামে ভিজে ভিজে জবজবে হয়, শুকোয় আবার গায়েই। সাবানকাচা জামা—নুন খেয়ে খেয়ে কর্ কর্ করতে থাকে, পিঠ আর বুকের কাছটাতে কালশিটে পড়ে, ফুটো ফুটো হয়ে আসে। ওরা ত নিষ্প্রাণ—এত ধকল ওরা সইবে কেন?

ক্লান্ত দেহে আর হতাশ মনে রোজই সন্ধ্যায় তাই খোঁজ করি হেদোর পার্কে একলা নিরিবিলি বেঞ্চির। রাত্রির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে দিনের পরাজয়ের ক্ষণটিতে ভাল লাগে—কাঠের আসনে বসে চোখ দুটোকে উধাও করে দিতে অট্টালিকা-অরণ্যের শীর্ষে, মেঘের গহনে, সেখানে ফুটে ওঠে লজ্জারুণ শ্রান্ত দিনের কপোল-আভা; বেদনা-গাঁথা মৃত্যু-মুহূর্ত।

সুরু হয় নানান দার্শনিক তত্ত্বের আনাগোনা মনের মাঝে। আদিম মনুষ্য-সমাজে ক্লেশ ছিল সত্য, ছিল বটে নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক সংগ্রাম প্রকৃতি আর তার সন্ততিদের সঙ্গে, কিন্তু তাতেও ছিল একটা

JLR—2

শৌর্যের দীপ্তি। ছিল না তাদের পদে পদে মনুষ্যত্বের হোঁচট খাওয়া পথ, আত্ম-অবমাননার পরিবেশ, কলঙ্কময় নিষ্ফল সংগ্রাম।

একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ এসে আমার পাশে বসেন প্রায় রোজই। হাতের মোটা লাঠির ওপর থুতনি চেপে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকেন নিশ্চুপ। তাঁর দৃষ্টি যে শুধু বাইরেই নয়, সে যে ডুব দিয়েছে তাঁর অন্তরের গভীরে, সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় নি আমার। চার দিকে কোলাহল চঞ্চলতা, নানা লোকের আনাগোনা। এর মাঝে বৃদ্ধ তাঁর মানসিক প্রশান্তির মাঝে ডুব দিয়ে থাকেন, কিছুই স্পর্শ করে না তাঁকে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। রাজপথে জ্বলে ওঠে আলো। বিপণির আলোক-সজ্জা চোখ ধাঁধিয়ে দেয় উগ্রসজ্জা আধুনিকার মত। সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চলের আড়াল থেকে কখন যে রাত্রি তার কালো হাত বাড়িয়ে বিশ্বচরাচরকে তার প্রকাণ্ড থাবায় পুরে নেয় তা থেকে যায় অজানা। ধোঁয়া আর ধুলো তারা-মিটমিট আকাশকে ঢেকে দেয় একটা পাতলা আস্তরণে। আরও পরে যান ও জনবিরল হয়ে আসে নিশীথের রাজপথ—কোথায় বহু দূরে, কলগুঞ্জিত মহা-নগরীর উর্ধে মহাশূন্যে বাজতে থাকে কিন্নরদলের বীণ, তারই মোহময় রেশে তন্দ্রা নেমে আসে মহানগরীর দুই চোখে। বৃদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়েন, তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে যান গেটের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে। আমিও উঠি। কম্পিত পদে এগোই ক্ষুধা-খিন্ন, তৃষা-জীর্ণ দেহে।

এমনি এক শরৎ-সন্ধ্যায় বসে ছিলাম আমার নির্দিষ্ট আসনে মানুষের মনুষ্যত্বহীন ব্যবহারে জর্জরিত মন নিয়ে—সভ্যতার রথ-

চক্রপিষ্ট মন, ডালহৌসী স্কোয়ারের অন্ধ দেয়ালে মাথাকোটা মন। আসন্ন সন্ধ্যার মন্দ পবন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল দেহে। কিন্তু মন? অস্ত-সূর্যের রক্ত-আভা কি আমার মনের জ্বালাময়ী শিখার চেয়েও রক্তিম?

বৃদ্ধ হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তুমি কি কাছেই কোথাও থাক?'

একটা ধাক্কা খেলাম যেন। যাঁর নীরবতাতেই চির অভ্যস্ত তাঁকে সহসা মুখর হয়ে উঠতে দেখে জবাবের অভাবে পড়লাম—একটু সামলে নিয়ে বৃদ্ধের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলাম—'হ্যাঁ, এই গ্রে স্ট্রীটের মোড়েই থাকি আমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন তিনি আমার আপাদমস্তক—মলিন পরিচ্ছদ, বিশৃঙ্খল বেশ আর রুক্ষ শীর্ণ দেহ। উনবিংশ শতাব্দীর সহজ সরল সুখী চোখ পড়ল যুদ্ধোত্তর বিংশ শতাব্দীর ক্লিন্নধূসর শোণ পাংশু চোখে। বিহ্বল হ'ল তাঁর দৃষ্টি। বললেন—'কাজকর্ম?'

'তারই সন্ধানে লেগে আছি সারাটি দিন।' উত্তর দিলাম আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ আবার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর অর্ধ স্বগত বললেন—'কি দিনই এসেছে। ভারতমুকুট বাঙালী সমাজের কি দুর্দিন! অথচ আমাদের যৌবনে কি দিনই না ছিল! কোথায় মিলিয়ে গেল সেই স্বর্ণ-মুহূর্তগুলি?'

একাল-সেকালের চিরাচরিত পক্ষপাতমূলক আলোচনা শুনবার আশঙ্কা নিয়ে কান খাড়া করে চুপ করে রইলাম আমি।

বৃদ্ধ সেদিক দিয়ে গেলেন না। ধরলেন নূতন সুর। 'নিষ্ঠা

দেখিনে কারুর আদর্শের প্রতি, দেখিনে আর কঠোর ত্যাগ, তপশ্চর্যা। ক্ষুদ্র স্বার্থের সহজ পথে মগ্ন সবাই।' বলে দু'হাতে লাঠিটি ধরলেন শক্ত করে।

একটু উষ্ণ হয়ে উঠলাম মনে মনে। আদর্শ! দিন আর রাত্রির চব্বিশটি ঘণ্টা যাদের ব্যয় হচ্ছে শুধু দুটি অন্ন খুঁটবার প্রাণান্ত প্রয়াসে, তাদের কাছেই আবার আদর্শের দাবি! আদর্শ ত তৃপ্ত দেহমনের অলস-বিলাস, শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জঘন্য প্রয়াস। সংগ্রামী জনগণকে ভোলাবার ইষ্টমন্ত্র। মনের মধ্যে কথাগুলো টগবগ করে ওঠে ফুটন্ত জলের মত, আর তারই বিষাক্ত বাষ্পজালে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে মন। নিরুপায় ক্রোধ জ্বলে উঠে জ্বালায় শুধু আমারই হৃদয়কে। শুষ্ক, রসহীন সে হৃদয় জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে। কিন্তু মশাল হয়ে ওঠে না, পারে না আর কাউকে জ্বালাতে।

বিনা ভূমিকায় অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলতে থাকেন বৃদ্ধ। নিরুৎসুক মনে শুনে চলি আমি সে কাহিনী :—

"সে আজ কত কাল! কলেজে পড়ি আমরা তিনজনেই। পড়ি একই ক্লাসে, থাকি একই মেসে, একই ঘরে। শুধু বন্ধুত্ব বললে খুব কমই বলা হবে। সমপ্রাণতা আর প্রীতির বাঁধন, কোমল কিন্তু দৃঢ়, বেঁধে ছিল কঠিন ভাবে—তিনটি হৃদয়কে।"

একটু থেমে রাস্তার ওপাশে দোতলা বাড়ির ছাতের ওপর দিয়ে চালান করে দিলেন তাঁর দৃষ্টি—নীরব নীল নিথর শূন্যে, অসীম আকাশে। স্নিগ্ধ প্রীতি উছলে উঠল সে দৃষ্টি থেকে। মুখে ছড়িয়ে পড়ল অজানা আলোক-আভা।

"আমরা তিন জনেই ছিলাম গভীর ভাবের যুবক। অগ্নিযুগের অগ্নিহোত্রীদের প্রেরণালব্ধ মনে কল্পনার ছবি আঁকতাম নানারকম। হয়ত ছিল তা অবাস্তব-ঘেঁষা, হয়ত বা ছিল অলভ্য সুদূর। তবু তা ছিল বলিষ্ঠ মধুর। প্রাণ-প্রাচুর্য, জীবন-রস-সিঞ্চিত তাজা ফুল।

এমনি এক সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের ছাতে বসে আমরা তিন জন। চার দিকে অট্টালিকার অরণ্য, জনতার সমুদ্র। এখানে-ওখানে অন্ধকার কালো কালো গাছ। কাছে দূরে অগণ্য আলোক-মালা। মাথার ওপরে প্রশস্ত আকাশ সীমানাহীন, মৃত পাণ্ডুর চাঁদ, নিষ্প্রভ তারা। ঝির ঝির করে বইছিল একটু হাওয়া। আমাদের প্রাণের মাঝে ফুলে ফুলে উঠছিল একটা অজানা আবেগ। স্তব্ধ নিশীথের মৌন বাণী আমাদের কানে যেন গুনগুনিয়ে শুনিয়ে দিলে আশার গান; নিয়ে এল অজানা এক আলোকের সঙ্কেত।

আলোচনা চলছিল আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। বি. এ. পরীক্ষার পর অবকাশের মসৃণ দিনগুলিতেই এ সব আলোচনা জমত ভাল। আমি ছিলাম চিরদরিদ্র। দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালা ঐ বয়সেই অনুভব করেছিলাম সমগ্র অস্থিমজ্জা দিয়ে, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে। পণ ছিল তাই বড়লোক হবার। চির-অভাব-দুঃখ-উতলা মন ঝুঁকত না অন্য কোন দিকেই।

তাই আমি বললাম—'আমি করব ব্যবসা। আমি সফল করব আচার্য রায়ের স্বপ্ন। ঘুচিয়ে দেব বাঙালীর এই মিথ্যা অপবাদ, মুছিয়ে দেব দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা।'

কুণাল একটু হাসল। ও ছিল জাত আদর্শবাদী। বলল—

'লক্ষ্মী চান অনন্য আনুগত্য। তাঁর উপাসক মন দিতে পারে না অন্য কোন দিকেই। বিত্তবানের নেই অন্য কোন বৃত্তি—ধন-বৃদ্ধিতেই একান্ত লক্ষ্য।'

একটু লজ্জা পেলাম মনে মনে। লক্ষ্মী-উপাসকের স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ মনের চেহারা ফুটে উঠল আমার মানসপটে—তবু চেয়ে দেখলাম তার চোখঝলসানো অতুল ঐশ্বর্যের দীপ্তি, নীলকান্ত বৈদুর্যমণি আলোকিত অম্লান সুন্দর দেহ। এর মধ্যে নাই বা খোঁজ করলাম মনের।

'তুমি কি ঠিক করেছ কুণাল?' প্রশ্ন করলাম আমি।

নীরবে তারা-জ্বালা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ও অনেকক্ষণ। স্বপ্নস্তিমিত হয়ে এল ওর চোখের দৃষ্টি। পাণ্ডুর খণ্ড চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল ওর সমস্ত মুখে। ছাদের ওপর সৃষ্ট হ'ল অপরূপ এক মায়ালোক। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে ও বলল—'আমি করব অধ্যাপনা। জাতিগঠন আমার লক্ষ্য।'

ওর কথার জন্য নয়, ওর গলায় যেন কোন এক অনির্বচনীয় সুর বেজে উঠল, শুনে রোমাঞ্চিত হ'ল সমস্ত দেহ আমার।

'জানি এতে মান নেই, নেই খ্যাতি। আছে শুধু দারিদ্র্য আর আর দুঃখ। কিন্তু এ ছাড়া সত্যিকারের দেশসেবার আর পথও নেই।'—আমার চোখে চোখ রেখে বলল কুণাল।

কুণাল বড়ঘরের ছেলে। ওর বাবা মৈমনসিংহের একজন ছোটখাটো জমিদার। তাই ওর মুখে দারিদ্র্যের উল্লেখে আশ্চর্য হলাম একটু।

ও যেন আমার মনের কথাটি পাঠ করল, বলল—'আশ্চর্য হচ্ছ?

এই নিয়েই ত বাবার সঙ্গে আমার বিরোধ। বাবাকে জান ত, ভীষণ তেজী আর জেদী। তাঁর আদেশ, এম-এর পর ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত যাওয়ার। এম-এ আমি পড়ব ঠিকই, তবে বাংলায়, তারপর পারি ত সংস্কৃতে। বাবা ত এ কথা কানেই তুলতে চান না। অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার কতদূর গড়াবে বলা যায় না। মা থাকলেও বা একটু ভরসা থাকত, কিন্তু সেদিকেও ত ফর্সা।'

একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল কুণাল।

পিতা-পুত্রের মতান্তরের আভাস জানা ছিল আমার। কিন্তু তা যে এমন একটা সঙ্কট সৃষ্টি করেছে তা ভাবি নি কখনো। শঙ্কিত হলাম কুণালের ভবিষ্যৎ ভেবে।

কনকের ছিল শিল্পী-মন। চুপচাপ বসে শুনছিল সব এতক্ষণ। এবারে বলল.—'আমি করব সাহিত্য-রচনা। নিপীড়িত মানবাত্মার অনন্ত জিজ্ঞাসাকে আমি দেব মুক্তি। পথহারাকে আমি দেখাব পথ। আমি হাঁটব না কাব্য-বীথির কুসুম-ছড়ানো পথে, কণ্টকময় মরু-সাহারার মাঝখান দিয়ে হবে আমার যাত্রা, সংগ্রামী জনতার হৃদয়-শোণিত আঁকা পথে।'

এক ফালি চাঁদ তখন অনেক ওপরে। কত ওপরে? ওকে কি ছোঁয়া যাবে কোন দিন ?"

বহুক্ষণ চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইলেন বৃদ্ধ। বর্তমান ছেড়ে মন তাঁর চলে গেছে অতীতের কোন্ তীর্থলোকে—এই ধূলিমলিন কোলাহলমুখর জীবলোকের বহু উর্ধে—মানস অভিসারের পথে, স্মৃতি তীর্থ পরিক্রমায়।

হঠাৎ চোখ খুলে চাইলেন আমার চোখে—আর সে তো চোখ নয়, জানালা ওঁর মনের। এক ঝলক স্নিগ্ধ আলোক যেন ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখে-চোখে। নিরুত্তাপ, নিরহঙ্কৃত, স্নিগ্ধ, শান্ত দৃষ্টি।

"দেখতে দেখতে কেটে গেল বিশ বছর।" আবার সুরু করলেন তিনি,—"কঠিন হৃদয়া শ্রীমতী লক্ষ্মী, দুরূহ-সাধনাকামী। দুষ্প্রাপ্য তাঁর পূজা-উপচার, কঠিন তাঁর বোধন-মন্ত্র। কঠোর সাধনায় মগ্ন রইলাম অনুক্ষণ, কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত হলাম না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বেদনাহত মনে চেয়ে দেখলাম, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকুই দেবী গ্রহণ করেছেন তাঁর অর্ঘ্যরূপে।

কলকাতায় ফিরলাম অনেক দিন পরে। যাকে দেখেছিলাম বালিকা, সে আজ পূর্ণ-যৌবনা। প্রস্ফুটিত পদ্মকলির গন্ধে-আকুল মধুকর-গুঞ্জনের শেষ নেই। কয়েকটা দিন শুধু ঘুরে বেড়ালাম। যৌবনের উন্মাদনা যেন ফিরে এল কয়েক দিনের জন্য। খুঁজে বেড়ালাম ওদের চতুর্দিকে।

বিকেলবেলা। ধর্মতলার ভীড়ের ভেতর গা ছেড়ে দিয়ে হাঁটছি এসপ্লানেড অভিমুখে, হঠাৎ কে পেছন থেকে নাম ধরে ডাকল আমায়। পেছনে চেয়ে দেখি এক অকালবৃদ্ধ শীর্ণ ব্যক্তি। পরণে ধুতি, ফতুয়া গায়ে, গলায় চাদর, পায়ে চটি। জীর্ণ কিন্তু পরিষ্কার কোটরগত চক্ষু দুটি জ্বল জ্বল করছে পরিচয়ের দীপ্তিতে। চাউনি দেখে বিস্মরণী কালো পর্দাখানা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলাম—'কুণাল।'

ম্লান হাসি খেলে গেল ওর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে। শান্ত সুরে বলল, —'চিনেছ তা হলে?'

মুহূর্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম দু'জনে। পরে একটু অনুযোগের সুরেই বললাম,—'চেনবার তো কথাই নয়। কোথায় সেই যৌবন-দৃপ্ত ব্যায়াম-কঠিন কুণাল, আর কোথায় এই অকালবৃদ্ধ শুষ্ক শীর্ণ—'

'নর-কঙ্কাল,' যোগ করল কুণাল। বুকে হাত দিয়ে বলল,—'বাইরেরটাই সব নয়, তোমাদের কুণাল বেঁচে আছে এইখানে। আর বেঁচে আছে সে খুব ভালোভাবেই।'

ভাবরাজ্য ছেড়ে বাস্তবে নামি আমি। দ্বিধাজড়িত সুরে বললাম,—'তা তোমার এ কি বেশ?'

'কেন?' উজ্জ্বল মুখে কুণাল বলল,—'শিক্ষাব্রতীর তো এই-ই একমাত্র বেশ। দরিদ্র দেশের দরিদ্রতম শিক্ষাব্রতী।'

মনে পড়ল অদ্ভুত আর আশ্চর্য এক সন্ধ্যার কথা। দূর অতীত হারিয়ে-যাওয়া অতিপ্রিয় একটা সুর যেন মৃদু গুঞ্জরণ তুলল মনের বাঁধা তারে। একটা আবেশে ভরে উঠল মন।

'শিল্পীর খবর কি, কুণাল?'—বলে উঠলাম সহসা।

'সে কি! তুমি কি কিছুই জান না?' ম্লান মুখে বলল কুণাল।

নীরবে মাথা নাড়লাম আমি।

'প্রকাশকদের দুয়ারে মাথা ঠুকেও ওদের কঠিন প্রাণ গলাতে পারল না বেচারা।' অন্যদিকে চেয়ে বলল কুণাল।—ওর নূতন উপন্যাসখানা, যাকে ও নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে ভাবত—আমল পেল না কারু কাছেই। দু' এক জন প্রকাশক রাজী হলেও পিছিয়ে গেল রাজরোষের ভয়ে। এক বেলা আধ বেলা খেয়ে, কোনদিন উপোস দিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী আর অনবসর দিনে অক্লান্ত প্রয়াসের এই দুর্দশা ওর শিল্পী-মনে গভীর আঘাত হানল। ক্রমে

ক্রমে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল ও। যে জনসমুদ্রের মর্মবাণীর ব্যাখ্যান ছিল ওর পণ, সেই জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে এক দিন ভেঙ্গে গেল সে। সমুদ্রের গভীরে যারা থাকে তাদের শাণিত দ্রংষ্ট্রা ছিন্নভিন্ন করল ওর হৃদয়।

কুণালের নিষ্করুণ গভীর কণ্ঠে কেঁপে উঠল আমার বুক। অজ্ঞাত আশঙ্কা-শিহরণে ঝিম ঝিম করে উঠল মস্তিষ্ক। 'শেষে কি হ'ল ওর খুলে বল—' চীৎকার করে উঠলাম আমি স্থান কাল ভুলে।

—'আত্মহত্যা করেছে চলন্ত ট্রেনের নীচে মাথা পেতে দিয়ে' নিষ্প্রাণ সুরে বলল কুণাল।

হৃৎস্পন্দন যেন পলকের জন্য একবার থেকে আবার চলতে লাগল দ্রুততর বেগে। দু'জনেই চুপ করে রইলাম। চলমান জনস্রোত দু'ভাগ হয়ে আমাদের দু'জনার দু'দিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সে স্রোতের ঢেউ মাঝে মাঝে লাগছিল আমাদের গায়ে। সব ভুলে এক বিষণ্ণ বেদনায় ভরে উঠল মন। কোথায় যেন রেডিওতে পূরবী বেজে চলেছে উদাস গভীর সুরে। আমার প্রাণে তুলল তা এক গভীর অনুরণন।

চমক ভাঙলো কুণালের কথায়। 'তুমি তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি,'—আমার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল।—'সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছ তা হলে।'

ইচ্ছে হ'ল না এই প্রতিবেশে আমার সৌভাগ্যের ইতিবৃত্ত ওকে বলি। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম,—'তা তোমার খবর সব বল শুনি। কোথায় আছ, কি করছ? খুব ভাল যে একটা কিছু করছ না, সে তো না বললেও বোঝা যায় স্পষ্ট।'

'ভুলে যেও না এটা যুদ্ধোত্তর পৃথিবী।' মৃদু হেসে বলল কুণাল, —'তার ওপর কমনওয়েলথের আঁচল-ঢাকা ভারত-ভূমিতে বাস। অধুনা পাণ্ডিত্যের দামও নির্ধারিত হয় সুপারিশের জোরে। তাই দু'বার এম-এ পাশ করেও স্কুল মাষ্টারী, তাও আবার বেসরকারী স্কুলে। মাইনে? এর উল্লেখ না করাই ভাল। তবে শুনেছি চটকলের দারোয়ানেরাও আমার চেয়ে বেশী উপায় করে বেতনে আর ভাতায়।'

শুনে আশ্চর্য হলাম একটু, বাংলা-ছাড়া বহুদিন। চমক লাগল এ সংবাদে।

হঠাৎ কুণাল আমার দু'হাত চেপে ধরে বলল,—এখানে দাঁড়িয়ে আর না। চল, আমার কুঁড়ে ঘরটি দেখবে চল। বাসায় বসে আরাম করে সব খবরাখবর নেওয়া যাবে, কি বল কল্যাণ, এ্যাঁ?

আপত্তি করলাম না। ভাল লাগছিল ওর সঙ্গে কথা বলে। ওর মধ্যে বাস করে এক নিঃসীম উদারতা যার জন্য ওর সঙ্গ লাগে ভাল, আর ওর কথায় আছে সমুদ্রের হু হু করা হাওয়ার মত মুক্ত অবাধ গতি, মনের সব আবর্জনাকে নিমেষে করে দেয় দূর।

মাণিকতলার এক বস্তি। অন্ধকার গলিপথ আলো হাওয়ার সম্পর্কহীন। দু'পাশে ছোটবড় বাড়ী, পুরাতত্ত্ববিদ্-আহ্বানকারী। দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটে শুকোবার অজস্র দাগ,—নোনাধরা, বালি-ঝুরঝুর দেয়াল। ড্রেনের গন্ধ, পচা তরকারির খোসার গন্ধ আর মরা ইঁদুরের তীব্র গন্ধ বায়ুস্তরকে করে রেখেছে ভরপুর। আমার অনভ্যস্ত নাসারন্ধ্রে সুগন্ধি রুমাল গুঁজে দিলাম, তাতে ফল হ'ল উল্টো। কুণাল আপন মনে সহজভাবে আগে আগে চলেছে একান্ত নির্বিকার চিত্তে। দেখে দেখে বিস্ময় জাগে আমার। বিংশ

শতাব্দীর সভ্যতা মানুষকে এ কোন্ পূতিগন্ধময় নরকে টেনে এনেছে!

ছোট একতলা বাড়ী। খোলার চাল। এক-ইঁটের গাঁথুনির দেয়াল, একটু বেঁকে, দাঁড়িয়ে আছে তার স্বল্প গভীর ভিতের জোরে কোন রকমে। আকাঠার তেড়াবাঁকা দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। ছায়ান্ধকার কাঁচা এক ফালি উঠান, তার পরে সিমেণ্ট-ওঠা বারান্দা একটুকু। পাশাপাশি দুখানি ঘর আর বারান্দারই খানিকটা ঘিরে রান্নাঘর। দূষিত বায়ুস্তরের অভিযানের কামাই নেই এখানেও। রুখবে কে ওদের?

আসতে আসতে আভাসে শুনেছিলাম কুণালের সব কথা। স্বেচ্ছাচারী পুত্রকে ক্ষমা করেন নি পিতা। পিতার আশ্রয় এবং বিষয় পেল বিমাতার সন্তানবর্গ। নির্বিকার চিত্তে সয়ে গেছে কুণাল এই পরিণতিকেও। লীলাময়ী যে চপলা-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল কুণালের হৃদয়ে, সেও অ-ধরাই রয়ে গেল জীবনে। দরিদ্র শিক্ষকের গলায় মাল্যদান করবে কোন বাস্তবপন্থিনী? তার পিতা এনেছিলেন সরকারী চাকুরীর নিয়োগপত্র, উচ্চ-মহলে তাঁর অপ্রতিহত প্রতাপের সাহায্যে। কিন্তু কুণাল অচল-অটল। এই প্রত্যাখ্যানের ব্যথা নিদারুণভাবে বাজল পিতা-পুত্রীর বক্ষে। প্রেমের সূক্ষ্ম ডোর ছিন্ন করার পক্ষে এই-ই কি যথেষ্ট নয়?

'বসো এই ঘরে, আসছি আমি,'—বলে ডানদিকের ঘরটিতে আমাকে ঠেলে দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল কুণাল। ঘরে একটি মাত্র জানালা বর্তমানে বাইরের ধোঁয়াকে ঘরে আনা ছাড়া আর কিছুই করছিল না। চোখে পড়ল সামনেই একটি তক্তপোষ, ওপরে পাতা জীর্ণ কম্বল একটি। পা মুড়ে বসে পড়লাম তার ওপরে। ঘরের
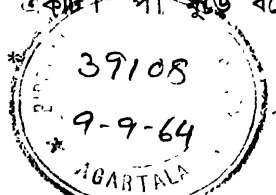
অন্ধকারের সঙ্গে চক্ষুর মিতালি হবার পর চেয়ে চেয়ে দেখলাম দরিদ্রের গৃহশয্যা।

এক কোণে গোটা দুই-তিন ট্রাঙ্ক, একটার ওপর আর একটা রাখা। সম্মুখের দেয়ালে তিনটে তাক, বইয়ে ঠাসা। বই আর বই। নূতন, পুরানো, বাঁধাই, অ-বাঁধাই, মোটা মাঝারি বই সব। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এবার চোখে পড়ল ওদিকের দেয়াল ঘেঁষে সতরঞ্জির ওপর বসে একটি ছেলে—বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, দাড়ি-গোঁফ সমাচ্ছন্ন মুখ, লম্বা বিশৃঙ্খল চুল, ময়লা গেঞ্জী গায়ে এক মনে কি একটা বই পড়ছে চোখের সামনে ধরে। ওর কাছাকাছি, সতরঞ্জির ওপর বিছানো আরও কয়েকখানি বই। ও এমন নীরব, নিশ্চল যে ওর অবস্থিতি অনুভবই করা যায় না ঘরে। কিন্তু এই অন্ধকারে ও পড়ছে কি করে ভেবে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম আমি।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকল কুণাল। 'ইস, কি ধোঁয়া' বলে জানালাটার দিকে তাকাল একবার, তারপর বলল, 'চল, গৃহিণী বা ঘরণীকে দেখবে চল।'

নীরবে ওর অনুগমন করে পাশের ঘরে ঢুকলাম আমরা দু'জন। এ ঘরে দুটো জানালা। আলোও আছে একটু। ঐ রকম তক্ত-পোষ পাতা, তার ওপর ধপ্‌ধপে চাদর পাতা বিছানা, সে বিছানায় শুয়ে কুণালের স্ত্রী।

রোগা লোক যে এর আগে দেখি নি তা নয়, কিন্তু ঠিক এমনটি আর চোখে পড়ে নি আমার। বেতসপত্রের সঙ্গে তুলনা চলে অনায়াসে। একদা-গৌর, শীর্ণ রোগ পাণ্ডুর মুখ, রক্তহীন। চোয়ালের হাড় দুটি ঠেলে উঠছে সামনের দিকে, অক্ষিকোটর নিম্ন-গভীর।

অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশপাশ বালিশের ওপর দিয়ে ছড়ানো। সমস্ত দেহের প্রাণ-রস পান করে চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল, যেন জীবনের জয়-ঘোষণার অনুচ্চার শঙ্খ। নলী নলী হাত দুটো তুলল একটু নমস্কারের ভঙ্গিমায়, অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলল। কুণাল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'থাক্ থাক্, কথা বলতে হবে না তোমাকে।'

শিয়রের খোলা জানালা দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। বস্তির এ দিকটায় একটা জলা। ভাঙ্গা মাটির কলসী, ইট, পাথর আর খোলামকুচিতে আকীর্ণ। ঐ জানালা-পথেই অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মি ওর মুখে পড়ে একটা ক্লান্ত সকরুণ বেদনার আভাস সঞ্চার করেছে। একটু পরে ওর কোটরগত দুই চোখের কোল বেয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বালিশে। কেন, কে জানে? কুণাল ব্যস্ত হয়ে মুছিয়ে দিলে আস্তে আস্তে সযত্নে।

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম এ ঘরে চুপি চুপি। অজানা এক ব্যথার ভাব চেপে বসল বুকের ওপর। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল।

একটু পরেই এল কুণাল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু—বেদনা-ঝরা হাসি। তারপর বলল, 'সেরা রোগ। ভিখিরীর ঘরে রাজ রোগ। রাজকীয় আর কিছু ত হ'ল না জীবনে, তবু যা-হোক একটা সান্ত্বনা যে ঈশ্বর একেবারে ভুলে বসে নেই। রাজ-জনোচিত একটা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর মহা আশীর্বাদ।'

উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এর পরেও ঈশ্বরের কথা বল কি করে তুমি? কোথায় ছিলে, আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ ভাব ত একবার। বিনা অপরাধে কেন এ লাঞ্ছনা, কোন্ পাপের শাস্তি এটা?'

আমার উত্তেজনা দেখে হাসল একটু সে। সে হাসিতে কি ছিল জানি না, কিন্তু লজ্জা পেলাম মনে মনে। একটু পরে বললাম, তা আজকাল ত হাসপাতালে অনেক সুবিধে, সেখানে কোন—

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলে কুণাল বলল, 'তুমি কোন্ রাজ্যে বাস করছ ভেবে পাই না। গরীবের জন্য নামে, কিন্তু কাজে কাদের জন্য একবার সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে দরিদ্র শিক্ষক-পত্নীর একান্ত স্থানাভাব। ঘূনে ধরা সমাজ আর রাষ্ট্র। সুবিচার যে চাও, বিচার করবে কে ?'

এবার একটু উত্তেজিত মনে হ'ল ওকে। পাগল যে হয়ে যায় নি এই আশ্চর্য। অল্পক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইল কুণাল আমার পাশে, তারপর এক সময়ে মাথা তুলে ডাকল, 'অজয় ?'

'আজ্ঞে', বলে উঠে দাঁড়াল অধ্যয়নরত ছেলেটি, উঠে এল আমাদের কাছে।

'আজ তুমি যাও অজয়'—পরম স্নেহভরে ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে কুণাল বলল, 'আজ আমি ব্যস্ত একটু আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে।'

'আচ্ছা', বলে ছেলেটি ধীরপদে বেরিয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে নেমে গেল অন্ধকার গলিপথে।

'এটি কে ?'—প্রশ্ন করলাম কুণালকে।

'ওই ত আমার আশার আলোক।' গভীর সুরে বলে উঠল কুণাল।—'ওই ত বাঁচিয়ে রেখেছে আমার সমগ্র সত্তাকে এই ক্লেদাক্ত পরিবেশের মাঝে। দিক্-চিহ্নহীন নিরাশার গভীর কালো অন্ধকারে ও-ই আমার আকাশ-প্রদীপ। ওটি আমার ছাত্র। গরীব

কিন্তু মেধাবী। প্রবেশিকায় দ্বিতীয় হ'ল। আমাদের স্কুল থেকেই পাশ করল ও। সেই থেকে আমারই কাছে আসে রোজ সন্ধ্যায় পড়তে। ওদের সঙ্কীর্ণ ঘরে পড়বার জায়গাটুকুও নেই, রাত্রে জ্বালাবার কেরোসিনটুকুও ওদের সংসার অপব্যয়। আমিই পড়াই ওকে। আমার মনের মত করে গড়ে তুলেছি ওকে। আমার শিক্ষক-জীবনের একমাত্র সাফল্য অজয়, একমাত্র গর্ব।'

আবেগে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল কুণালের। একটু থেমে বলল, 'এবার এম-এ-তে প্রথম হয়েছে বাংলায়, এখন পড়ছে সংস্কৃতে।'

অজানা এক আলোর দ্যুতিতে জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল কুণালের দুই চোখ। তার ভেতর কি দেখতে পেলাম আমি? অবিনশ্বর মানবাত্মার নিয়ত ঊর্ধ অভিযান—নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্লেখাঙ্কিত দীপ্তপথে, পরম শ্রেয়ের অভিমুখে।"

চক্ষু বুজে মৌন হয়ে রইলেন বৃদ্ধ বহুক্ষণ। আমি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তারাভরা আকাশের দিকে। নিষ্ফলতার যত গ্লানি সব যেন মন থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। চেয়ে রইলাম বহু দূরদূরান্তের নীহারিকাপুঞ্জের দিকে, যেখানে চলছে নূতন নূতন সৃষ্টির লীলা। অসীম এ ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোণে পড়ে রয়েছে এ পৃথিবী? আর মানুষ?

× পূর্বরাগ
×
×
×
×
×
×
×
×
×

১

লক্ষ লক্ষ লোকের শহর কলকাতা। এত মানুষের পায়ের চাপে সমুদ্রের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনা নরম মাটি যে ফেটে যায় না, ধ্বসে পড়ে না, এটাই আশ্চর্য। কিন্তু এতো লোকের মাঝখানে থেকেও যে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের পরিমণ্ডল রচনা করে তার ভেতরে কেউ বাস করতে পারে তাও কম আশ্চর্যের নয়।

কিন্তু তাই করে চলেছে অলক আজ বিশ বছর ধরে। নারী-সমাগম-মুখর রেডিও ষ্টেশন আর নারীবর্জিত গৃহকোণে, এ দু-এর বাইরে যে বিচিত্র রসের অফুরান মিছিল চলেছে তার দিকে তাকিয়েও দেখে না অলক। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিরাসক্ত যোগীর মতো। সেই বিশ বছর আগে মনের যে দুয়ারটি বন্ধ করে দিয়েছে আজও সেই দুয়ার তেমনি ভাবেই বন্ধ আছে। কিঙ্কিণী সিঞ্জিত যে দুটি কোমল করাঘাতে এ দুয়ার খোলার কথা তা গেছে পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে।

কিন্তু স্মৃতির কুসুম মনের ভেতর গন্ধ বিলায় আজও। কস্তুরী মৃগের মতো সে গন্ধে যেন পাগল হয়ে যায় অলক। চেষ্টা করে বিস্মৃতির অন্ধকারে সবকিছু বিলীন করে দিতে। কিন্তু কোনো

ফল হয় না। হৃদয়ের পুরাতন ক্ষতগুলি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। ঝর্ণার দীর্ঘ চোখের যে চকিত চাহনী বিদ্যুতের মতো তার মনের ভেতর জ্বলে উঠে তার হৃদয়কে আলোয় আলোময় করে তুলেছিল একদিন, অন্য এক দুর্যোগময় দিনে সেই আলো নিভে গিয়ে তার হৃদয়কে চিররাত্রির অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। আর সেই বিদ্যুতের দাহ তার মনের ভেতরে দগ্‌দগে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

সেই দিনগুলির তীব্র অসহ্য সুখ আর অসহ দুঃখ এই দুই বিপরীতের মাঝখান দিয়ে অলকের মনের পেণ্ডুলামটি দোলে।

প্রৌঢ়ত্বের উন্মুক্ত তোরণ দেখা যাচ্ছে সুমুখে।

পেছন দিকে যৌবনের ধূধূ করা দিনগুলি ধূসরতায় মাখা। তার মাঝে একটি মাত্র শ্যামল পত্রগুচ্ছ—ঝর্ণার উজ্জ্বল দুটি দীর্ঘায়াত চোখ, যে চোখের গভীরে ডুব দিয়ে অলক আবিষ্কার করেছিল নিজের প্রেমিক সত্বা, চৈতন্যের আলোকে সে উপলব্ধির প্রথম শিহরণ যেন আজও তার রোমাঞ্চিত দেহের প্রতি রোমকূপ দিয়ে অনুভব করে সে। এক অপরিজ্ঞাত তীব্র আনন্দে হাওয়া-লাগা বেতসপত্রের মতোই কাঁপতে থাকে, দুলতে থাকে তার মন। কালের স্রোতের উজান বেয়ে মন চলে যায় কোন সুদূরে।

শান্ত শহর, নিরিবিলি শহর ঢাকা। বুড়িগঙ্গার মতো বুড়িয়ে যায় নি কিন্তু তার অঙ্গের সজল স্নিগ্ধতাটুকু মেখে নিয়েছে নিজের সর্ব অঙ্গে। তার প্রশস্ত বুকের উদারতাটুকু ছড়িয়ে আছে সারা রমনা মাঠের আশ্চর্য সবুজ বিস্তারে।

নবাবপুর রোডের ওপর দোতালা বাড়ি। রাস্তার দিকের ছোট

ঘরখানাতে বসে পড়া তৈরি করছিল অলক। কেমিষ্ট্রির বই খুলে এক মনে পড়ে যাচ্ছিল টার ডিষ্টিলেশন প্রোসেস। রাস্তার ওপারে লালুপালের ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যারতির বাদ্যভাণ্ড এইমাত্র থেমে যাওয়াতে একটা তীক্ষ্ণ স্তব্ধতা ঘনিয়েছে ঘরের ভেতরে।

"আসেন দিদি—এই ঘরটা বেশ খোলামেলা আছে, এই ঘরে বসেন আইসা।"

মার গলা শুনে আর আপ্যায়নের ঘটা দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অলক। মার সঙ্গে একটি অপরিচিতা আধাবয়সী মহিলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অলকের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

"অরে চিনলেন না?" হাসির সঙ্গে বলতে থাকেন অলকের মা—"ও হইল অলক—আমার বড়ো পোলা।"

"ওমা এই নাকি অলক!" বিস্ময় প্রকাশ করে মহিলাটি বলেন; "কতটুকু দেখছিলাম—এখন কত বড় হইয়া গেছে।"

"খাড়াইয়া আছস্ ক্যান্ অলক? আয় প্রণাম কর আইসা। তোর শুচি মাসিমারে প্রণাম কর—" অলকের মুখের দিকে তাকিয়ে অলকের মা সুনন্দা বলেন।

অলক এগিয়ে যায়, অপরিচিতা শুচি মাসিমার পায়ে হাত দেবার জন্য নত হয়।

"থাউক, থাউক, আর প্রণাম করতে হইবো না।" বাধা দিয়ে শুচি বলেন,—"বাঃ! দিব্যি পোলাখান তোর নন্দা—এখনো পড়ে বুঝি?"

খুশীর উজ্জ্বল আলো পড়ে সুনন্দার মুখে, ঝলমল করতে করতে

তিনি বলেন, "বি-এস-সি পাশ কইরা এখন এম-এস-সি পড়তাছে।"

পাশের ঘর থেকে কে যেন হাওয়ায় উড়তে উড়তে এসে শুচির পিঠ ঘেঁসে দাঁড়ায়। অলক লক্ষ্য করে, বড়ো বড়ো দুই চক্‌চকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে একটি বছর আঠারোর সুন্দরী মেয়ে।

চোখাচোখি হতেই অলকের ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে কালো আকাশের গায়ে ফুটে-ওঠা উজ্জ্বল কয়েকটি তারার দিকে তাকায় সে মেয়েটি।

তার হাত ধরে তাকে সামনে টেনে আনেন শুচি, বলেন, "এই হইল আমার বড় মাইয়া ঝর্ণা, ইডেন কলেজে ভর্তি কইরা দিছি। কিন্তু পড়ায় এক্কেবারে মন নাই, বই দেখলেই গায়ে জ্বর আসে।"

"আসে তো বেশ হয়," অলকের সামনে এ ভাবে অপদস্থ হয়ে কুপিত চোখে কটাক্ষ হেনে ঝর্ণা বলে, পর মুহূর্তে পাখা-মেলা পাখির মতো উধাও হয়ে যায়।

চুরি করে ঝর্ণার আরক্ত, রুষ্ট, অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অলক, তাকিয়ে দেখছিল, মার ওপর রাগ করে ছুটে চলে-যাওয়া ঝর্ণার উড়ন্ত বেণী, কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে। ঝর্ণার ঐ বেশ কথাটির রেশ অনেকক্ষণ ধরে সুরের ঝঙ্কার তুলতে থাকে তার মনে।

"পাগলী মাইয়া," হেসে স্নেহ ও প্রশ্রয়ের সুরে শুচি বলেন, "চল দেখি নন্দা, কোন্ দিকে গেল, খুঁইজা দেখি গিয়া।"

সবাই চলে যেতে ফাঁকা ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অলক, তার পর আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে গিয়ে

বসে।

খোলা বইয়ের পাতায় চোখ দুটো নিবদ্ধ থাকলেও এলোমেলো মনে পড়া এগোয় না। একটা হঠাৎ-আসা হাওয়া যেন তার মনকে নাড়া দিয়ে গেছে—স্থির হতে চায় না চঞ্চল মন।

ভেতরে বসবার ঘরে তখন চা-এর টেবিলটা ঘিরে বসে ঝর্ণা, শুচি ও সুনন্দা নানা কথায় মুখর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হাসির ধাক্কায় ঘরের বাতাস কাঁপতে থাকে।

উঠে ওদের সঙ্গে যোগ দেবার হাজার ইচ্ছে থাকলেও উঠতে পারে না লাজুক ছেলে অলক। খোলা বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে রাস্তার ওপারের রামধন পসারীর আদি পাঁচনের দোকানের বিরাট সাইন বোর্ডটার দিদে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে ওঁদের যাবার জন্য পাল্কী-গাড়ী ডেকে আনে অলক। গাড়ির গরম গদীতে বসে জানালা দিয়ে অলকের মুখে এবার তাকায় ঝর্ণা, ঠোঁট দুটি অল্প হাসির আভাসে কেঁপে ওঠে।

জিজ্ঞাসা করি করি করেও মাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না অলক। রাত্রে বাবার সঙ্গে খেতে বসে আগন্তুকদের পরিচয় পায় সে। ইলিশ মাছের ঝোলের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে সুনন্দা বলেন, "আইজ কে আইছিল বেড়াইতে, কও তো?

"দেখি নাই যখন তখন কেম্‌নে কমু কও?" দাঁতের ফাঁকে আটকে ধরা ইলিশ মাছের সরু কাঁটা বার করতে করতে অলকের বাবা শ্যামল বলেন।

"শুচিদি আর তার মাইয়া ঝর্ণা—" রহস্যময় সুরে বলেন সুনন্দা।

"তাই নাকি?" খুশীর ছোঁয়া লাগে শ্যামলের কথায়, "আমি

না আসা পর্যন্ত ধইরা রাখতে পারলা না?'

"সময় থাকতে তুমিই যারে ধইরা রাখতে পারলা না, তারে আমি কেমনে আটকামু কও?" যেন অলকের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়েই প্রগলভ সুরে বলে ওঠেন সুনন্দা।

আড়চোখে অলকের নত মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যান শ্যামল। ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে থাকেন সুনন্দা।

আর কোনো কথা হয় না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে আঁচাবার জন্য উঠে যান শ্যামল। তাঁর পাতে নিজের ভাত বেড়ে নেন সুনন্দা।

অপরিচয়ের রহস্যময় কালো পর্দার রং অনেকটা ফিকে হয়ে আসে অলকের কাছে।

২

ঝর্ণার বাবা প্রবীর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, হালে বদলী হয়ে এসেছেন ঢাকায়। বাসা করেছেন কায়েৎটুলিতে। বাইশ বছর পরে ঢাকায় এসে প্রথম ক'দিন সারা শহর চষে বেড়ালেন শুচি। জানা, চেনা ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মর্চে-পরা পরিচয় নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন। দু'দিন এলেন অলকদের বাড়ী বেড়াতে।

এর পর যার ক্রমাগত তাগাদার হাত থেকে বাঁচবার আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে মাকে নিয়ে ঝর্ণাদের বাসায় যেতেই হয় অলককে।

দরজা খুলেই সুমুখে সুনন্দাকে দেখে খুশীর আলো ছড়িয়ে পড়ে শুচির সারা মুখে, বলেন, "একলা যে? তোর কর্তা কই?"

"কর্তার আশায় বইসা থাকলে তো আর আসা হয় না, তাই কর্তা ছাড়াই আইসাম দিদি—" ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সুনন্দা

বলেন।

"ও, শ্যামলদার বুঝি পায়া ভারী হইছে—গরীবের বুইলা আসতে চায় না এইখানে—" ভারী হয়ে ওঠে শুচির কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করেন সুনন্দা, "না না দিদি, সেই কথা না। আসলে সময়ই পান না মোটে—একা মানুষ, ব্যবসার সমস্ত কাজকর্ম নিজেরই দেখন লাগে—নাইলে আপনের লগে দেখা করবেন খুব ইচ্ছা তাঁর—।"

মুখ অন্ধকার করে শুচি বলেন, "তুই আর তারে কতটুকু চেনস্ নন্দা—এতটুকু বয়েস থেকেই চিনি আমি শ্যামলদারে—আমি জানি, শ্যামলদা কোনো দিন পাও দিব না এই বাড়ীতে। যাউক গিয়া সে সব পুরাণ কথা—আয় উপুরের ঘরে বসি গিয়া—ওমা, এ কি, অলক দেখি দূরে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া আছে?"

"দেখেন দিদি, দেখেন—পুরুষমানুষের কি এত লাজুক হওয়া ভাল?—" বসতে বসতে হাতছানি দিয়ে অলককে আসতে ইঙ্গিত করেন সুনন্দা।

তিন জনে সিঁড়ি বয়ে দোতলায় উঠে যান।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হারমোনিয়ামের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল অলক। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ঝর্ণার গলা-সাধা শুনতে পায়।

"বাঃ, কি সুন্দর মিষ্টি গলা—কে গাইতাছে দিদি? ঝর্ণা, না?" মুগ্ধস্বরে বলে উঠেন সুনন্দা।

"হ, ঝর্ণাই—" সিঁড়ি-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর একটু দম নিয়ে শুচি বলেন, "গান গান কইরা একেবারে পাগল আমার মাইয়া,

তোর জানাশোনার মইধ্যে ভালো গানের মাষ্টার আছে ?"

সুনন্দা একবার অলকের নিবিষ্ট নতমুখের দিকে তাকান, তার পর ফিস্ ফিস্ করে শুচির কানের কাছে বলেন, "শিখাইতে চাইলে তো অলকই শিখাইতে পারে কত গান, তবে রাজি হইব কি না কইতে পারি না। মাইয়ালোকের কাছে অ-র বড় লজ্জা—"

"ওমা, তাই নাকি ?" খাটো গলায় শুচি বলেন, "রাখ, ঝর্ণারে লুলাইয়া দেই গিয়া। মজা দেখিস্ তার পরে—"

সুনন্দা ও শুচি পাশের ঘরে বসে গল্প করছেন। এ ঘরে একা বসে আছে অলক। রাস্তার দিকের খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার ওপারের রেল লাইন দেখা যায়, তার ওপারে বহু দূর বিস্তৃত ঘন সবুজপ্রান্তর। একটা গাছের ডালে দুটো বাঁদর বাচ্ছা লম্ফ-ঝম্প করছে আর মুখ দিয়ে কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করছে। তন্ময় হয়ে তাই দেখছিল অলক।

পেছনে খুক্ খুক্ হাসির শব্দ শুনে চম্‌কে ঘাড় ফেরায় অলক। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল গুঁজে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে ঝর্ণা, অলক মুখ ফেরাতেই বলে ওঠে, "কি শুনতাছেন— বান্দর-সঙ্গীত ?"

হাসির আভায় রাঙা ঝর্ণার মুখ আর তার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দীপ্তি দেখে চোখ নামিয়ে নেয় অলক। কি বলবে ভেবে পায় না।

এগিয়ে এসে পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে অল্প ব্যবধানে বসে বসে পড়ে ঝর্ণা, তারপর ভনিতা ছেড়ে সোজাসুজি বলে ওঠে,

"মাসিমার কাছে শুনলাম যে ভালো গান জানেন আপনে?"

"কে কইছে, মা?" মৃদুস্বরে অলক বলে।

"হু—"

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে অলক বলে, "ভাল কি না কইতে পারি না, তবে চর্চা আছে অল্প-স্বল্প—"

আনন্দে ঝর্ণার দু' চোখের তারা নাচতে থাকে, বলে "ভীষণ সখ আমার গান শেখার, আগে যেটুকু শিখছিলাম তাও ভুইলা যাইতে বইছি এইখানে গান শিখানোর লোক না পাইয়া, বাবা আবার যার-তার কাছে গান শেখা পছন্দও করে না। আপনে আমারে শেখান না অলকদা—"

ঝর্ণার কথার সুরের গভীরতা, একটু বা আবদার আবদার ভাব অলকের মনকে স্পর্শ করে, তার গভীর চোখের সরল-সোজা চাউনি মুগ্ধ করে তাকে, কিন্তু তবু সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হতে পারে না সে।

একটু অপেক্ষা করে হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে ঝর্ণা বলে, "কই জবাব দিলেন না যে বড়—"

একটু ইতস্ততঃ করে অলক বলে, "দেখেন সঙ্গীত হইল অনেক সাধনার জিনিস, লঘু চাপল্যে তারে পাওয়া যায় না, অনুশীলনের ধৈর্য চাই, মনোযোগ চাই—"

একটা রক্তাভা দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে যায় ঝর্ণার মুখ থেকে—একটু কঠিন সুরে বলে, "কেমনে বুঝলেন যে, আমার মইধ্যে অনুশীলনের ধৈর্য বা মনোযোগ নাই? ও, সেদিনের মায়ের কথা শুইনা—"

ভারিক্কিচালে কথা বলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যায় অলক।

এখন সংশোধনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে বলে, "না না, তা না, কথাটা আমি সাধারণ ভাবেই কইছি। মানে আইজ-কাইল অনেকেই ভাবে কি না যে দুই দিন সারে-গামা করলেই বুঝি গান শেখা হইয়া যায়, কিম্বা গ্রামোফোনের রেকর্ড থেইকা দুই-তিনটা গান কপি কইরা বন্ধু-বান্ধবের বাহবা শুইনাই ভাবে যে আমি কি হনু রে, কিন্তু যারাই একটু-আধটু ভালভাবে চর্চা করছে তারাই জানে যে কতখানি ধৈর্য আর কত অখণ্ড মনোযোগ আর অবসর লাগে গান শিখতে গেলে—" প্রিয় প্রসঙ্গ পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলতে থাকে অলক।

তার উদ্ভাসিত মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন ভাবে ঝর্ণা।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পর লজ্জা পেয়ে থেমে যায় অলক। তখন আস্তে আস্তে ঝর্ণা বলে, "বেশ তো পরীক্ষা কইরা দেখেন না অলকদা, ধোপে টিঁকি কি না। তার আগে আমার প্রাক্তণ অনুশীলনের পরিচয়টা নেন—" হাসি মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে যায় ঝর্ণা।

আসর বসে বড় ঘরটাতে। তানপুরায় সুর বেঁধে হাঁটু মুড়ে শতরঞ্চির মাঝখানে বসে ঝর্ণা। পাশে বসে তবলায় ঠুক-ঠাক আওয়াজ করে অলক। এক কোণে বসেন শুচি ও সুনন্দা, ঝর্ণার ছোট দু' ভাই-বোন।

তবলার সুর বাঁধা শেষ হতেই কেদারায় আলাপ সুরু করে ঝর্ণা। রিণ-রিণে মিষ্ট গলায় কেদারার প্রসন্ন গম্ভীর রূপ পরতে পরতে

খুলতে থাকে। বড় ভালো লেগে যায় অলকের।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। ঝর্ণার গান শেষ হলে নিজে কয়েকটি গান গেয়ে শোনায় অলক। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন শুচি। ঝর্ণা তাতে মুখর হয়ে যোগ দেয় না বটে, কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখ দু'টির দিকে একবার তাকিয়েই তার মনের কথাটি বুঝে নেয় অলক।

পরিপূর্ণ চিত্তে মাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে সে।

যে লজ্জার বর্ম তার মনকে অহরহ ঢেকে রাখতো সেটা যেন অনেকখানি পাতলা হয়ে যায়।

৩

গান শোনা আর শোনানো,—এর মধ্যে যে এত সুখ, এত তৃপ্তি লুকিয়ে থাকতে পারে তা আগে কল্পনাও করতে পারে নি অলক। প্রায় দিনই সন্ধ্যার দিকে ইয়ুনিভার্সিটি থেকে ফেরবার পথে ঝর্ণাদের বাড়ি যায়। গান শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য ও রাজনীতির তর্কও চলে মাঝে মাঝে। ঝর্ণাধারার মতোই উচ্ছল কলস্বরে কত কথা বলে যায় ঝর্ণা; কান পেতে তাই শোনে অলক। সোম ফাঁক না-ই থাক, সুর আছে ঝর্ণার প্রতি কথায়। বিশেষ এক জনের কথা শোনার মধ্যেও কতোই না আনন্দ লুকিয়ে আছে। কথা শুনতে শুনতে ঝর্ণার ঠোঁট, মুখ, মাথা-নাড়া, চোখের বিচিত্র চাউনি, হাত ঘুরাবার ভঙ্গী দেখতে দেখতে দম বন্ধ হয়ে আসে অলকের, কান গরম হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা গুর্‌গুর্ করে ওঠে। কি একটা গভীর পিপাসায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে তার মন। যৌবনের

ছন্দ কি অপরূপ মায়াই না রচনা করেছে ঝর্ণার দেহে। কাঁচা সোনার রং যেন ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। সুনির্বাচিত শাড়ীটি যেন রহস্য-নিকেতনের দ্বারে কারুকার্যখচিত পর্দার মতো আন্দোলিত হচ্ছে।

অলকের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে কথার মাঝখানে হঠাৎ থেকে যায় ঝর্ণা। লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে অলক, আর সেই স্পন্দিত স্তব্ধতা দু'জনার বুকেই আঘাত হানতে থাকে।

চা-এর পেয়ালা হাতে শুচি এসে ঘরে ঢোকেন, বলেন, "বাপরে বাপ, কি বকতেই পারস তুই ঝর্ণা। বেচারা অলক আসে তোরে গান শিখাইতে, আইসা তোর লেকচারের ঠ্যালায় পালাই পালাই ডাক ছাড়ে—"

"না মাসিমা—" মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করে অলক,— "গানের মেজাজ তো সব দিন থাকে না, তাই একটু-আধটু অন্য কথাবার্তা কয় ঝর্ণা, অন্য পাঁচরকম আলোচনা করি আমরা—"

"আইচ্ছা আইচ্ছা—কর আলোচনা যত খুশী তোমরা, আগে চা খাইয়া লও—" বলে চা ও খাবারের প্লেট অলকের সুমুখে নামিয়ে দেন তিনি।

কিন্তু শুচির প্রশ্রয় থাকলে কি হবে, শুচির স্বামী প্রবীর সেন যেন একেবারে পাক্কা সাহেব। তিনি ধুতি-পরা উস্কো-খুস্কো চুল অলককে প্রথম দিন থেকেই সুনজরে দেখেন নি। বি-সি-এস্ থেকে আই-সি-এস্-এ প্রমোশন পাবার জন্য ইদানীং পুরোপুরি সাহেবিয়ানায় দীক্ষিত হয়েছেন তিনি, মেলামেশা করছিলেন শহরের হোমরা-

থাকা ঝর্ণার ডান হাতটি নিজের হাতে তুলে নেয় অলক। ঝর্ণার দীর্ঘায়ত চোখ দুটি অলকের চোখের ভেতর কি যেন খোঁজে।

একটু পরে উঠে পড়ে দু'জনে। হাত ধরাধরি করে রমনার নির্জন পথ দিয়ে হাঁটতে থাকে শহরের দিকে।

৪

নিজের পড়া আর ঝর্ণার ভালবাসার ভেতর এতই মগ্ন ছিল অলক যে, ইদানীং শ্যামলের ভাব পরিবর্তন এক বারও চোখে পড়ে নি তার। সদাপ্রফুল্ল শ্যামল অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেছেন, কোন এক গভীর চিন্তায় সব সময়েই নিমগ্ন থাকেন। দোকান থেকে বাড়ি আসেন অনেক রাত্রে, চুপি চুপি, চোরের মতো পা টিপে টিপে। কথা বলেন কম।

ভয় পেয়ে সুনন্দা কাছে এসে প্রশ্ন করেন, "কি হইছে তোমার?"

রুক্ষস্বরে জবাব দেন শ্যামল, "হইবো আবার কি? কিছুই না!"

সুনন্দা যদি তেমন অনুসন্ধিৎসু হতেন তবে শ্যামলের মানসিক বিপর্যয়ের কারণটি ঠিকই বার করতে পারতেন। কিন্তু তখন তিনি এর ওপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করলেন না। ভাবলেন, পুরুষের মন, অমন হয় মাঝে মাঝে, দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্বিনের ভোর, শেষরাতে অল্প বৃষ্টি হয়েছে, স্নিগ্ধ প্রকৃতির প্রসন্নতার ছোঁয়া মানুষের মনেও লেগেছে।

সকাল আটটা বেজে গেলেও শ্যামল বিছানায় শুয়ে আছেন দেখে কাজের ফাঁকে সুনন্দা এসে জিজ্ঞাসা করেন, "কি, এখনো শুইয়া আছ

যে ? দোকানে যাইবা না ?"

চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে সুনন্দার মুখে তাকিয়ে থাকেন শ্যামল, নিদ্রাহীন চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে গভীর স্বরে বলে ওঠেন, "আর দোকান—"

কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে সুনন্দার, দ্রুতপদে কাছে এসে শ্যামলের কপালে হাত রাখেন। বলেন, "নাঃ, জ্বর না, তবে কপালটা একটু গরম লাগতেছে—"

হাত বাড়িয়ে কপালের ওপর-রাখা সুনন্দার ঠাণ্ডা হাতটা চেপে ধরে শ্যামল বলেন, "ভালো কইরা চাইপা ধইরা থাক কপালটা, এখনও যদি কিছু বাঁচান যায়—"

দিশেহারা হয়ে সুনন্দা প্রশ্ন করেন, "কি বকতাছ তুমি পাগলের মতো ?"

"পাগল ? না, পাগল হই নাই এখনো, তবে হইতে বড় বেশী বাকিও নাই—"

"বাজে কথা রাখ, খুইলা কও কি হইছে—" আশঙ্কায় পরিপূর্ণ চিত্তে অস্থিরকণ্ঠে সুনন্দা বলেন।

শ্যামলের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি শান্ত হয়ে আসে, আস্তে আস্তে খুলে বলেন তাঁর বিপর্যয়ের ছোট্ট কাহিনী।

সব কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যান সুনন্দা।

শ্যামলের চালু কারবারটি তাঁর কয়েকজন কর্মচারীর অসাধুতার জন্য হঠাৎ ফেল পড়েছে। বাজারে অনেক দেনা তাঁর। কিছুদিন ধরে সামলাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন শ্যামল। পাওনাদাররা নালিশ ঠুকে দিয়েছে কোর্টে।

"তোমরা উতলা হইয়া পড়বা বইলা কোনো কথা কই নাই এতদিন—" উদাস সুরে শ্যামল বলেন, "ভাবছিলাম যে, সামলাইয়া নিতে পারুম, কিন্তু এখন আর কোনো আশাই নাই—" শেষের দিকে করুণ হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর।

কি বলবেন ভেবে পান না সুনন্দা। খেয়ে-পরে মোটামুটিরকমে চলে যাচ্ছিল তাঁদের। আজ হঠাৎ দুর্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে যান তিনি।

কিন্তু সত্যকারের বিপদের চেহারাটি তখনো দেখেন নি তিনি। দেখলেন কয়েকদিন পরে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলেন বসবার ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে সেই দড়ির ফাঁস গলায় পরে শূন্যে ঝুলছেন শ্যামল।

পাড়ার সবাই এসে জোটে। ধরাধরি করে শ্যামলের বিগতপ্রাণ দেহ নিচে নামায়। কেউ ছোটে কোতোয়ালী থানায় পুলিসে খবর দিতে।

ওপরের ঘরে মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিতে থাকেন সুনন্দা, শোকের ভারে হৃদয়টা বুঝি ছিঁড়ে পড়তে চায়। পড়ার ঘরের কোণে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপ করে বসে থাকে শুকনো মুখ, রুক্ষ কেশ অলক।

একটি রাত্রির ভেতরেই কি করে যেন ওলট-পালট হয়ে যায় সবকিছু।

ঠিক সে সময়ে ঘরে ঢোকেন শুচি ও ঝর্ণা। তাড়াতাড়ি ওপরে

উঠে এগিয়ে এসে সুনন্দাকে জাপটিয়ে ধরেন শুচি। তার কোলে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন সুনন্দা। শুচির চোখ দুটোও শুকনো থাকে না।

আস্তে আস্তে অলকের পাশে এসে বসে ঝর্ণা। সদ্য পিতৃহারাকে কী বলবে, কোন্ সান্ত্বনার বাণী শোনাবে ঠিক করতে না পেরে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

"বল হরি হরিবোল"—নিচ থেকে ভেসে আসে শেষ-যাত্রার কঠিন সঙ্গীত। শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকে অলক।

পায়ের শব্দ শোনা যায়। অলকের পিসতুতো ভাই বসন্ত এসে দাঁড়ায়, বলে—"আর তো তোর বইসা থাকলে চলব না—অলক —চল এখন—"

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল অলক। মাথা নিচু করে বসন্তের পেছনে পেছনে নিচে নেমে যায়।

ব্যথা-ভরা চোখ দুটি মেলে তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে ঝর্ণা।

আশ্বিনের সোনাঝরা দিনগুলি শেষ হয়ে যায়, আকাশ থেকে নেমে আসে হৈমন্তিক কুয়াশা। ঝাপ্‌সা দেখায় চারদিক।

পিতৃঋণ শোধ করতে অলকের পৈতৃক বাড়িটা বিকিয়ে যায়। মার হাত ধরে গেণ্ডারিয়ার ওধারে সস্তায় বাসা ভাড়া করে অলক। পড়া ছেড়ে দেয়। সংসারের চাকাটি সচল রাখবার জন্য গানের টিউশানি করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে।

নিরবচ্ছিন্ন কাজের চাপে হৃদয়ের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তিগুলি চাপা

পড়ে যায়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যায় কমে। একটু নিঃসঙ্গ চিন্তারও অবকাশ পায় না অলক। এত দিন যেন তীরে বসে সমুদ্রের ঢেউয়ের সৌন্দর্য দেখছিল সে, এখন সমুদ্রের ভেতর পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে, তলিয়ে যেতে যেতে শুধু লবণাক্ত বিস্বাদটাই বড়ো হয়ে ওঠে তার কাছে।

তবু কখনো কখনো আশ্চর্য ইসারার মতো ঝর্ণার কথা মনে ভেসে আসে। পথ চলতে চলতে কোন মেয়ের শাড়ির আঁচলটি দেখে কিংবা অন্য কারুর কবরীবন্ধ লক্ষ্য করে মনে ভাবে যে, ঝর্ণাই বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে, প্রত্যাশার আলো জ্বলে দু'চোখে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে, না। ঝর্ণা নয়, তারই বয়সী অন্য কোনো মেয়ে।

ঝর্ণার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে তার মনে, বহু কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করে অলক। সে জানে যে, এখন ঝর্ণার সঙ্গে দেখা করলে মনের জ্বালা শুধু বাড়বেই। তার চেয়ে দূরে থাকাই ভালো। নির্বোধ নয় সে। সে জানে যে কায়েৎ-টুলির বাসা থেকে গেণ্ডারিয়ার বাসা যত না দূর, তার ও ঝর্ণার মাঝখানের ব্যবধান তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

ছ' মাস কেটে যায়। নব বসন্তের উতল হাওয়ায় পাতায় পাতায় মৃদু মর্মর জাগে। এমন সময়ে এলো ঝর্ণার চিঠি—ঝর্ণার প্রথম চিঠি।

স্পন্দিত বুকে ঝর্ণার চিঠি পড়ে অলক, ঝর্ণা লিখেছে :

অলকদা, অনেক দিন তোমার পথ চেয়ে বসে ছিলাম। একবার

এলে কী এমন ক্ষতি হ'ত তোমার? বহু কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করে আজ চিঠি দিচ্ছি।

তুমি আমাকে ভুলতে চাও তা জানি। তবু একটি বার দেখা দিলে তোমার ব্রতভঙ্গ হবে না। আমরা শিগ্‌গিরই ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বাবা জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বদলী হয়েছেন চব্বিশ পরগণায়। আর হয় তো কোনো দিন দেখা হবে না। একটিবার এসো।

ইতি—

তোমার ঝর্ণা—

"তোমার ঝর্ণা"। 'অনেকক্ষণ ধরে জ্বলজ্বলে অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে অলক। এ কী করল ঝর্ণা! যে আগুন প্রায় নিভে এসেছে তাকে আবার কেন জ্বালাতে চায় সে!

চিঠির তারিখটা দেখে অলক। ডাক বিভাগের কৃপায় ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় চিঠিটা আসতে সময় লেগেছে মাত্র সাত দিন।

সন্ধ্যায় ছাত্রের বাড়ি না গিয়ে গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে ঢাকা গেল অলক। ষ্টেশনে নেমে দোলা-লাগা বুকে বহু পরিচিত হলদে রঙের বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়।

সদর দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। তালাটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বিমূঢ় অলক।

দূর থেকে অলককে দেখে মুদীর দোকানের ছোকরাটা কাছে এসে বলে, "সেন সাহেব তো বদলী হইয়া গেছেন এইখান থেইকা। এই তো তিন দিন আগে চইলা গেলেন সবাইরে নিয়া—"

একফুঁয়ে নিভে-যাওয়া প্রদীপের মতো মুখ হয়ে যায় অলকের। উল্টো পথে হাঁটতে থাকে সে। মনে মনে ভাবে, দেখা হ'ল না

ভালোই হ'ল। অসম প্রণয় পরিণয়ে পূর্ণতা যখন পাবে না, তখন এ দেখায় দু'জনেই দুঃখ পেত শুধু।

ভেঙ্গে-পড়া মনকে দৃঢ় করে অলক। রবীন্দ্রনাথের গানের কয়েকটি কলি গুঞ্জরণ করতে থাকে তার মনে ঃ

"আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝংকারো॥"

অলক জানে যে, তার পক্ষে ঝর্ণা চিরকালের জন্য সুদূর আকাশের তারা হয়েই থাকবে। তার জাত আর গোত্র চিরকালের জন্য ঝর্ণার জাত আর গোত্র থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু চাওয়ার পরিসমাপ্তি কি শুধু স্থূল পাওয়াতেই ? অলকের মনের আকাশে ঝর্ণা যে একদিন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিতরণ করেছিল তার কি কোন দাম নেই ? সেই মহৎ স্মৃতি কি তার জীবনের দৃঢ় অবলম্বন হতে পারে না ?

পারে। এতদিনে, প্রখর যৌবনের সব জ্বালা ফুরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের অবসন্ন বৈকালে পৌঁছে অলক জেনেছে যে, চাওয়া আর পাওয়ার ভেতর উপলব্ধির যে তারতম্য রয়েছে তাই টেনে আনে সুখ আর দুঃখ। কিন্তু জীবনের বেদীমূলে স্মৃতির প্রদীপখানি জ্বালাতে পারলে নিষ্কলুষ আলোক-বন্যায় মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

১

সংক্ষিপ্ত নাম মিস্টার আর. এন. সিদ্ধান্ত। কুলী, মজুরেরা সামন্ত সায়েব বলেই জানে, আর লেখাপড়া জানা বাবুরা আড়ালে বলে রাসভনিন্দিত সামন্ত। সেটা তাঁর খর্বপুষ্ট দেহভারের জন্য কি তাঁর কণ্ঠস্বরের অবলীলাক্রম ওঠানামার ছন্দলয়ের জন্য তা ঠিক জানা যায় না। তা হলেও নিষ্কাশনপুর কোলিয়ারীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যানেজারের ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

চারদিকে রুক্ষ বিরস রাঢ়ভূমি, প্রান্তর যেন একটা তরঙ্গে উঠেই হঠাৎ থেমে গেছে। কাছে দূরে গাছপালার শ্যামলিমার চিহ্ন মাত্র নেই, শুধু অনেক ব্যবধানে দুই-চারটি রিক্তপত্র পলাশ, অর্জুন খর বৈশাখের আগুনে ঝলসে দাঁড়িয়ে আছে। মাটির বুকে দগদগে ঘা-এর মত কয়েকটা চানক-এর অতিকায় হাঁ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে-ওখানে।

বড়ো চানকের কাছেই সারি সারি ঢেউ খেলানো ছাতের বাড়িগুলোতে কোলিয়ারীর দেড়শ বাবুর বাস। ম্যানেজার, এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার ও আরও অভিজাত অফিসারদের বাংলো অন্য প্রান্তে। নিষ্কাশনপুর শহরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে

কোলিয়ারীর সাহায্যপুষ্ট নিষ্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবের প্রকাণ্ড একতলা বাড়ি।

বেলা প্রায় তিনটে।

লাঞ্চ খেয়ে ম্যানেজার সামন্ত সায়েব একটু আগে তাঁর আপিসে এসে বসেছেন। নিজের আপিসে বসে হেড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট তাপস ভাদুড়ী কয়লা রপ্তানীর জরুরী হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। মাথার ওপর কলিং বেলটা দু'বার ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠতেই তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে ঠিক একটা বন্দুকের গুলির মত বেগে সামন্ত সায়েবের খসখসের পর্দা ঘেরা ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা নরম আপিস ঘরে ঢোকে।

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় সামন্ত সায়েব বলেন, বসো ভাদুড়ী।

বাইশ বছরের চাকরী-জীবনে এমন অসম্ভব কথা কখনো শোনে নি তাপস। তাই নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে না পেরে দাঁড়িয়েই রইল।

"সিট্ ডাউন তাপস"—পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে সামন্ত সায়েব আবার বলেন নরম সুরে।

চৌদ্দ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে ফেরার সময়ে আর কিছু আনুন বা না আনুন, পাকা সাহেবী মেজাজটা ঠিকই নিয়ে এসেছেন সামন্ত সায়েব। কারুর সঙ্গে বাংলায় কথাই বলেন না। কনভেণ্টে পড়া তাঁর ছেলেমেয়েরাও সব সময়ে ইংরেজীতেই কথা বলে। আর তাঁর অধীনস্থ কোন কেরাণীকে তাঁর খাস আপিসে চেয়ারে বসতে বলাটা তো সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশনপুরের অভিধান-বহির্ভূত ব্যাপার।

তবু সায়েবকে পাইপ ধরাতে দেখে তাঁর মেজাজের একটা ঠিকানা পায় তাপস। সন্তর্পণে একটা চেয়ারের প্রান্তে বসে।

সব সময়ে টু দি পয়েন্ট কথা বলেন সামন্ত সাহেব। তাপস বসতেই বলেন, "ওয়েল, রবীন্দ্র সেন্টিনারী সম্বন্ধে কি ঠিক করেছ তোমরা—"

তাপসের বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। এ কি ব্যাপার! সায়েবের মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম! ঢোঁক গিলে বলে, "আমি তো স্যার কাজের চাপে সময়ই পাই না—"

"ওঃ, ডিস্‌গাষ্টিং"—তড়বড় করে বলে ওঠেন সামন্ত সায়েব। টেবিলের ওপর মেলে-রাখা স্টেট্‌সম্যানখানা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেন তাপসের মুখের ওপর, "পড়ে ছাখ—ম্যারিকা, ইউ-কে, জার্মেনী, ফ্রান্স, রাশিয়া—এ সব জায়গাতেও রবীন্দ্র সেন্টিনারীর আয়োজন হচ্ছে। উই শুড্‌ন্ট্‌ ল্যাগ বিহাইণ্ড্‌, লেট আস ফর্ম্‌ এ কমিটি তাপস—"

চিরটাকাল কয়লার রেইজিং-এর টন, হন্দরের হিসেব করে চুল পাকিয়েছে তাপস। মগজটাও অবিকল কয়লার মতই কালো হয়ে গেছে। তবু আজ হঠাৎ সামন্ত সায়েবের মুখ থেকে পাইপের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট বিদেশী উচ্চারণে রবীন্দ্র কথাটি শুনে একটা অস্পষ্ট উল্লাস অনুভব করে সে। বহুদূর থেকে ভেসে আসা গানের সুরের রেশ-এর মত রবীন্দ্রনাথের নাম তার মনের অস্পষ্ট চেতনার দ্বারে আঘাত করে। তাই উৎসাহের আতিশয্যে স্থান কাল ভুলে বলে ওঠে, 'খুব ভাল হবে স্যার। আমার নাতিটাও সেদিন বলছিল বটে, যে বাংলাদেশের সব জায়গাতেই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের

আয়োজন চলছে। আমাদের স্টাফে একজন নিউ হ্যাণ্ড এসেছে। লোকটা সাহিত্যিক—ওকেই সেক্রেটারী করে দেওয়া যাক—'

ভ্রূকুঞ্চিত করে সামন্ত সায়েব বলে, "হু ইজ হি?"

"সুশীল সান্ন্যাল স্যার। এ জুনিয়ার ক্লার্ক। তবে শিক্ষিত ছেলে, বাংলায় পদ্য-টদ্য লেখে। দেশ-ফেশ কি সব বাংলা পত্রিকা আছে না? ওতেই বেরয় ওর পদ্য—"

গম্ভীর হয়ে যায় সামন্ত সায়েবের মুখ। জুনিয়ার ক্লার্কের মত একটা চুনোপুঁটি লোকের তাঁর অনুমতি ছাড়াই সাহিত্যকর্ম করাটাকে একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলেই মনে করেন তিনি। বলেন, "নো নো, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট্ জুনিয়ার ক্লার্কস্ ইন্ দ্য কমিটি। তা ছাড়া যারা বাংলা পদ্য লেখে তাদের তো কোলিয়ারীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকাই উচিত নয়। ইজ হি এ টেম্পোরারী হ্যাণ্ড?"

ঘাবড়ে গিয়ে তাপস বলে, "নো স্যার, মাস দুই হ'ল কন্‌ফার্ম্‌ড্ হয়েছে—"

"অল রাইট, আই উইল ডীল উইথ হিম লেটার। আজই একটা নোটিশ বার করে দাও। কোম্পানীর সিনিয়ার স্টাফ সবাই যেন আজ সন্ধ্যা সাতটায় নিষ্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবের হল-রুমে আসেন। আমরা রবীন্দ্র সেন্টিনারী কমিটি তৈরী করব।"

২

সন্ধ্যা সাতটা।

নিষ্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবের প্রকাণ্ড হলঘর প্রায় ভর্তি। কোলিয়ারীর সিনিয়র স্টাফ ছাড়াও নিষ্কাশনপুর শহরের ধনী, মানী সবাই এসেছে, এসেছে কয়লা শিল্পের ঠিকাদারেরা।

সামন্ত সায়েব আসেন নি এখনো।

কস্ট এ্যাকাউন্টের বড় বাবু সুধাকর রায় বেতো রোগী। একটু পথ আসতেই তাঁর বেশ পরিশ্রম হয়েছে। চেয়ারে বসে পাশে বসা ভুবন সেনের সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলছিল, আর হাঁপানীর টান সামলে তার যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছিল ভুবন।

"বুঝলে ভুবন্, এ সব রবি ঠাকুরকে নিয়ে মাতামাতি করাটা হচ্ছে ছেলে-ছোকরাদের কাজ আমাদের কি আর পোষায় এ সব ? এই তো আর দিন কয়েক পরেই ছোট বৌমা আঁতুড়ে যাবে, আমার বাতের মালিশটা কে করবে সেই নিয়ে ভাবনা—

দম নিয়ে ভুবন বলে, "যা বলেছেন দাদা, রাসভ সামন্তের কি উচিত এ সবে নাক গলানো ? তুই বাপু সায়েব মানুষ, দিশি কবিকে নিয়ে মাতবার দরকারটা কি তোর ?"

পেছনের সারিতে মাথার চুলে, ভুরুতে আর গোঁফে পুরু করে কলপ লাগিয়ে সেন্টের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করে বসেছে পুষ্পাদল গন্ধ-বণিক্য, তার ওপাশে বসা গোপেন গাঙ্গুলীর চকচকে টাকে ইলেকট্রিকের আলো পড়ে দূরের দেয়ালে তার প্রতিচ্ছায়া ফেলেছে। তার ওপাশে তুলসীর মালা গলায় বৈষ্ণবচরণ নামতীর্থ।

এ পাশে ঝুঁকে নামতীর্থ বলে, "আজ আমাদের মৃদঙ্গ সভার পালা-কীর্তন ছিল, সে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসতে হ'ল এখানে, কি গেরো বলুন দেখি—"

পুষ্পদলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গোপেন বলে, "রাসভের মাথায় আবার এ হুজুগ চাপল কি করে?"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে পুষ্পদল বলে, "হুজুগ নয় হে, হুজুগ নয়।

এটা একটা ফ্যাশান, রবীন্দ্র-ফ্যাশান। সিরুবুরু কোলিয়ারী, পালখাম্বাৎ কোলিয়ারী, হরিপুর কোলিয়ারী সব জায়গাতেই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী হবে, এখানে একটা কিছু না করলে রাসভের মান থাকে না ভাই—"

গলা বাড়িয়ে নামতীর্থ বলে, "তা হলে আমাদের ডেকে এনে কষ্ট দেবার দরকারটি কি ছিল? ঐ সুশীল সাণ্ডেলই ত শুনেছি সাহিত্য-টাহিত্য করে, ওকে ডেকে ভার দিলেই ত ল্যাঠা চুকে যেত —আমার মেয়ে রেবা ত বলে সুশীলদা মস্ত সাহিত্যিক—"

"তাই ত হে—কিন্তু ছোঁড়াটাকে দেখছি না ত এখানে," মাথা ঘুরিয়ে গোটা হলঘর খুঁজে দেখে গোপেন বলে।

পেছন থেকে হেমদা গুপ্তভায়া বলে, "আমাদের কি আর কাব্যরস পান করবার বয়েস আছে—না কয়লার হিসেবে ঠাসা মগজে সে সব ঢুকবার ফাঁক পাবে,—যত্তো সব। কোথায় সন্ধ্যাবেলা প্রেমসে দু'হাত ব্রীজ খেলব, তা না..."

নামতীর্থ বলে, "তবে এলেন কেন?"

"চাকরী মশায় চাকরী। ম্যানেজার ডেকেছে, না এলে কি আর রক্ষে আছে?"

এমন সময়ে দি নিষ্কাশনপুর জেনারেল স্টোর্স-এর মালিক বনোয়ারীপ্রসাদ সন্ধ্যালগ্ন শয্যাদ্রব্য স্টোর্স-এর মালিক দুর্জন রায় গট গট করে হলে ঢুকে সুমুখের সারির রিজার্ভড চেয়ারে এসে বসে।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। হল ঘরের লাগোয়া বারান্দায় তাপস ভাদুড়ী আর বৈকুণ্ঠ সেন, ড্রামাটিক ক্লাবের জয়েণ্ট সেক্রেটারী দু'জন পাইচারী করে চলেছে। এখনও সামন্ত সায়েবের দেখা নেই।

বৈকুণ্ঠ লোকটিকে বিশেষ পছন্দ করে না তাপস। লোকটি যেন গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে যায় কখন কোথায় সামন্ত সায়েব আসবেন। তারপর একবার দেখতে পেলেই হ'ল, আঠার মতো লেগে থাকবে সামন্ত সায়েবের সঙ্গে, জোড় হাতে সব সময়ে জল উঁচু ত জল উঁচু বলতেই আছে। সামান্য স্টক সেকশনের ইনচার্জ হয়েও হেড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলে তাপসকে মানতেই চায় না। সামন্ত সায়েবের প্রশ্রয়েই এতটা হয়েছে।

তাপসের চিন্তায় বাধা পড়ে। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে একখানা শেষ মডেলের মিনার্ভা হলের সামনেকার পার্কে এসে থামে। তাপস পৌঁছুবার অনেক আগেই ছুটতে ছুটতে গাড়ীর কাছে গিয়ে সবগুলো দাঁত বার করে দরজা খুলে দেয় বৈকুণ্ঠ, মাথা ঘুরিয়ে তাপসের হতাশ মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়।

প্রসন্ন মুখে নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরা সামন্ত সায়েব নেমে আসেন, অন্য দরজা দিয়ে নামে এ অঞ্চলের লাখপতি কোল মার্চেন্ট গোলকদাস ঘরপুড়িয়া।

তাপসের আনত বিনীত নমস্কারের উত্তরে মাথা হেলিয়ে সামন্ত সায়েব বলেন, 'এভ্‌রিথিং অল্‌ রাইট তাপস?'

দু'হাত কচলাতে কচলাতে তাপস বলে, 'ইয়েস স্যার, সবাই এসেছে স্যার, একে আপনার অর্ডার তার ওপর আবার বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন—'

সামন্ত সায়েব সদলে হলে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ায়।

সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে সামন্ত সায়েব বসেন, পাশের চেয়ারে ঘরপুড়িয়া বসে।

সভা আরম্ভ হয়।

প্রথমেই সামন্ত সাহেবের অনুরোধে গোলকদাস ঘরপুড়িয়া ভাষণ দিতে ওঠে। দশ আঙ্গুলের দশটা হীরের আংটি বিদ্যুতের আলোতে ঝলমলিয়ে ওঠে। বিশাল ভুঁড়ির ওপর হাত দুটি আড়াআড়ি করে রেখে ঘরপুড়িয়া বলে ঃ

'সভাপতিজি ঔর দোস্তো, গুরুদেওর কোবিতা হামি ভি কুছু কুছু পঢ়িয়েসে, সে সোমোস্তো কথা মনে পড়লে বহুৎ আনন্দ মালুম হোয়। সেইজন্যে সামন্ত সায়েব যখন এ সভাতে ডাকলেন হামি রাজী হ'ল। রবীন্দ্রনাথ খুব বোড়ো কোবি ছিলেন সে বাৎ আপনারা সোবাই জানেন। হামি উনকা চার ফুট লম্বা ছোবি সোনার ফ্রেম দিয়ে বাঁধাই করে রেখেছি। খরচা পড়িয়েছে দশ হাজার টাকা। হামী রবীন্দর-প্রেমী আছে। হামী সৎ-বার্ষিকী সমিতিমে মোটা টাকা চন্দা দিব। নাচ আনুন, গান আনুন, কলকত্তার বংগালী মেয়েরা ভালো নাচে, হামার খুব পছন্দ আছে।'

এটুকু বলতেই হাঁপিয়ে ওঠে গোলকদাস। বসে রুমাল দিয়ে কপাল, মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মোছে।

ঘরময় সমর্থনের গুঞ্জন ওঠে। সামন্ত সায়েব উঠে দাঁড়াতেই তা থেমে যায়।

সামন্ত সায়েব বলেন :

'অনেকদিন ম্যারিকায় থাকার ফলে বাংলা ভাষা প্রায় ভুলেই গেছি. তা ছাড়া ইংরিজি ভাষার কাছে বাংলা দাঁড়াতেই পারে না, সেজন্যই বোধ হয় শেষ বয়েসে নিজের ভুল ধরতে পেরে রবীণ্ড্রনাথও ইংরিজিতে গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন। সে যাক। ছেলেবেলার

রবীন্দ্রনাথের গৃহদাহ পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা আজও আমার মনে আছে। তাঁর অগ্নিবীণা কাব্য এক সময়ে আমার মনেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বাংলা নাটক আমি দেখি না, তবে বহুকাল আগে স্টারে একবার তাঁর চন্দ্রগুপ্ত দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার বাড়ীতে এক আলমারী রবীন্দ্র রচনাবলী আছে, চীপ এডিশন নয়, বেশ দামী এডিশন, রেক্সিনে বাঁধাই। শান্তিনিকেতনে তিনিই প্রথম এদেশে কো-এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করে চিরদিনের জন্য জাতিস্মর হয়ে আছেন। ফরেনে তাঁর সেন্টিনারী নিয়ে প্রচণ্ড হৈ চৈ চলেছে, তাই আমি চাই এখানেও রবীন্দ্র সেন্টিনারী হোক। আসুন আমরা একটা শক্তিশালী কমিটি তৈরি করি।'

শ্রোতারা সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—'

এরপর সর্বসম্মতিক্রমে সামন্ত সায়েবকে দি নিষ্কাশনপুর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি করা হয়। সহ-সভাপতি হয় গোলকদাস ঘরপুড়িয়া, চীফ ইঞ্জিনীয়ার ভি. রামমূর্তি অর্গানাইজেশন সেক্রেটারী, তাপস ও বৈকুণ্ঠ যুগ্ম-সম্পাদক, এবং চীফ এ্যাকাউন্টেন্ট কোষাধ্যক্ষ হয়। বিভাগীয় প্রধানরা কমিটি মেম্বার হয়।

খুশী হয়ে গোলকদাস পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজী হয় এবং অনুষ্ঠানের দিন তার সোনার ফ্রেমে আঁটা দশ হাজার টাকা দামের রবীন্দ্রনাথের ছবি ধার দিতে রাজী হয়। কোম্পানীর তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজী হন সামন্ত সায়েব।

সভায় স্থির হয় যে, টাকার জন্য ভাবনা না করে কলকাতা থেকে ভাল ডান্সপার্টি আনা হবে ৮ই মে তারিখে। তারা পর পর তিন রাত রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবে। এ ছাড়া শান্তি-

নিকেতন থেকে কিছু সঙ্গীতশিল্পী এনে একটা বিচিত্রানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হবে।

৩

কেন যে বাংলায় এম-এ পাস করে সুশীল সান্যাল নিষ্কাশনপুর কোলিয়ারীর জুনিয়ার ক্লার্কের কাজটা বেছে নিল তা তার অনুরাগী ছোট্ট দলটির কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্যই হয়ে আছে।

কোলিয়ারীর সিনিয়র ষ্টাফদের প্রায় সবাই নন্‌ম্যাট্রিক। জুনিয়ারদের মধ্যে কেউ কেউ কোলিয়ারী পরিচালিত স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ফেললেও বাপ-কাকাদের তাড়নায় কলেজের মুখ না দেখেই কোলিয়ারী ঢুকে অর্থোপার্জন ও বংশবৃদ্ধিতে লেগে গেছে।

এর ভেতর হঠাৎ বাইরে থেকে খানিকটা উজ্জ্বল আলো আর বাতাস নিয়ে এসে হাজির হয় সুশীল।

সুশীল কবিতা লেখা এবং সে সব কবিতা ভাল বাংলা পত্রিকায় ছাপা হয় এ খবরটা প্রচার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-ছোকরার মধ্যে কয়েকজন তার ভক্ত হয়ে ওঠে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা রেবাও তাদের একজন। সুশীলকে নিয়ে গর্বের অন্ত নেই তার। গল্প লিখতে বসে তার গল্পের নায়কের চেহারার সঙ্গে সুশীলের চেহারা মিলে মিলে এক হয়ে যায় বারবার।

দূরের একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে অল্প আগে। অন্ধকারের স্বচ্ছ পর্দাটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসছে।

কোলিয়ারীর আপিস থেকে বেশ কিছু দূরে একটা ছোট্ট টিলার

ওপর শিমূল গাছের নীচে সুশীল আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে জমায়েৎ হয়েছে। রেবার কালো চুলের নিপুণ-বদ্ধ কবরীতে একগুচ্ছ রক্তিম কৃষ্ণচূড়া যেন সূর্যাস্তের রংটুকু ধরে রেখেছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে রেবা বলে,—"টাকা আর ক্ষমতা থাকলে এই দুনিয়ায় সব কিছুই হয়,—তাই না সুশীলদা ?"

জবাবে কিছু বলে না সুশীল। পশ্চিমের আকাশের মেঘে প্রকৃত যে সাতটি-রং-এর বাটিই উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখে।

"উঃ, শেষটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি হ'ল কিনা রাসভনিন্দিত সামন্ত। ভাবাও যায় না এ কথা—" আক্ষেপের সুরে সুরেশ বলে,—"লোকটা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতাও পড়েছে কি না সন্দেহ—"

এবার প্রতিবাদের সুরে সুশীল বলে,—"কেন পড়বেন না ? ম্যাট্রিক পাস করতে হয়েছে না ?"

"বাঃ পাঠ্য বই-এর কবিতা পড়া, আর উপলব্ধির আলোতে কাব্য পাঠ করা কি এক কথা হ'ল ?"

আহত সুরে সুরেশ বলে,—"তা ছাড়া ও ত কনভেণ্ট থেকে সিনিয়ার কেম্‌ব্রীজ পাস করেছে—"

"আর ঐ ঘরপুড়িয়া ?—" জ্বলে উঠে বিনয় বলে,— "গরীবদের ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখন লাখ টাকার মালিক হয়েছে বলে ও হ'ল সহ-সভাপতি।"

"আর কমিটি মেম্বাররাই বা কি।" আবার বলে ওঠে রেবা,— "হোন না তাঁরা আমাদের কাছে মামা, মেসো, পিসে, তা বলে

হক কথা বলব না? রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে কি পরিচয় আছে তাঁদের?"

"দরকারই বা কি?" মৃদুস্বরে সুশীল বলে,—"সেকশন ইনচার্জ না তাঁরা?"

ফুঁশে উঠে বিনয় বলে,—"না, না, ঠাট্টা কর না সুশীলদা। তোমাকে অন্ততঃ সম্পাদক করে নেওয়া উচিত ছিল ওদের—"

তার কাঁধে হাত রেখে শান্ত স্বরে সুশীল বলে,—"আমি যে জুনিয়ার ক্লার্ক ভাই, আমি যে ভারতের নব বর্ণাশ্রমে অন্ত্যজ, আমি কি করে সামন্ত সায়েব যে সভার সভাপতি সে সভায় চেয়ার পেতে বসব—"

সুশীলের কথায় রেবার চোখে জল এসে যায়। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকে সে।

সুরেশ বলে,—"থাক, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। ঐ ঘোর গণ্ড দলের মধ্যে গিয়ে সুশীলদা কি-ই বা করতেন শুনি?"

"কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মদিনে আমরা কি শুধু ঐ সব সার্কাসই দেখব সুশীলদা? আমাদের কি করবার আর কিছু নেই?" আহত সুরে রেবা বলে,—"হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব?"

শান্ত সুরে সুশীল বলে,—"দরকার কি রেবা? হাজার ধুমধাম করেও রবীন্দ্রনাথকে বেশী সম্মান দেখাতে পারব না আমরা। নেতা বেঁচে থাকেন তাঁর আদর্শে আর কবি বেঁচে থাকেন তাঁর রচনায়—"

"না না, ওসব বড় বড় কথা ছাড় সুশীলদা,—" বিনয় বলে,—"নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি খুব উচ্চস্তরের জিনিস হতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐ সাকার উপাসনাই ভাল। তোমাকে সভাপতি

করে আমরা আলাদা শতবার্ষিকী কমিটি করব।"

ওদের কচি মনের জ্বলন্ত উৎসাহ সুশীলের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বলে,—"ঠিক আছে, রেবা হবে তার সম্পাদিকা, বাকী সবাই সদস্য, কেমন ?"

হৈ হৈ করে সমর্থন জানায় সবাই।

দুই চোখের মুগ্ধ দীপশিখাটি সুশীলের মুখের দিকে তুলে ধরে রেবা।

বিনয় বলে,—"কিন্তু শ্রোতা, সুশীলদা ?"

গভীর সুরে সুশীল বলে,—"শ্রোতা হবে আমাদের খাদের কুলি-মজুরেরা, তাদের বৌ আর ছেলেমেয়েরা—"

পুবদিগন্তে চাঁদের আভাস দেখা দিয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করে সুশীল ঃ

'সাহিত্যের ঐকতান-সঙ্গীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।'

৪

দু' কান পাঁচ কান হয়ে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বৈকুণ্ঠের মারফৎ কথাটা সামন্ত সায়েবের কানে ওঠে।

শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন সামন্ত সায়েব। "হোয়াট্ ? এ্যানাদার কমিটি ?" রাগে সামন্ত সায়েবের মুখ দিয়ে আর কথা

বেরোয় না।

আর পাঁচজন কেরাণীর সঙ্গে আপিসে কাজ করছিল সুশীল। চাপরাশী এসে বলে,—"বড়া সাব বুলাতা—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুশীল। গোটা আপিস তটস্থ হয়ে চেয়ে থাকে।

সামন্ত সায়েবের খাস কামরায় ঢুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সুশীল। ক্রুদ্ধ চোখের বিরাগভরা দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নেন সামন্ত সায়েব, বলেন "হাউ ডু য়ু ডেয়ার—"

বাধা দিয়ে সুশীল বলে, "বাংলায় বলুন স্যার"—

লাল হয়ে ওঠে সামন্ত সায়েবের মুখ গনগনে আগুনের আঁচ বের হতে থাকে, বলেন, "তুমি নাকি অন্য একটা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি ফর্ম করেছ ? ইজ ইট্ ট্রু ?"

"হ্যাঁ, সত্যি—" নির্ভীক স্বরে সুশীল বলে।

"তোমার ত সাহস কম নয় ছোকরা, তুমি জান যে আমি নিজে সেন্ট্রাল শত বার্ষিকী কমিটির প্রেসিডেণ্ট ?"

"হ্যাঁ জানি, আবার এও জানি যে রবীন্দ্রনাথ কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন, তিনি সারা দেশের, সারা জাতির। তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর সঙ্গে কোলিয়ারীর আপিসের কাজের কোন সম্পর্ক নেই।"

চিবিয়ে চিবিয়ে সামন্ত সায়েব বলেন, "নিষ্কাশনপুরে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কোন কিছু নেই, সব কিছুই কোম্পানীর ব্যাপার। তুমি ওসব মতলব ছাড়, তা না হলে—"

"তা না হলে ?"

"আই উইল স্যাক ইয়ু।" টেবিলে ঘুষি মেরে সামন্ত সায়েব বলেন।

"বেশ তাই করবেন।"

মাথা উঁচু করেই বেরিয়ে আসে সুশীল। সামন্ত সায়েব কয়েক সেকেণ্ড সেদিকে তাকিয়ে থেকে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকেন।

৮ই মে।

পাঁচশ টাকা খরচ করে নিষ্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবটিকে আগাগোড়া আলোকসজ্জায় সাজান হয়েছে। সহরের গণ্যমান্য কেষ্টবিষ্টু সবাই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, প্রকাণ্ড হলঘরে লোক আর ধরে না।

করতালিমুখরিত প্রেক্ষাগৃহে বর্ণাঢ্য ড্রপসিন উঠে গেল।

সুসজ্জিত মঞ্চের একেবারে পিছন দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোলকদাস ঘরপুড়িয়ার দেওয়া সোনার ফ্রেমে বাঁধান রবীন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড ছবিখানা।

উইংয়ের পাশ দিয়ে মঞ্চে এসে ছবিখানা আড়াল করে দাঁড়ালেন সামন্ত সায়েব। মাথার ফেল্ট হ্যাট থেকে সুরু করে টাই কোট ও ট্রাউজার্সে নিখুঁত সাহেবী পোষাক। মাইকের সামনে এসে ঘোষণা করলেন যে বহু টাকার লোভ দেখিয়েও কলকাতা থেকে কোন রবীন্দ্র থিয়েটার পার্টিকে আনা গেল না বলে তিনি বিশেষ দুঃখিত। তবে শ্রোতাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই, কারণ পরিবর্তে বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান কালচার ড্যান্স পার্টি এসে পেঁাচেছে। তারা সাপুড়ে নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু করবে এবং মৎস্য নৃত্যে শেষ করবে। বিউটিফুল গার্লস সব রয়েছে এদের পার্টিতে।

সামন্ত সায়েবের শেষ কথাটি শোনা মাত্র চটপট হাততালিতে হলঘর যেন ফেটে যায়।

নিষ্কাশনপুর শহরের শেষ প্রান্তে সুশীলের নিরালা বাড়ি। বাইরের উঠানে প্রকাণ্ড বকুল গাছের নীচে একটি টেবিল পাতা। তার ওপর রবীন্দ্রনাথের একটি ফটো এক থাক রবীন্দ্র রচনাবলীতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করান। ছবির সামনে একটি প্লেটে একমুঠি বেলফুল। তার দু'পাশে দুটি ধূপকাঠি জ্বলছে।

গোটা উঠানটি ভরে গেছে উৎসুক জনতার ভীড়ে। খাদের কুলি কানিন, তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে ঠাকুর কবির কথা শুনতে। রুক্ষ কাঁকুরে মাটির ওপর জোড় হাতে বসে আছে সবাই। এতক্ষণ ধরে সুশীল, রেবা, সুরেশ, বিনয় ছোট ছোট সহজ কথায় রবীন্দ্রনাথের তাদের পরিচয় ঘটিয়েছে। রেবা গেয়েছে, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো'—রবীন্দ্রসঙ্গীতটি।

ঝুমরা মাঝি বাঁশী বাজায়, ঝমরু সর্দার ঢোলক বাজায়, একদল সাঁওতাল তরুণী সুরের তালে তালে নেচে কবিকে তাদের শ্রদ্ধা জানায়। আকাশের বিপুল চন্দ্রাতপের নীচে, উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবে শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালোবাসার অভাব থাকে না।

সব শেষে সঞ্চয়িতাখানা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুশীল, মৃদুস্বরে আবৃত্তি করে :

'কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান,
কোন দিকে তোর টান।

পাষাণ গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে যত্ন পুরা মাত্রা
সেথা আমার ছন্দোময়ী, করবি কি তুই যাত্রা?
গান তা শুনি…'

হঠাৎ দূর থেকে কে যেন হেঁকে ওঠে:

—"সুশীল বাবু আছেন?"

সাড়া দিয়ে সুশীল বলে, "কে?"

"আমি কোম্পানীর চাপরাশী, একটা চিঠি আছে আপনার।"

চিঠি নিয়ে খাম ছিঁড়ে টাইপ করা দু'লাইনের চিঠিটা বার করে দু'বার পড়ে সুশীল।

তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে রেবা দেখে চাকরী খতমের নোটিশ, নীচে স্বয়ং সামন্ত সায়েবের সই।

চিঠি থেকে চোখ তুলতেই রেবার শান্ত স্নিগ্ধ দু'চোখে আটকে যায় সুশীলের দু'চোখ। কোন কথা না বলে নীরবে ডান হাতখানা বাড়িয়ে সুশীলের হাত চেপে ধরে রেবা।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির সামনে এসে মাথা নত করে। কোল ভীল মুণ্ডা সাঁওতালের জনতা অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে থাকে তাদের।

× অনুক্ত
×
×
×
×
×
×
×
×
×

পুলিশের চাকরী। জ্যাঠা, খুড়ো, মেসো, পিসের দল মুখ বাঁকালেন সস্ত্রীক। ভাই বোনেরাও কপাল কোঁচকালো, ভুরু নাচালো, তেরছা চোখে তাকালো সুকোমলের দিকে। বুড়ো বাপ আর বুড়ি মা শুধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সংগোপনে। বুঝি বা একটু বেদনা মিশ্রিত ক্ষোভও লুকিয়েছিল সে নিঃশ্বাসে।

ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে সুকোমল। লেখা-পড়ায়, কথায়-বার্তায়, চেহারা-ছবিতে ঝলমল। অনেক আকাশচুম্বী উচ্চাশা আর সযত্ন বর্ধিত কল্পনার মায়ারাজ্য বাতাসে মিলিয়ে গেল—স্বল্প রোজগার পিতার নিত্য অভাবের সংসারের উষ্ণ নিঃশ্বাসে নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল।

দশটি ভাই বোন সুকোমলের···আর সুকোমলই বড়ো।

রাতজাগা চাঁদের ফালি আকাশের বুকে হেলে পড়েছে। ঘরের ভেতরটা আলো অন্ধকারে মেশা। ঘুমুতে না পেরে সুজাতা তখনও ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে আর সে নিঃশ্বাসে সুকোমলের বুকের কোমল চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। দু-এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুর তপ্ত স্বাদে রোমাঞ্চ হচ্ছে মাঝে মাঝে।

নতুন চাকরী হবার আনন্দ বা ফুর্তি অনুভব করেছিল নিয়োগ পত্রটি হাতে পেয়ে মাত্র দু-এক সেকেণ্ডের জন্য। চারিদিকের ধারালো দৃষ্টি সে আনন্দ খান্ খান্ করে চিরে ফেলল অল্প আয়াসেই। আত্মগ্লানি কথাটা বড়ো হলেও, সুকোমল যা অনুভব করছিল সারাদিন ধরে তাকে অন্য কী-ই বা বলা যায়। বেদনা আর পুলকের যে একই সংগে আবির্ভাব হতে পারে তা এতকাল অজানাই ছিল সুকোমলের কাছে। কিন্তু এ সব ঘটে যাওয়া সত্বেও সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যবহার আশা করেছিল সে সুজাতার কাছে। তার এই স্বপ্ন সাধের, আশাভংগের বেদনা সুজাতা বুঝবে আর সে বেদনার ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাবে মনে মনে তাই প্রত্যাশা করেছিল সুকোমল।

সুকোমলই যে বড়ো ছেলে, তার দায়িত্বও তো অনেক। পুলিশের চাকরীকে যতো কেন ঘৃণা করুক, কর্তব্যের জন্য আদর্শের বলি দেবার দামটুকু অন্ততঃ সুজাতা দিক্।

অবশ্য সুজাতা বদলে গেল পরের রাত্রি থেকেই। সাত আট দিন পরেই সর্দা যাবে সুকোমল সাব্ ইন্সপেক্টার অব পুলিশের ট্রেনিং নিতে, আবার আসতে সেই ছ' মাস। এমন কিছু বেশী দিন হয়নি ওদের বিয়ের যে আসন্ন বিরহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে সুজাতা। তাছাড়া শীতের রাত্রি, মিলনোৎকণ্ঠিতার স্বর্গ—এর থেকে বঞ্চিত থাকা মানেই নিজের সঙ্গে বঞ্চনা করা।

তাই স্বেদ-কম্প-পুলক-শিথিল দেহে শেষের রাতটি এক রকম জেগেই কাটালো তারা।

ট্রেনিং অন্তে ঢাকা জেলায় পোস্টেড হল সুকোমল। এ থানা, ও কোর্ট, ওই রিজার্ভ আফিস ঘুরে ঘুরে সুকোমল শেষ করল তার

শিক্ষানবিশী কাল। তারপর পুলিশ সাহেব ওকে টাউন সাব-ইন্সপেক্টার করে নিয়োগ করলেন কোতোয়ালী থানায়। ছোট্ট ছিমছাম সরকারী বাড়ীও পেয়ে গেল একটা। এখন সুজাতাকে নিয়ে এলেই হয় সুদূর কুমিল্লা সহর থেকে।

থানার বড়ো দারোগা শোভানাল্লা মিয়া পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করছেন কিন্তু জীবনের খেজুর গাছ হেঁসো দিয়ে কাটতে ছাড়েন না এখনও। রসে টইটুম্বুর সুকোমলকে একদিন আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—শুনতাছি কি টাউন-বাবু? বৌ লইয়া আসনের মৎলব করছেন বলে?

—তাই তো স্থির করেছি আপাততঃ। দারোগা সাহেবের দাড়ির মেহেদী রংএর দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল সুকোমল। দেশী আতর আর বিলিতি হুইস্কির মিশ্র গন্ধের ঢেউ ওর নাকের গোড়ায় গড়িয়ে পড়ল।

—ঐ কামও কইরেন না, জুয়ান বয়স, এখন কি আর বৌ লইয়া নাচানাচির সময়? দুই চারটা পরি-হুরীর লগে রং তামাশা জমান এখন। বৌ তো জিয়াইনা মাছ, আখেরর লেইগা তো আছেই। তিনটি আংটি বসানো আঙ্গুল দিয়ে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন শোভানাল্লা মিঞা।

অদূরেই থানার সেন্ট্রি নজারালি ভারী বুট পায়ে খট্‌খট্‌ শব্দে বারান্দা মাপছিল। দুই দারোগার উপস্থিতিতে তার কর্তব্যবোধ অত্যন্ত সজাগ।

চুপ করে রইল সুকোমল। রুচির শালীনতা বিসর্জন দিয়েছে

অনেকদিন আগেই, তবু একেবারে সামনাসামনি এ সব অমার্জিত কথার আলোচনায় এখনও অভ্যস্ত হয় নি সে। আস্তে আস্তে রক্ত জমতে লাগলো তার ফর্সা গালে, কানে, নাকের ডগায়।

—তা ছাড়াও একটা কথা, সুকোমলের নীরবতাকে আমল না দিয়েই বললেন দারোগা সাহেব—ল্যাখাপড়া জানা সা জুয়ান পোলা আপনে, বৌও নিশ্চয় সুন্দর?

মাথা নাড়লো সুকোমল।

—তবেই তো—দাড়িতে হাত বুলানো স্থগিত রেখে আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালেন শোভানাল্লা মিঞা, সুকোমলের কানে কানে বললেন—ধরেন যদি কোনো সুপিরিয়ার অফিসারের চোখ পইড়া যায় আপনের বৌর উপর, তখন?

শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠল সুকোমলের, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-জ্বালা। তার আরক্ত মুখ চোখের দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন শোভানাল্লা মিঞা। সুকোমলের প্রশস্ত পিঠে প্রচণ্ড চাপড় মেরে বললেন—ঠাট্টার ভরও সয় না বুঝি, এ্যাঁ?

একটু পরেই—তবে এ্যাক্কেবারে মিছাও কই নাই আমি। সুন্দর বৌ থাকলেই হয় সর্বনাশ, নয় পৌষ মাস। যে যেইটা চায়। দুই চাইরটা ঘটনাও জানি আমি। শুনবেন?

আর কিছু শুনতে প্রবৃত্তি হল না সুকোমলের। নিজের আপিস থেকে হেলমেটটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রোঁদে।

কিন্তু অনেক রাতে, রাউণ্ড দিয়ে বাসায় ফিরে য়ুনিফর্ম খুলে বিছানায় শুয়েও ঘুম এলো না অনেকক্ষণ। শোভানাল্লার কথাগুলো পাক দিয়ে আবর্তের সৃষ্টি করে চলল মগজের ভেতর। কানাঘুষোয়

যে সব শুনেছে সে এই লাইনে এসে তার আলোয় শোভানাল্লার সৎ পরামর্শ ফেলেও দেওয়া যায় না একেবারে।

সুজাতাকে আনা তাহলে স্থগিতই থাক কিছুদিনের জন্য। ওর তাগাদা বেজায়, চিঠির ওপর চিঠি। মনে মনে অন্ধকারেই হাসল সুকোমল। দিন সাতেকের ক্যাজুয়েল লীভ নিয়ে দেখা করে আসতে হবে ওর সঙ্গে।

নানান রোমাঞ্চময় রোমান্সের কথা ভাবতে ভাবতে বহু বিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ল সুকোমল।

টাউনবাবুর প্রধান কাজ সার্কেল ইন্সপেক্টর আর পুলিশ সাহেবের সঙ্গে রোজ সকালে একবার সাক্ষাৎ করে তত্ত্ব-তালাশ নেওয়া। এই তত্ত্ব-তালাশ নেওয়ার কাজটি যে ভাগ্যবান সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে বড়োসাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টি তার ওপর ঝরে পড়বে ছোটোখাটো রিওয়ার্ডের ভেতর দিয়ে। সার্ভিস বুক-এর বুক লাল হয়ে উঠবে আর সি, সি, রোলেও কোন না কোন দু'চারটি প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ হবে।

বড়ো কঠিন এই তত্ত্ব-তালাশ করা।

নমুনা মতো ঠিক রং-এর উল সমস্ত ঢাকা সহর তোলপাড় করেও জোগাড় করতে না পারার দরুণ প্রসন্ন তরফদার বদলী হয়ে গেল মাণিকগঞ্জ থানার নির্বাসনে থার্ড এস্ আই হয়ে। কালো কালির এক আঁচড়ে মারাত্মক রকমে জখম হ'ল: ওর কন্‌ফিডেন্সিয়াল ক্যারেক্টর রোল। মেম সাহেবের জুতোর ফিতে সময়মত পাঠাতে না পেরে অস্থায়ী দারোগা তালিবালি মিঞা ক্রশবেল্ট খুলে টাঙিয়ে

রাখলো দেয়ালের পেরেকে। হেলমেট খুলে পিগস্টিকার হ্যাট মাথায় চাপালো আট বছর বাদে! মালখানার হিসেব মেলাতে হিমসিম খেয়ে গেল বেচারা।

কোতোয়ালিতে যোগদান করার দিন থেকে পাক্কা দু'মাস সুকোমলকে তালিম দিয়েছে শোভানাল্লা মিঞা। চাকুরী জীবনে উন্নতি করবার অলিখিত সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছে বার বার। বলা যায়না এমন এক কারণে এই প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে সে।

—যা যা কইয়া দিলাম, গুরুবাক্যের মত পালন কইরেন। তালিম অন্তে নির্দেশনামা জাহির করল শোভানাল্লা মিঞা—আপনেগো লাহান ল্যাখাপড়া জানা অনেক দারোগা আইজ ডি, এস, পি···এস, পি অইয়া গ্যাছে খালি এই আপ্ত বাক্য মনে রাইখ্যা।

তরুণ শিক্ষার্থীর মতো নত মুখেই বসে রইল সুকোমল। বিদ্রোহ করতে চায় সুমার্জিত মন, জাগ্রত আত্মা। কিন্তু একটা অদৃশ্য নাগপাশ যেন পাকে পাকে বেষ্টন করে ফেলছে তাকে, একটা অদৃশ্য পরুষ হাত যেন তার মনের বিদ্রোহের টুঁটি চেপে ধরেছে।

এরপর কেটে গেছে কয়েক মাস, সুকোমলের মনের দিকে তাকালে মনে হবে কয়েক যুগ। একটার পর একটা পর্দা যেন তার মনের অনাবিল স্বচ্ছতাকে ঢেকে দিচ্ছে।

মা বাবা খুশী—সংসার খরচের জন্য; প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা পাচ্ছেন তাঁরা। ভাই-বোনেরা খুশী—তাদের সাধ-আহ্লাদ, পড়া-শোনা কোনটারই ব্যাঘাত হচ্ছে না। সস্ত্রীক জ্যাঠা, খুড়ো, মেসো,

পিসের দল গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, ঈর্ষার তীব্র জ্বালা সে নিঃশ্বাসের কাতরতাকে পুড়িয়ে দিতে পারছে না। বন্ধু-বান্ধবরা বলছে—সাবাস, সুকোমল বাহাদুর ছেলে বটে।

আর সুজাতা শুধু দুই চোখের প্রদীপ জ্বেলে সুকোমলের আসা পথ দেখছে।

গুণ্ডার খোঁজে সহরের বারবধূদের ঘরে ঘরে আকস্মিক হানা দেবার সময়ে গা ঘিন ঘিন করে সুকোমলের। অপ্রত্যাশিত লোকের সাক্ষাৎ পায় সেখানে। সংযত-বাক সরকারী কর্মচারী থেকে স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র পর্য্যন্ত তার বেড়াজালে ধরা পড়ে। মানুষের ওপর আস্তে আস্তে আস্থা হারিয়ে ফেলে সুকোমল।

তবু তো মাত্র এক বছর ধরে টাউন দারোগার কাজ করছে সে।

পুরানো পুলিশ সাহেব অবসর নিলেন। এলেন মধ্যবয়স্ক নতুন এস্. পি. আঢ্য সাহেব। কড়া ব্রাণ্ডের চুরুট খান তিনি, মেজাজটিও সেই অনুপাতে কড়া। সংগে এলো দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অজয়া।

প্রথম সাক্ষাতের দিন ভড়কে গেল সুকোমল। কড়া চোখে তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন আঢ্য সাহেব—

—তুমিই টি. এস্. আই! ষ্ট্রেঞ্জ! য়ু আর টু ইয়ং!

নীরবেই তার নবীনতার অপরাধ বহন করে সুকোমল।

কথাবার্তা হচ্ছিল সাহেবের বসবার ঘরের বারান্দায়। সিঁড়ির শেষ ধাপে এ্যাটেন্‌শনে্ দাঁড়িয়ে আছে হাবিলদার হনুমান সিং তার সাত ফুট লম্বা দেহ নিয়ে নিশ্চল গিরিশৃঙ্গের মতো।

—টি. এস. আই, এসেছে শুনলাম ডিয়ার—সহসা ভেতরের

ঘর থেকে নির্গত হল অজয়া। এলোমেলো করে জড়ানো শাড়ির অন্তরালে অত্যুগ্র বক্ষচূড়া মাথা তুলে আছে। ববড করা চুল ফ্যানের হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। ঠোঁট দুটি পলাশ-রাঙা, কিংশুক রাঙা নোখ। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে যৌবনের বাণ-ডাকা দেহ।

—দীস ইজ টি এস আই। ক্যান য়ু ইমাজিন? দাঁত দিয়ে চুরুট চেপে অস্পষ্ট সুরে বললেন আঢ্য সাহেব। ফস করে তাঁর দেশলাই জ্বলে উঠলো।

আর ঠিক তেমনি করেই জ্বলে উঠলো অজয়ার দুই চোখ। পূর্ণ-দৃষ্টিতে সুকোমলের দিকে তাকালো সে। মাথার চুল, কপাল, চোখ, নাক, চিবুক, বুক, সব একে একে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রসন্নতার আভা জ্বলল ওর মুখে। বলল—

—হি ইজ অল্ রাইট। তোমার সেই বুড়ো টি, এস, আই-র চেয়ে ভালো। আমার কাজ চলে যাবে ওকে দিয়ে। এই তোমার নাম কি?

কথার ধরণে গা জ্বালা করে ওঠে সুকোমলের তবু বিনীত সুরে বলল—এস্. আই. সুকোমল সিংহ।

—সিংহ! হাউ ফানি! তরল সুরে বলে উঠে নিজের মনেই খিল খিল খিল করে হেসে উঠলো অজয়া। আর প্রিয়ার তুষ্টি নিরীক্ষণ করে আঢ্য সাহেবের জলদগম্ভীর ওষ্ঠ প্রান্তে হাসির ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে কড়া অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে থেকে টাটিয়ে ওঠা পিঠ কোমর নিয়ে সুকোমল ভেবেই পেল না তার পদবীর মধ্যে কি এমন হাস্যরস লুকানো আছে।

—অল্ রাইট, ডিসমিস—অদূরে খানসামাকে চায়ের টেবিল বার করতে দেখে প্যারেড ভাঙার সুরে গর্জন করে উঠলেন আঢ্য সায়েব।

রাস্তায় এসে হনুমান সিং অনেকক্ষণ গুম হয়ে গোঁফে তা দিল। ভীমদর্শন এই হাবিলদারটি সহরের গুণ্ডা আর পকেটমারদের যম। গোঁফের বেশীর ভাগই পেকে গেছে, পেকে গেছে ছোটো করে ছাঁটা চুল।

—মেম্ সাব ঠিক নেহি—অবশেষে রায় দিল সে,—হুঁশিয়ার রহিয়ে হুজুর, হাম্‌কো ঠিক নেহি লাগতা। স্যালুট করে ফাঁড়ির দিকে রওনা দিল সে।

সাইকেলে চাপল সুকোমল।

অজয়ার সব সৌখিন ফরমায়েস। সুকোমল ছাড়া অন্য কেউ তামিল করুক এটা পছন্দ নয় তার। দিনের ভেতর সাত আটবার বড়োসাহেবের বাংলোর দৌড়ুতে হয় তাকে। কিছুদিনের ভেতরেই অমন ঘুঁদে ইন্সপেক্টার চেরাগ আলি পর্যন্ত সমীহ করতে সুরু করল তাকে। লাল কালিতে ভুল ইংরিজি ভরা কেস-ডায়েরীর 'কোয়েরী' আর আসে না তার কাছে, চায় না কথায় কথায় এক্সপ্লানেশন। সহকর্মীদের ঈর্ষার দৃষ্টি ছুঁচের মতো বেঁধে ওর মনে।

কিন্তু তারা তো জানে না যে রাশভারী কড়া মেজাজের আঢ্য সায়েব এখনও নিষ্করুণ তার প্রতি। শুধু মেমসায়েবের প্রশ্রয় ছায়ায় আছে বলেই কিছু ক্ষতি হচ্ছে না তার।

অজয়া ক্রমে ক্রমেই কেমন যেন সদয়া হয়ে পড়ছে তার প্রতি,

একটা অহেতুক অস্বস্তির সংগে টের পায় সুকোমল। অনেক বিজন মুহূর্তে এমন পোষাকে অজয়া থাকে যে চোখ তুলে তাকাতেও ভয় হয় সুকোমলের, কেবলি মনে হয় যে চোখ তুলে তাকাক সুকোমল এইজন্যই যেন অজয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তার সামনে, নীরব প্রশ্রয়ের ঢেউ-এর মালার মাঝখানে।

সারাদিনের দুরন্ত পরিশ্রমের পরও নিজের নিঃসংগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না সুকোমলের। কিসের একটা চিত্ত বিক্ষোভ ক্রমেই যেন তার বুকের মেদমজ্জার মাঝখানে পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে। একটা প্রচণ্ড রাক্ষসী ক্ষুধা যেন লেলিহান মুখব্যাদান করে ছুটে আসছে তাকে গ্রাস করার জন্য। ন্যায়, অন্যায়, বুদ্ধি-বিবেক তার:পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, মুখের ওপর পড়ছে তার সঘন তপ্ত শ্বাস। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ করে জেগে ওঠে সুকোমল। থানার পেটা ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং করে তিনটে বাজলো শুনতে পায়। বুড়ি-গংগার বুক থেকে উঠে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তার তপ্ত ললাটে স্নেহশীতল স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

পুলিশ সায়েব মফঃস্বলে গেছেন থানা পরিদর্শনে। অল্প আগে অতিক্রান্ত হয়েছে সন্ধ্যা। নির্মেঘ আকাশে জ্বলছে দ্বাদশীর চাঁদ। রমনার যান-বিরল পথে আর মাঠে জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সুবেশা তরুণ তরুণী। শিথিল-বদ্ধ কবরী লগ্ন পুষ্প-মালিকার ক্ষীণ-সুরভি নাকে এলো সুকোমলের। একটা তিক্ত নিঃশ্বাস পড়ল তার। তার য়ুনিফর্মের পকেটে কয়েক জোড়া বিভিন্ন মাপের উল বোনার কাঁটা মেমসায়েবের কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে সে।

সাহেব নেই তাই বাংলোর প্রদীপমালার অনেকগুলো বাতিই জ্বলছে না। মস্ত বাগানে শুভ্র-জ্যোৎস্না মায়া-চিত্র এঁকে চলেছে। অলস বাতাসে গাছের পাতা ঝির ঝির করে দুলছে। গেটের সামনে সেন্‌ট্রি এ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে খট্ করে স্যালুট করল সুকোমলকে।

বারান্দার কাছে বসেছিল আর্দালি বদরুদ্দিন। টক্ করে উঠে দাঁড়ালো টাউনবাবুকে দেখে। সেলাম করে মৃদু স্বরে বললে—মেমসাব দুবার খোঁজ করেছেন আপনার, ভেতরের ঘরে আছেন, যান।

কেমন যেন রহস্যময় মনে হ'ল বদরুদ্দিনের কণ্ঠস্বর।

মাঝের ঘরের আলো নেভানো। ভেতরের ঘরে একটা সবুজ আলো জ্বলছে দেখা গেল ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। গা ছম ছম করে উঠলো সুকোমলের, বুকের ভেতরটা কেন যেন তোলপাড় করে উঠলো হঠাৎ। পা টিপে টিপে এগিয়ে নিঃশব্দে দরজার পাল্লা খুলে চৌকাঠের ওপর দাঁড়ালো সে।

বিছানায় আধশোওয়া হয়ে আছে অজয়া তারই দিকে মুখ করে। কোমর থেকে শরীরের উর্ধাংশ একেবারেই নিরাবরণ, শুধু গলার মুক্তার কণ্ঠির ওপর সবুজ আলো মায়াময় আলপনার দ্যুতি বিকিরণ করছে। কুসুমিত পুষ্প-বল্লরীর মতো উন্নত বক্ষচূড়ায় সুকোমলের দুই চোখ আটকে গেল। মনে হোলো যেন দুটি কামনার বহ্নিময় শিখা অনির্বাণ জ্বলছে। অজয়ার কুঞ্চিত ঠোঁটে বিচিত্র হাসি।

কয়েক মুহূর্ত সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সুকোমল। তারপর এক ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সহস্রফণা বাসুকীর নিঃশ্বাস-তপ্ত বিছানার ওপর।

হঠাৎ বওয়া দমকা হাওয়ায় বাগানের দিকে জানালার পর্দা

ফেঁপে ফুলে উঠলো। দেয়ালে ঝুলানো পুলিশ সাহেবের একটা বাঁধানো ফটো পেরেকের আশ্রয় হারিয়ে মেঝের ওপর ঝন ঝন শব্দে গুঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু সে শব্দ কানে গেল না কারুর!

× দ্বন্দ্ব
×
×
×
×
×
×
×
×
×

কাঁচের মত স্বচ্ছ সবুজ শাড়ির ভেতর দিয়ে জাফ্রান রঙের ব্লাউজ স্পষ্ট দেখা যায়। লাল রঙের বাটার চটিজোড়া পড়ে আছে এক পাশে, আর সাদা মসৃণ পা দুটো লেকের জল ছুঁই ছুঁই করছে। নরম সবুজ ঘাসের গদীতে বসে আছে ওরা দু'জন—পাশাপাশি, একটু-বা ঘেঁষাঘেঁষিও।

একটা ঘাসের শীষ ছিঁড়ে তাই দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে কমল বলল, "কেন রাজী হচ্ছ না তুমি মলিনা, কিসের বাধা তোমার?"

সাদা আদ্ধির পাঞ্জাবীর একটা কোণ ফুরফুর করে উড়ছে অল্প হাওয়ায়। উড়ছে ওর প্রশস্ত ললাটের ওপর খসে-পড়া দু'তিন-গাছি চুল।

বিদায়-চুম্বনে আবির-রাঙা পশ্চিম আকাশের মায়া কাটিয়ে অন্য দিগন্তের সন্ধানে ডুব দিয়েছেন সূর্যদেব। বিচ্ছেদের করুণ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চার পাশে।

কালো হয়ে আসা লেকের জলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপ করে বসে আছে মলিনা দোলায়মান চিত্তে। কমলের আবেগতপ্ত কণ্ঠস্বরে যেন জাদু আছে—ভুলিয়ে দেয় সমাজ-সংসার, বিশ্বভুবন। অন্ধকার

রাত্রে বিদ্যুৎ-বিদারণরেখার মতই আবার ওর সাবধানী মন হাতছানি দেয়। সব কিছু ভুলতে গিয়েও ভোলে না মলিনা। উষ্ণ কম্পিত নিঃশ্বাস পড়ে একটা।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠে কমল। মলিনার আনত মুখের দিকে তাকায় একবার। বুঝি বা অনুভব করে ওর চিত্তের গভীর আলোড়ন। আস্তে আস্তে মলিনার বাঁ হাতখানা তুলে নেয় নিজের ডান হাতের মুঠোয়। বলে, "দূর কর তোমার এই দ্বিধা, মলিনা। চল আমরা ভেসে পড়ি নামহীন ঠিকানায়, অজানার উদ্দেশে।"

কমলের হাতে-ধরা মলিনার বাঁ হাতখানা থরথর করে কেঁপে ওঠে। চাপা, কাঁপা গলায় বলে, "আমাকে আর একটু সময় দাও কমল, ভাবতে দাও আমাকে আরও একটু···" .

ওর গলার স্বর যেন নদী-জলে পড়া সূর্যের পলাতক আলো। ঝিরঝির করে ঝরে-পড়া এক পশলা বৃষ্টির মত ভিজিয়ে দিল কমলের মন, তবু নিজেকে সংযত করে কমল বলল. ভাবতে গেলে ভাবনার শেষ খুঁজে পাবে না মলিনা। ভাবনা হ'ল একটা অতলস্পর্শী খাদ। যতই নামো, তল খুঁজে পাবে না তার। শুধু তাই নয়, ভাবনাই মনকে করে তোলে দুর্বল। ভেবে কেউ কোন দিন মন স্থির করতে পারে নি। ভাবনাচিন্তা বিসর্জন দিয়ে ভেসে পড় জীবন-স্রোতে। দেখবে, ঠকবে না তাতে তুমি।"

আবার দুলে ওঠে মলিনার মন। আবেগের বিপুল বন্যায় ভেসে যাবে বুঝি সে। তবু আবার অনির্ণেয় অনুভূতির স্তরে আটকে যায় তার মন।

ওর মনের অর্ধেকটা প্রথম প্রণয়ে আরক্ত আবেশ বিহ্বল, কিন্তু

বাকি অর্ধেক জুড়ে রয়েছে দ্বিধা আর সাবধানতা। বাস্তব-বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোয় উজ্জ্বল সেদিক।

তাই চট করে সায় দিতে পারে না কমলের প্রস্তাবে।

সন্ত ডোবা সূর্যের কথা ভাবে সে।

তারই মত যদি ডুব দেয় কমল তার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকার করে?

তরল অন্ধকারে হেসে ওঠে কমল। ঝকঝকে দাঁতের অস্পষ্ট ঝিলিক যেন দেখা দেয়। বুঝি ও পড়ে ফেলেছে মলিনার চিন্তার লিপি। বলে, "চেয়ে দেখ ঐ রাস্তার দিকে, এমনি অজস্র আলোয় শতনরী হার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কলকাতা শহর ভুলেছে তার দিবসের সঙ্গীত বিচ্ছেদব্যথা। চেয়ে দেখ, উজ্জ্বল যৌবনে ঝলমল করছে মহানগরী। কিসের এত ভয় তোমার? কেন একটা প্রদীপশিখার মত জ্বলে ওঠ না তুমি? নিঃশেষে পুড়েও যদি যাও, তোমার ক্ষণিক অনিন্দ্যদীপ্তি তো পাবে শাশ্বত সৌন্দর্যের অধিকার।"

ওর নরম উষ্ণ ঘামে ভেজা হাতে মৃদু চাপ দেয় কমল। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায় মলিনার সমস্ত শরীরে। বাঁধ-ভাঙা বন্যার বেগে ভেসে যেতে চায় সমস্ত প্রতিরোধ।

চট করে উঠে দাঁড়ায় সে। ছুরির ফলার মত ইস্পাতি দ্যুতি-ভরা চোখ ফিরিয়ে নেয় কমলের কেমন হয়ে যাওয়া মুখের উপর থেকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি মুহূর্ত। তারপর ধীর পদে এগিয়ে যায় রাস্তার দিকে।

কমল আসে পিছু পিছু। উৎসাহহীন অবসাদে ভরে ওঠে ওর মন।

বাসে উঠতে উঠতে কমলের মুখের দিকে একবার তাকায় মলিনা। ব্যথায় সকরুণ তার চোখের চাওয়া। মৃদু কণ্ঠে বলে, "আগামী শনিবার···"

ব্যাকুল আগ্রহে কমল কিছু বলবার আগেই ছেড়ে দেয় বাস।

হতাশ মনে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় কমল। দুঃসহ জ্বালায় পুড়তে থাকে তার বুকের ভেতরটা।

কালীঘাটের কাছাকাছি একটা সরু অন্ধকার গলিতে ঢোকে মলিনা। অল্প এগিয়ে ডানহাতি একটা বাড়ীতে ঢুকল সে। স্যাঁতসেতে উঠানটুকু পেরিয়ে যে ঘরে ঢুকল, সে ঘরের বায়ুস্তরে এখনো আটকে আছে চার ভাড়াটের বিকেলবেলার উম্নুন ধরাবার কয়লার ধোঁয়া।

লণ্ঠনের আলোয় চাল বাছছিলেন মলিনার মা। মলিনাকে দেখেই খনখনে গলায় বলে উঠলেন, "দিন দিন তোর হচ্ছে কি বলত মলু, রাত আটটায় বাড়ী ফেরা—"

"একটা কেস ছিল মা,—" শ্রান্ত সুরে কথা কয়টি বলে দড়ির আলনা থেকে আটপৌরে শাড়ি সেমিজ নিয়ে পাশের ছোট্ট কুঠুরিটায় ঢুকল মলিনা।

কেসের নামে চুপ করে গেলেন মলিনার মা। লোকান্তরিত স্বামীর কথা মনে পড়ল তাঁর। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে কুলোয় রাখা বাছা-আবাছা চালের দিকে আনমনে চেয়ে রইলেন তিনি। চশমার কাচ দুটি বাষ্পের আর্দ্রতা মেখে অস্বচ্ছ হয়ে গেল।

মা আর মেয়ের সংসার। তবু খরচ বড় কম নয়। বছর-দেড়েক

আগে বাবা মারা যাওয়ার সময়ে আই-এ পড়ছিল মলিনা আশুতোষ কলেজে। অনেক স্বপ্নের অঞ্জন লেগেছিল তার চোখে—প্রথম যৌবনের আশা আর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাস্তব তার প্রথম আঘাতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল সব কিছু। ওর বাবা ছিলেন কোন এক সওদাগরী আপিসের কেরানী। অবসর সময়ে ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। শেষের দিকে এইটাই তাঁর মুখ্য উপার্জন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর যখন তিনি মারা গেলেন তখন অর্থের অনটন দেখা দিয়েছে সংসারে। পড়া ছাড়তে হ'ল মলিনাকে। ধরাধরি করে সেই কোম্পানীরই এজেন্সি নিল সে। টুকটাক সে দু'চারটা কেস পায়, তাই দিয়ে কোনমতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে সংসারের চাকা।

মোটা মিলের শাড়ি আর মার্কিনের সেমিজ-পরা মলিনাকে মলিনই দেখাচ্ছে এখন। বারান্দায় গিয়ে চোখ মুছে জলের ঝাপটা দিয়ে মুছে ফেলেছে স্বল্প প্রসাধন। সারা দিনের ক্লান্তি হরণ করেছে তার চোখের দীপ্তি।

সুজনী-বিছানো তক্তপোষের এক প্রান্তে বসল সে পা ঝুলিয়ে।

"বিজনবাবু এসেছিল আজ, অনেকক্ষণ বসে ছিল তোর অপেক্ষায়—" মলিনার মুখের দিকে চশমা-পরা চোখ দুটি একবার তুলে তেমনি মাথা নীচু করে চাল বাছতে বাছতে বললেন, মলিনার মা,—"হাঁ বা না পষ্টাপষ্টি জানতে চায় সে।"

চুপ করে রইল মলিনা। তার মনের সাবধানী অংশ হঠাৎ যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

বিড় বিড় করে বলতে থাকেন মলিনার মা,—"সত্যিই তো।

দেরি করা তো আর চলেও না তার, ছেলেমেয়ে ক'টির দিকে আর তাকানো যায় না। অযত্নে অবহেলায় এমনি হয়েছে তারা।”

মলিনার প্রণয়ের আগুনে রাঙা মনের অর্ধাংশের উপরে তার সাবধানী মনের অর্ধেক যেন একটা কালো ছায়া বিস্তার করে চলেছে। তারুণ্যদীপ্ত কমলের মুখখানা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে প্রৌঢ় বিজনের বহু অভিজ্ঞতার চিহ্নভরা মুখ।

নিকটেই দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি থাকে বিজন বোস। বড় ব্যঙ্কে ভাল মাইনেতে কাজ করে। পঁয়তাল্লিশ ছুঁয়ে ফেলবে সে অনতিবিলম্বে। সম্প্রতি বিপত্নীক হয়ে তিনটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে ভদ্রলোক। মলিনার বাবার পুরানো মক্কেল সে। সেই সুবাদে জানাশোনা ছিল মলিনাদের সঙ্গে। যাকে এত দিন বাৎসল্য-রসাপ্লুত চক্ষে দেখে এসেছে, তাকেই আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছে প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে। পরিণয় পর্যন্ত এগিয়ে যাবার ইচ্ছায় ঘোরাঘুরি করছে মলিনার মায়ের কাছে। মায়েরও অমত নেই। নির্ঝঞ্ঝাটে গলা থেকে মেয়েটার নেমে যাবার সম্ভাবনায় বেশ একটু খুশীই তিনি।

এখন মলিনা রাজী হলেই—শেষ কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধাটি অপসারিত হয়।

“তা হলে কি বলিস ?” আবার প্রশ্ন করেন মলিনার মা,—“কি বলব তাকে ?”

চিন্তায় তলিয়ে থাকা মনটা চমকে ওঠে। অসহায়ভাবে চার-দিকের হলদে দাগ-ধরা দেয়ালের দিকে তাকায় মলিনা। দেয়াল-গুলি যেন ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে তার দিকে একেবারে পিষে

ফেলবার জন্য।

চকিতে আবার ভেসে ওঠে কমলের শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। ওর মুখে যেন আছে এই শ্বাসরোধকারী চার দেয়ালের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তির আশ্বাস—বাইরের অফুরন্ত আলো আর সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসের সম্ভাবনা।

এম-এ ক্লাসের ছাত্র কমল ব্যানার্জী। ধনী পিতার সন্তান। একটা পলিসির তীর দিয়ে তাকে গাঁথতে গিয়ে কি ভাবে যেন নিজেই গেঁথে গেল মলিনা। গভীরতর হ'ল ওদের পরিচয়। মনের একটা অদ্ভুত অস্থিরতা, আবেপ-কম্পিত শরীরের অসহ্য পুলকানুভূতি একেবারেই নতুন মলিনার কাছে! লক্ষ্যহারা ভাবের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল ওরা দু'জনে। হঠাৎ কঠিন তীরভূমি থেকে বিজনের গদ্যময় প্রস্তাবটা এসে মারাত্মক আঘাত হানল ওদের দু'জনার সম্পর্কের উপর।

কমলের সঙ্গে মিলনে রয়েছে দুরতিক্রম বাধা। মলিনা কায়স্থ আর কমল ব্রাহ্মণ। বর্ণের এই বাধার চেয়েও যেন বড় হয়ে দেখা দিল আর একটা কি বাধা—কিছুতেই যাকে অতিক্রম করা যায় না।

রূঢ় বাস্তবের এই প্রচণ্ড ধাক্কাতেই মলিনার মনে চিড় দেখা দিল। তারপর কি করে যেন অলক্ষিতভাবে দু' ভাগ হয়ে গেল ওর মন। এক অংশে সাবধানতার উদ্যত তর্জনী আর অন্য অংশে ভাব-রোমান্সের অন্তহীন কল্পনা। এই দুই মনের অনুক্ষণ সংঘাত-সংঘর্ষে হাঁপিয়ে ওঠে মলিনা।

"চল আমরা পালিয়ে যাই এ কলকাতা ছেড়ে"—আবেগ কম্পিত সুরে বলে কমল। মলিনার হাতখানা শক্তভাবে ধরে।

"চলে যাব বহু দূরে, অজানা এক জনপদে। সেখানে আমরা বাঁধব বাসা। দিনের উপার্জন নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরব ঘরে—সেখানে দুই চোখের শান্ত প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকবে তুমি আমার প্রতীক্ষায়। তোমার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চোখের স্নিগ্ধ চাওয়ায় আমার শান্তি যাবে ঘুচে। নাই-বা পেলাম সমাজের আশ্রয়। তোমার আমার সঙ্গ-সুখের আনন্দে দূর হয়ে যাবে অন্য সব অভাববোধ।"

সর্বনাশা এ প্রস্তাবে বুক কাঁপে মলিনার। বিদ্যুৎবহ্নির মত দীপ্ত আবেগে কেঁপে ওঠে ওর সমস্ত শরীর। ভুলে ওঠে ওর সাবধানী মনের অর্ধাংশ। সম্ভব অসম্ভব সীমারেখা যায় মুছে। উদ্গত অশ্রুবাষ্পে অস্পষ্ট হয়ে আসে কমলের কোমল মুখখানা।

তবু মত দিতে গিয়েও দিতে পারে না মলিনা। প্রতিরোধের শেষ সীমায় এসে মন তার ছুটতে থাকে বিপরীত দিকে। আকর্ষণের পরে আসে বিকর্ষণের পালা।

বিজন বোসের প্রস্তাবটার আকর্ষণ যেন দুর্নিবার। সেখানে আছে নিশ্চয়তার দৃঢ় ভিত্তি। কঠিন তার স্পর্শ। সামাজিক স্বীকৃতি যেন সে প্রস্তাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

কমলের প্রস্তাব যেন একটা মধুর স্বপ্ন। তাতে আছে অসহ্য সুখের জ্বালা। হাল্কা মেঘের ভেলায় চেপে পরিণামহীন ঠিকানায় ভেসে যাবার আনন্দ। তবু একটা বৃহৎ সংশয় যেন মুখব্যাদন করে আছে। সে সংশয় অনিশ্চয়তার।

এই দ্বিমুখ স্রোতে ভাসছে মলিনা আজ এক মাস। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে প্রেমাস্পদের সঙ্গে নিরুদ্দেশযাত্রায় রোমাঞ্চকর ভাব-বন্যায় মাঝে মাঝে ভেসে যায় সে। আবার অলক্ষিতে কোন মুহূর্তে

পা ঠেকে যায় বিজনের প্রস্তাবের শক্ত মাটিতে। তখন আকাশ-চারী কল্পনাকে মনে হয় নিত্যস্তই অবাস্তব।

আজ এসেছে সব সংশয় ছিন্ন করবার দিন। লণ্ঠনের হলদে আলো মায়ের মুখে চোখে পড়েছে। শান্ত সংযত তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে একটা নিবিড় তৃপ্তি।

সুমুখের বিবর্ণ দেয়ালে বাবার ছোট্ট বাঁধানো ফটোটার দিকে চোখ গেল মলিনার। গাঁদাফুলের শুকনো মালাটি একে-বেঁকে আছে ফ্রেমের গায়ে।

একদিকে সমাজ-অনুশাসিত শান্ত নীরব গৃহকোণে। মনে তৃপ্তি না থাক সংযম শুচিতায় ঘেরা। অন্যদিকে সমাজদ্রোহের দীপ্ত শিখায় অসহ্য সুখের জ্বালায় পুড়ে মরা।

কোনটি ? কোনটিকে বরণ করবে আজ মলিনা ?···

প্রায় অস্পষ্ট ফিস ফিস সুরে মায়ের কানে কানে মলিনা বলল, "অমত নেই। বলে দিও বিজন বাবুকে।"

অনেক, অনেক দিন পরে স্বপ্নহীন নিবিড় অতল ঘুমের মাঝে তলিয়ে গেল মলিনা।

× বন্ধ্যা আকাশ
×
×
×
×
×
×
×
×
×

সুতো বাঁধা ঘুড়ির মতো মনটা যতই না কেন কল্পনার বিশাল আকাশে উড়ুক, যতই ওপরে উঠুক, দেহটা কিন্তু আটকে থাকে পৃথিবীর বাস্তবতার লাটাই-এর বন্ধনে। কবে কেটে যাবে এই বন্ধন-সূত্র, কবে তার মন এক নামহীন ঠিকানার উদ্দেশ্যে গা ভাসিয়ে দেবে বসে বসে তাই শুধু ভাবে মুকুল।

ফোঁশ ফোঁশ করতে করতে ক্লান্ত ইঞ্জিনটা নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামে। কামরাগুলি থেকে পিল পিল করে নেমে আসে অসংখ্য মানুষ, ছড়িয়ে পড়ে, ভরে ফেলে বিশাল প্ল্যাটফর্মের প্রত্যেকটি কোণ। গোলমালে, চীৎকারে, লক্ষ লক্ষ শব্দের টুকরোতে গম গম করতে থাকে ঢেউ-টিনে ঢাকা জায়গাটুকু।

মানুষেয় ছুটোছুটি আর ব্যস্ততার ভিড়ের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে মুকুল। এই হাজার হাজর লোকের প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় যাচ্ছে, যাচ্ছে প্রেম অথবা প্রীতির নীড়ে, এমন কি ওই নিষ্প্রাণ ইঞ্জিনটা আর রেলের কামরাগুলোও ফিরে এসেছে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে, কিন্তু ঠিকানা নেই মুকুলের, নেই কোন আশ্রয়। অবলম্বনহীন স্রোতের ফুলের মতো এ ঘাট থেকে

ও ঘাটে ঘুরে ঘুরে মরছে, কেউ তাকে তুলে নিল না, জীবন দেবতার পায়ে সমর্পণ করে দেবার জন্য এগিয়ে এলো না কেউ।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু নেই,—বর্তমানকে যতক্ষণ ভুলে থাকতে পারে ততক্ষণই স্বস্তি। মুকুল ফিরে তাকায় সেই অতীতের দিকে, যখন তাদেরও লোকে মানুষ বলে ভাবত, কাছে টেনে নিত আপনজন বলে, না চাইতেই পেত স্নেহ ও প্রীতির উত্তাপ, যে কোনো কঠিন দুঃখের জমাট তুষার গলে যেত তার স্পর্শে।

একে একে কতোগুলো বছরই না পার হয়ে গেল, তবু মনের ভেতর অম্লান দীপ্তি নিয়ে ঝলমল করতে থাকে জীবনের ক্ষণ-বসন্তের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি। কালের স্থূল হস্তাবলেপে কিছুমাত্র ম্লান হয়নি তারা,—মনে পড়লেই মনের তারাগুলো সব সুর বাঁধা সেতারের মতো টান হয়ে ওঠে, উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে সেই পরম ক্ষণটির জন্য যখন সুকুমার এসে তার নিপুণ দরদী আঙ্গুলে সেই তারে তুলবে সুরের ঝংকার,—সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে দেবে সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতে।

কিন্তু জীবনের পিপাসা শুধু স্মৃতির রসেই মেটে না। একটি মাত্র নববর্ষার বারিপাতে তরুলতার তৃষ্ণা চিরদিনের জন্য মেটে না,—তার পরিপুষ্টির জন্য চাই প্রতি বর্ষার নব বারিধারা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুকুল, পরনের ধূলিমলিন শতচ্ছিন্ন শাড়িটার দিকে তাকায়, তাকায় খড়ি ওঠা শিরা বার করা নিরাভরণ হাত দুটোর দিকে, আয়নায় মুখ দেখেনি বহুদিন,—রুক্ষ চুলের ফ্রেমে আঁটা বাদামী মুখটা ঠিক কি রকমটি দেখতে হয়েছে এখন তা মুকুল

জানে না, জানে না বড়ো বড়ো চোখ দুটির কোলে কতখানি কালি জমেছে,—যে চোখ দেখে সুকুমার একদিন ....

চোখ তুলে নিজের চারধারে তাকায় মুকুল। এখানে ওখানে ছেঁড়া খোঁড়া নোংরা চটের বেড়া হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। ভাঙ্গা তোরঙ্গ আর কুড়িয়ে আনা বেতের চুবড়ি দিয়ে আজ সীমানা চিহ্নিত করেছে নতুন যাযাবরের দল। প্ল্যাটফর্মের এক ইঞ্চি জমির দখলের জন্য ঝগড়া কোন্দলের অন্ত নেই এখানে, এক টুকরো গুড়ের ওপর এক ঝাঁক মাছির মতো বিন্ বিন্ করছে মানুষগুলো, বিঘে বিঘে ধানের ক্ষেত হারিয়ে এক টুকরো খড়ের জন্য বাদ বিংসবাদের আর অন্ত নেই তাদের।

কিন্তু শেয়ালদার এই জনারণ্যের মাঝে কোথায় লুকিয়ে আছে সুকুমার। তার সন্ধান কে এনে দেবে মুকুলকে? এই বন্দীশালার বাইরে আছে বিশাল কলকাতা, তারও বাইরে আছে গোটা পশ্চিম-বঙ্গ। মানুষ,—মানুষ,—শুধুই মানুষ,—দেখে দেখে হাঁপিয়ে ওঠে মুকুল। লক্ষ মুখের অপরিচয়ের গুণ্ঠন খুলে একটি মুখের পরিচিতির সন্ধান করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। আকাঙ্ক্ষাকে দুর্নিবার করে তুলতে কোনো কার্পণ্য নেই প্রকৃতির, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিতকে খুঁজে নেবার কোনো শক্তি দিতে যেন ভুলে গেছে।

জয়দেবপুর গ্রামের মেয়ে মুকুলের সঙ্গে ঢাকার শহুরে ছেলে সুকুমারের অনুরাগের ইতিহাসের সঙ্গে পৃথিবীর আরও দশটা প্রেমের ইতিহাসের অমিল নেই কোনো। মামার দেশের গ্রামে যাওয়া আসার ফাঁকে কোন এক অলক্ষ্য মুহূর্তে মুকুলের সঙ্গে তার হৃদয় বিনিময় হয়ে গিয়েছিল, ফুটে উঠেছিল নবীন অনুরাগের স্বর্ণ

চাঁপাগুলি,—বন্ধনহীন জীবনের মধুমাস ক'টি রঙ্গে রসে ভরে দিয়েছিল তারা। প্রচ্ছায় প্রদোষে আম্র মুকুলের গন্ধে মিশে গিয়েছিল মুকুলের অঙ্গ-সুরভি। দিগন্ত জোড়া নবীন ধানের মঞ্জরীর ব্যঞ্জনা গানে মিশে গিয়েছিল সুকুমারের গভীর মৃদু কণ্ঠস্বর। কুহেলিঝরা শীতের সকালে ধূ ধূ করা বেলাই বিলের কোল থেকে ওঠা নতুন সূর্যের রক্ত করস্পর্শে অভিসিঞ্চিত হয়েছিল ওরা দুজনে, দুটি হৃদয়ের গোপন অনুরাগের রক্তিমাই যেন ছড়িয়ে পড়েছিল মুকুল-সুকুমারের মুখে।

কিন্তু নবীন অনুরাগের ওপর জীবন দেবতার বুঝি অভিশাপ আছে, ঢাকা ইয়ুনিভার্সিটি থেকে বি. এ. পাশ করে চাকরীর খোঁজে কলকাতায় পাড়ি দিল সুকুমার, আর বিরহখিন্ন মুকুলের দু'চোখে নামল শ্রাবণের অশ্রুধারা। সে অশ্রু শুকিয়ে গেল সুকুমারের চিঠি পেয়ে, কিন্তু প্রিয়-বিরহের খাঁ খাঁ করা শূন্যতা ভরে তুলতে পারে কোন চিঠি!

চিঠিতে সুকুমারের আশ্বাস আর নিজের প্রেমে মুকুলের অচলা বিশ্বাস—এই দুই পাখায় ভর করে উড়ে গেল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

এর পর এল সেই ভয়ানক দিন। শিব এসে দেখা দিলেন রুদ্র বেশে, নটরাজের নর্তনশীল বাঁ পায়ের আঘাতে দু'টুকরো হয়ে গেল বাংলা দেশ। অল্প দিন পরেই প্রলয়ের অন্ধকারে ডুবে গেল গোটা পূর্ব বাংলা,—মান সম্মান, আশ্রয় সব গেল ডুবে। যে বিশ্বাস মানুষের সবচেয়ে বড়ো আশ্বাস তার মূল গেল সরে, দেখা দিল সর্বনাশের অতল কালো গহ্বর। অনেকে গেল তার ভেতর তলিয়ে

আর প্রাণপণে ছুটে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইল আরও অনেকে !

ঢাকা জেলার অখ্যাত গ্রাম জয়দেবপুর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা,—মুকুল তার মা আর ছোটো ভাই। রয়ে গেলেন মুকুলের বাবা,—তাঁর তপ্ত রক্তের অর্ঘ গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন যেন বাস্তু দেবতা। চোখের জল মুছবারও অবসর পেলেন না মুকুলের মা, মুকুল আর তার ছোট ভাই-এর কথা ভেবে নতুন যাযাবর দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন তিনি।

সেই থেকে শিয়ালদার হট্টগোলের মাঝখানে ঠাঁই করে নিয়েছে মুকুলরা। সারা দিনের ভিড় আর কোলাহলে প্রথমটা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল ওরা, এখন গা সওয়া হয়ে এসেছে অনেকটা। অন্তঃপুরিকার স্থায়ী আসন পাতা হয়ে গেছে রাজপথের মাঝখানে।

তবু, এত দেখে, এত শিখে নগর-সভ্যতার ভয়ানক রূপ দেখে মাঝে মাঝে ঘৃণা ও সংকোচে মুখ লুকিয়ে থাকতে চায় মুকুল, পালিয়ে যেতে চায় চারদিকের নারী-মাংসলোলুপ শিকারীদের বেড়াজাল কেটে।

কিন্তু তা হয় না, তাদের জ্বল জ্বল চাহনী যেন রঞ্জন রশ্মির মতো জীর্ণ বস্ত্রের আবরণ ভেদ করে তার শরীরের অস্থি সন্ধিতে বিচরণ করতে থাকে,—মগ্ন চেতনায় নগ্নতার লজ্জা জাগে,—কলুষের অগ্নিক্ষরা নিঃশ্বাসে দগ্ধ হতে থাকে মুকুল।

শুধু রাতে, অনেক রাতে অচেতন শিয়ালদা ষ্টেশনের প্রকাণ্ড উঁচু শেডগুলির নীচে সারি সারি দীপ্ত উজ্জ্বল আলোকমালা দেখতে দেখতে ফেলে আসা গ্রামের দিগন্ত জোড়া ঘনশ্যামল মাঠের ওপর নত হয়ে পড়া আকাশের লক্ষ নক্ষত্রের দীপ্তি মনে পড়ে যায় মুকুলের।

আর ঠিক তখনই মনের পটে ভেসে ওঠে,—সুন্দর ফুলের মতো ফুটে ওঠা একখানি মুখ,—যৌবনের ঐশ্বর্যে দীপ্ত ঝলমল সে মুখখানি সুকুমারের। শক্ত সিমেন্টের ওপর বিছানো ছেঁড়া কাঁথার শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঘুম নামে না মুকুলের চোখে; এত লাঞ্ছনা, এত অবমাননার পরেও হৃদয়ের নিভৃতে যে মধুভাণ্ডটি অক্ষয় হয়ে আছে তার সন্ধান পেয়ে অবাক হয়ে যায় সে। ধীরে ধীরে দু ফোঁটা অশ্রু দুই চোখের কোণে এসে জমে, তারপর মুদিত চোখের প্রান্ত বেয়ে, ঘননিবিড় পক্ষ্ম ভিজিয়ে উপবাস শীর্ণ গাল বেয়ে নেমে আসে।

বেলা প্রায় দশটা। এইমাত্র একটি লোকাল ট্রেন এসে থেমেছে। হৈ হল্লা চীৎকারে গম গম করছে চারধার। ব্যস্ত পায়ে সংকীর্ণ পথটুকু পার হবার সময়ে দু'ধারের বাস্তুহারাদের অস্থায়ী বাস্তুর দিকে উদাসীন চোখে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে আপিস যাত্রীরা। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া শাড়িখানা দিয়ে তেইশ বছরের ক্ষুধাশীর্ণ কিন্তু অপরাজেয় যৌবনকে ঢেকে ঢুকে রাখবার দুরূহ চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল মুকুল। অল্প দূরের বেঞ্চিতে বসে আছে সেই পাজী লোকটা আজ কয়েক দিন ধরে ইসারা ইঙ্গিতের স্পষ্ট নির্লজ্জতায় অশিষ্ট হয়ে উঠেছে সে, সামান্যতম প্রশ্রয়ের গন্ধ পাবার আশায় বুনো কুকুরের মতো শোঁক শোঁক করে বেড়াচ্ছে। যে সমাজ ভেঙ্গে গেছে, তলিয়ে গেছে তারই আজন্ম চর্চিত সংস্কার আর কতদিন রক্ষা করতে পারবে মুকুলকে।

হঠাৎ ছোটো ভাই কানু মুকুলের হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়ে উত্তেজিত সুরে বলে ওঠে,—"দিদি, ছাখ ছাখ, চাইয়া ছাখ,—আমাগো সুকুমারদা না?"

চমকে উঠে মুকুল, বুকের স্পন্দন বুঝি মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে দ্বিগুণ বেগে চলতে থাকে, যাত্রীদের জটলার বাইরে মুটে মজুরদের ভীড়ের দিকে তাকায়। সেখানে অনেক লোকের ভীড়ের ফাঁকেও পলকমাত্র তাকিয়ে নিঃসংশয় হবার আনন্দ দীপ্তি খেলে যায় ওর শীর্ণ মুখে।

লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মতো সে দিকে ছুটে যায় ছেঁড়া ইজের পরা খালি পা কানু, উৎসাহের আবেগে সুকুমারের হাত টেনে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,--"সুকুমারদা।—কই আছিলেন একদিন? আমরা কত খুঁজছি আপনেরে। ওই ছ্যাখেন দিদি—"

নোংরা জটাভর্তি ছেলেটার মুখে আশ্চর্য চোখে তাকাল ভদ্র, সুবেশ সুকুমার, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ এড়িয়েও গ্রাম্য স্বাস্থ্যের সুন্দর শ্রী উঁকি দিচ্ছে ওর খুশী হওয়া মুখে চোখে, আবেগ কম্পিত সারা শরীরে। তারপর তার প্রসারিত বাঁ-হাত-মুখী তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করতেই দেখতে পায় আশা আর উদ্বেগে উজ্জ্বল করুণ এক জোড়া চোখ। গভীর উত্তেজনায় ওঠা পড়া বুকের স্পন্দনও বুঝি চোখে পড়ে।

নিশিতে পাওয়া লোকের মতো কানুর হাতের টানে মুকুলের দিকে এগিয়ে যায় সুকুমার, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ে প্রস্ফুট কমলিনীর মতো মুকুলের মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকে। স্মৃতির সমুদ্রে সাঁতার কাটা মন চলে যায় দূর অতীতে, বহু যোজন পশ্চাতে।

"মুকুল!"

সব ভোলা মনের গভীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে একটিমাত্র

শব্দ, আর তার অনুরণনে কাঁপতে থাকে মুকুলের সর্ব শরীর।

"কী ব্যাপার! তোমরা এইখানে, এই নরকে কদ্দিন ধইরা আছ?" আস্তে আস্তে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অবহিত হয়ে মৃদুকণ্ঠে সুকুমার বলে ওঠে এক সঙ্গে।

অসহ্য সুখের আবেশে মুকুলের 'চোখ দুটো জলে ভরে আসে। মুখ নামিয়ে নেয় সে। তার রুক্ষ চুলের প্রকাণ্ড খোঁপাটি দেখে কতো কথাই না মনে পড়ে সুকুমারের, বুকে দোলা জাগানো কত না সুখস্মৃতি। বোবা ব্যথায় মুকুলের শিরা ওঠা নিরাভরণ হাত দু'খানার থর থর কম্পন লক্ষ্য করে সে।

এমন সময়ে মুকুলের মা এসে সুকুমারকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান প্রথমটায়। পরক্ষণেই আনন্দ-বিস্ফারিত-হৃদয় কানুর মুখে তার এই আবিষ্কারের সহর্ষ আত্মগৌরব ঘোষণা শুনতে শুনতে হাসি ফোটে তাঁর মুখে, সস্নেহে বলেন,—"তাই ক, তুই ছাড়া এই ভিড়ের মধ্যে সুকুমাররে চিন্যা বাইর করতে পারত আর কে?"

অদূরে কোন এক মিশন বাস্তুহারাদের মধ্যে চিঁড়ে আর গুঁড়ো দুধ বিতরণ করছিল, তারই সামান্য অংশ একটা পুটুলীতে করে নিয়ে এসেছেন তিনি। সুকুমারকে চিনতে পেরে লজ্জা পেয়ে সেটা যে কোথায় লুকোবেন ভেবে পেলেন না।

নত হয়ে মুকুলের মাকে প্রণাম করে সুকুমার,—ঠিক যেমনটি করে করতো অনেকদিন আগে, চৌচালা ঘরের সুমুখে প্রশস্ত বারান্দায়।

শীতল পাটির ওপরে আসন পিঁড়ি করে নয়, উবু হয়ে সুকুমার বসে ওঁদের ছেঁড়া, ময়লা সতরঞ্চির ওপর।

"বাইচা থাক, সুখে থাক, চিরজীবী হও—" কান্নায় অবরুদ্ধ গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলেন মুকুলের মা।

সুন্দর, সজ্জিত সুকুমারকে দেখে নিজেদের দৈন্য ও দুর্দশার নগ্নরূপ আরও ভালোভাবে ফুটে ওঠে মুকুলের মার চোখের সুমুখে। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করেন তিনি।

"বাসা কই তোমার? কর কি আইজ কাইল? উঃ কদ্দিন পরে দেখলাম তোমারে—" সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন মুকুলের মা। এতক্ষণে লক্ষ্য করেন যে সুকুমারের মুখেরও সেই লাবণ্য ঢল ঢল স্বাস্থ্য শ্রী নেই, চোখের কোলে কালি পড়েছে তারও, রেখাঙ্কিত কপালের দু ধারে দুটি নীল শিরা ভেসে উঠেছে।

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে সুকুমার, একবার তাকিয়ে দেখে উন্মুখ মুকুলের প্রত্যাশার আলোয় ঝকঝকে চোখ দুটির দিকে। পরক্ষণে সর্বদ্বিধা দ্বন্দ্ব দুহাতে ঠেলে সরিয়ে বলে ওঠে,—"বেলেঘাটার দিকে ছোট একটা ভাড়া বাসায় থাকি আমি, চাকরী করি মার্টিন বার্ন কোম্পানীর হেড্ অফিসে—

সুখের দিনের সাথীর কাছে দুঃখের ইতিহাস বিবৃত করার ভেতরেও একটা তৃপ্তি লুকিয়ে থাকে। ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী বলতে থাকেন মুকুলের মা।

কথায় কথায় বেলা বাড়ে। অতিকায় সরীসৃপের মতো বিশাল শিয়ালদা ষ্টেশন মধ্য-দিনের অলস বিশ্রাম চোখ বুজে ঝিমোয়।

কথার মাঝখানেই উঠে পড়ে সুকুমার। অভাব ও বেদনার দুঃসহ জ্বালার একঘেয়ে কাহিনী ক্লান্তিকর ঠেকে তার কাছে।

তাকে উঠতে দেখে মুকুলও উঠে দাঁড়ায়। এতক্ষণ একটা কথাও

বলে নি সে, হু'কান ভরে শুধু শুনছে সুকুমারের কথাগুলি।

সুকুমারের সঙ্গে সঙ্গে হু' পা এগিয়ে মা-এর কানের সীমানার বাইরে গিয়ে একটু লজ্জা-লজ্জাভাবে মুকুল বলে,—"অনেক বদলাইয়া গেছ তুমি সুকুমার দা—"

দাঁড়িয়ে পড়ে সুকুমার। মুকুলের চোখের ভেতর তাকায়,—অনেক প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বলছে মুকুলের চোখের তারায়।

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে সুকুমার, গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, স্বর কম্পন জাগে না তার কণ্ঠে।

আর তো সময় নেই, এক মুহূর্ত পরেই তো হারিয়ে যাবে সুকুমার, মিশে যাবে সার্কুলার রোডের অগণ্য জন সমুদ্রে। সব সঙ্কোচ একপাশে ঠেলে রেখে উৎকণ্ঠিত সুরে বলে ওঠে মুকুল,—"পুরানো সেই সব দিনগুলির কথা আর তোমার মনে পড়ে না সুকুমারদা?"

মুকুলের কথাকটি ধারালো ছুরির ফলকের মতো সুকুমারের হৃদয় যেন ফালা ফালা করে ফেলে। কী যেন বলতে যায় সে, ঠোঁট হু'টি কেঁপে ওঠে, আবার স্থির হয়ে যায়।

কিন্তু এখন কি একথা বললে বিশ্বাস করবে মুকুল যে আজ ছ'মাস ধরে বেকার সুকুমার। থাকে একটা বস্তীর অন্ধকার ঘরে যার তিনমাসের আঠারো টাকা বাকী ভাড়া সে আজও দিয়ে উঠতে পারে নি। সত্যি বলে মেনে নেবে কি, তার একটি মাত্র ধুতি আর পাঞ্জাবী ফর্শা রাখার বিচিত্র কাহিনী?—না না, একথা বলে তার ওপরে মুকুলের দৃঢ় আস্থা আর অটুট বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারবে না সে।

সুকুমারের ঠাণ্ডা হাতটা নিজের স্বেদলাঞ্ছিত করতলে টেনে নেয় মুকুল, ফিসফিস করে বলে,—"আবার আইসো সুকুমার দা— ভুইলা থাইকো না আমারে—"

সজোরে হাতটা টেনে নিয়ে অকস্মাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত পদে সেখান থেকে চলে যায় সুকুমার, পালিয়ে যায় একটা কিছু ঘটে যাবার আগে।

দূর থেকে মুখ না ফিরিয়েও বেশ বুঝতে পারে যে মুকুলের বেদনাহত চক্ষু দুটির দৃষ্টি যেন তাড়া করে আসছে তাকে, তবু জীবনের যুদ্ধে হেরে যাওয়া সুকুমারের পাদুটো ক্রমাগতই তাকে মুকুলের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

সুকুমারের অনেক দুঃখে পোড় খাওয়া পোক্ত চোখ দু'টি সহসা উদ্‌গত চোখের জলে ভরে যায়,—ঝাপসা দেখায় বিশাল শিয়ালদা প্ল্যাটফর্ম আর তারই ক্ষণস্থায়ী আশ্রয়ে বাসা বাঁধা নবীন যাযাবরের দল।

কোন অমৃত তীর্থে উত্তরণ করবে এরা? নাকি হারিয়ে যাবে বিংশ-শতকের হৃদয়হীন সভ্যতার মরু বালিতে!

× ## প্রাচীর
×
×
×
×
×
×
×
×
×

১

রংটা মাজা মাজা। ফর্সা বলাও চলে না, আবার কালো বললেও রাগ করবার আশঙ্কা ষোল আনা। মুখশ্রীও এমন কিছু আহা মরি নয়, তবে হ্যাঁ,—চোখ দুটি। অতল দীঘির কালো জল যেন বাসা বেঁধে আছে তাতে, মেঘের ছায়ায় কখনও তা নিবিড় নীল, আবার নির্মেঘ সূর্যের প্রখর আলোয় কখনও-বা পুলকোদ্ভাসিত। ঘন আয়ত পক্ষ্ম দুটি যেন দীঘির কোলে ঘনশ্যামল তালীবনের ইশারা। নামটিও সম্ভাবনাপূর্ণ।

লিপিকা।

আমি লিপিকার। এক মুহূর্তেই যে ওর প্রেমে পড়ব সেটা যেন ছিল বিধাতারই অলক্ষ্য বিধান। কিন্তু···

প্রথম দেখা বুড়ীগঙ্গার ধারে। বিকালবেলার উজ্জ্বলপাণ্ডু আকাশের রং ঝিকিমিকি এঁকে দিচ্ছে চলমান জলস্রোতে। বাঁধের রাস্তার অবিরল জনস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল সে, বেগুনী রঙের স্তবকিত কচুরী-কুসুমগুচ্ছের মত।

এগিয়ে গেলাম। কিন্তু রোমান্সের সূত্রপাতেই মুদ্গরাঘাতের মতো যেন ভূঁই ফুঁড়ে চোখের সুমুখে আবির্ভূত হলেন ছেড়ে-আসা

ইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়।

সংস্কৃত দেবভাষা, মানি, তবু দেবতা নই বলেই বুঝি তার থেকে শতহস্ত দূরে থাকাটাই শ্রেয়ঃ মনে করে এসেছি চিরটা কাল। তাই বহুদিন আগেকার দুঃস্বপ্নের মত শত লাঞ্ছনা-বিজড়িত ইস্কুলিক দিনগুলি পণ্ডিত মশায়ের শরীর থেকে যেন বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তাঁর স্বস্তিবাচন, কুশল প্রশ্ন সবই দূরাগত সমুদ্র-গর্জনের মত অর্থহীন বলে মনে হ'ল।

কিন্তু আশ্চর্য! স্বল্প আলাপনের পর স্বস্তিসুখে আবিষ্কার করলাম যে, সংস্কৃত ছেড়ে ইকনমিকস-এ এম-এ দেব শুনে খুশীই হলেন পণ্ডিত মশায়।

"ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়া চাই কিন্তু বাবা—"

অপাঙ্গে অনালাপিতার দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম, "আশা ত করছি—"

আক্ষেপের সুরে পণ্ডিত মশায় বললেন—"সর্বান্তঃকরণে তাই আশীর্বাদ করছি মলয়। ডেড ল্যাংগুয়েজের চর্চা করে আমরা ত ডেড এণ্ড ফরগটেন।" একটা নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর।

পশ্চিম দিগন্তের মেঘে মেঘে তখন আসন্ন সূর্যাস্তের সকরুণ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে।

"এটি আমার মেয়ে লিপিকা, দেখেছ বোধ হয় এর আগে, খুব ছোট ছিল তখন।" সস্নেহে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন পণ্ডিত মশায়।

মনে পড়ল—ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়েটি, সংস্কৃত পরীক্ষার নম্বর জানতে পণ্ডিত মশায়ের বাড়ি গেলে মিনমিনে গলায় বলত—"বাবা

বাড়ী নেই," অথবা "বাবা বললেন, আপনি ফেল।"

কিন্তু আজ আর সাহস করে তার মুখের দিকে তাকাতেই পারলাম না।

ব্রীড়া-কুণ্ঠাভরা আমাদের অতর্কিত সাক্ষাৎ লিপিকা কি ভাবে নিল কে জানে!

২

নববর্ষার সবুজ সকালে রমনার মাঠ সবুজে সবুজ। সবুজ শাড়িতেই ভাল মানাত, কিন্তু না, ফিকে কমলা রঙের শাড়ী পরে' উয়ারী ক্লাবের পাশ দিয়ে সেগুন-বাগিচার দিকে যাচ্ছিল লিপিকা, নববর্ষার ছোঁয়ায় ফুলে-ওঠা নদীর মতই যৌবনের উচ্ছ্বাস জেগেছে ওর দেহে।

এক খণ্ড মেঘের মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল লিপিকা। আজ একা। কাছাকাছি হতেই মুখ তুলে তাকাল সে। সলজ্জ একটু হাসি যেন খেলে ওর ঠোঁটের কোণে।

"বাড়ী ফিরছ?"

মাথা হেলিয়ে ও বলল—"হ্যাঁ।" ওর চঞ্চল চোখে কৌতুকের ঝিকিমিকি। ছেলেবেলার দ্বিধা-সংশয়ভরা সাক্ষাৎগুলি বিদ্যুৎ-চমকের মত মনে পড়ল আমার। কি বলব ভেবে পেলাম না।

পাশাপাশি হেঁটে চললাম আমরা দুজনে, নীরবে। সহসা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে আমার, অথচ পার্শ্ববর্তিনী আমারই কথা শুনবার অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুনছে। প্রকাশ-ব্যাকুল কথার মালা হৃদয়-দুয়ারে বৃথাই মাথা কুটে মরল।

জোর করেই যা হোক একটা কিছু বলার জন্যই হঠাৎ বলে উঠলাম—"আজ বুঝি আর বৃষ্টি হবে না।"

অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল লিপিকা। মেঘ-মেদুর আকাশ। নিথর-স্তব্ধ প্রকৃতি বৃষ্টির জন্য প্রহর গুনছে। আমার কথাটাই বুঝি ক্যাটালাইটিক এজেন্টের কাজ করল, অথবা আকাশে মেঘের দল অট্টহাসে উপহাস করল বুঝি আমায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চারধার লেপে মুছে একাকার করে মুষল-ধারে বৃষ্টি নামল।

একটা বড় অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়িয়ে খুব ভিজলাম দু' জনে। ছাতা ছিল না কারুর সঙ্গেই। অশ্বত্থপাতার ছুঁচলো সবুজ প্রান্ত বেয়ে বেয়ে অজস্র ধারে জল পড়তে লাগল আমাদের মাথায়। এ যেন বহিঃপ্রকৃতির অভিষেকবারি।

রিমঝিম রিমঝিম শব্দে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ছে অবিরাম, জোলো হাওয়ায় শীত শীত ভাব। ইচ্ছে হ'ল রবীন্দ্রনাথের কোনো বর্ষার গান চীৎকার করে গাই।

কিন্তু তার আগেই সভয়ে শুনতে পেলাম তদ্গত চিত্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে লিপিকা আবৃত্তি করছে:

নিতান্ত নীলোৎপল পত্র কান্তিভিঃ
ক্কচিৎ প্রভিন্নাঞ্জন রাশি সন্নিভৈঃ।
ক্কচিৎ সগর্ভ। প্রমদা-স্তন প্রভৈঃ
সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ॥

কানের ভিতর যেন গরম সীসা প্রবেশ করল। লিপিকার বৃষ্টি ভেজা মুখের দিকে একবার তাকিয়েই কচি ঘাসের ওপর দিয়ে ছপ

ছুপ শব্দ তুলে ছুটে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।

৩

লিপিকাদের বাড়ী আসা-যাওয়া সহজ হয়ে এল ক্রমে। পণ্ডিত-মশায়ের আর তাঁর স্ত্রীর সাগ্রহ অনুমোদনই ছিল তাতে। কিন্তু লিপিকার মনের নাগাল পেতাম না. আমাকে দেখলেই হয় সে কুমার-সম্ভব নিয়ে বসত অথবা ভট্টিকাব্যম। মোহমুদ্গরের শ্লোকের মতই তারা আঘাত করত আমার নীরব প্রেমের কল্পনাকে।

"কি অদ্ভুত সুন্দর এই ভাষা! তুমি শেখো না কেন মলয়? আমার কাছে তালিম নিয়ে দেখ, অল্পদিনেই শিখে ফেলবে।" অনুনয়ের সুরে কখনও কখনও বলত আমাকে লিপিকা।

তার উত্তরে রান্নাঘরে লিপিকার মার হাতে তৈরি ছানার বড়া খেতে ছুটতে হ'ত আমাকে।

আক্ষেপ করতেন পণ্ডিতমশায়—"দেখেও শেখে না পাগলী মেয়ে, ও ভাষার কি কদর আছে আর?"

আমার মনে হ'ত যেন তাঁর ঐ আক্ষেপের সুরে লুকিয়ে আছে প্রশংসার একটি সুর, তা না হলে সেকথা শুনে গর্বোৎফুল্ল চোখে আমার দিকে অমন করে তাকাত কেন লিপিকা?

মনের রঙীন আশায় বেদনার ছায়াপাত করে এমনি ভাবে কেটে গেল একটি বছর। আমার চোখের নীরব মিনতি লিপিকা বুঝল কিনা কে জানে! কঠিন পৃথিবীর দাবি মিটাতে ঢাকা ছাড়তে হ'ল একদিন আমায়, চাকরি পেলাম দিল্লী নগরীতে।

লিপিকা তখন সংস্কৃত অনার্সে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

দেখা হতেই বলল—"বাণভট্টের কাদম্বরী পড়েছ মলয়? কি আশ্চর্য লেখা, কি অপূর্ব ভাষা-বিন্যাস, আহা—"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম—"না।"

অশ্রুসিক্ত চোখে নিবিড় আলিঙ্গন করে আমাকে বিদায় দিলেন পণ্ডিত মশায়। তাঁরই এক ছাত্র আজ রাজধানী দিল্লীতে উচ্চপদে যোগদান করতে যাচ্ছে। তার সীমাহীন আনন্দ যেন ধরে রাখতে পারছিলেন না তিনি আর তাঁর স্ত্রী।

আরও বছরখানেক পরে বসন্তের এক রাগরক্ত সন্ধ্যায় গোলাপী আমন্ত্রণ লিপিখানা আমার হৃদয়কে মুচড়ে ভেঙে ফেলল যেন।

বিয়ে হচ্ছে লিপিকার। বিয়ে হচ্ছে প্রসিদ্ধ এক সংস্কৃত স্কলারের সঙ্গে।

× সাধ
×
×
×
×
×
×
×
×
×

দূর আকাশে ধূসর রংএর এক টুকরো মেঘ জমেছে, তেমনি মেঘ ঘনিয়েছে অপর্ণার মনে। বিরক্তিতে কুঞ্চিত ভ্রু'চোখের দৃষ্টি বারে বারে ডান হাতের মণিবন্ধে, যেখানে ছোট্ট সোনার ঘড়িটি আঁটা,—সেখানে পড়ছে।

অধীর মনের চঞ্চলতাকে প্রকাশ করে দিচ্ছে তার দ্রুত পা নাড়ার ভঙ্গী।

ভ্যানিটি ব্যাগটি অকারণেই একবার খুলে আবার চট্ করে বন্ধ করে অপর্ণা। চশমার ভেতর দিয়ে চোখের শাণিত উজ্জ্বল দৃষ্টি জনবহুল রাজপথের ওপর ফেলে।

নাঃ, এখনও দেখা নেই আনন্দের।

রসকষহীন পার্কের এই বেঞ্চিটার গায়ের সঙ্গে যেন আঠার মতো গেঁথে গেছে অপর্ণা, অনেক বারই উঠে যাই যাই করেও উঠতে পারে নি। সূর্য ডোবার পরেও মেঘে মেঘে ছড়িয়ে থাকা আলোর রেশের মতো আনন্দের আসার আশা ছেড়েও ছাড়তে পারেনি সে।

চুরি করে বার করা বিকেলের এই দুর্লভক্ষণটুকু বৃথা বয়ে যেতে দেখলে কার না রাগ হয়। কথা দিয়ে ঠিক সময়ে যে আসতে পারে

না সে কি আবার পুরুষ! ঢের শিক্ষা হয়েছে,—আর তার কথার মায়ার ফাঁদে পড়বে না অপর্ণা। আসুক না একবার,—এমন কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবে—

হঠাৎ পিছন দিকে চাপা নরম হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে, আর সেই সঙ্গে ঘাড়ের ওপর গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকায় অপর্ণা। ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে লজ্জাহীন আনন্দ।

কিন্তু ওর হাসি কী মারাত্মক রকম ছোঁয়াচে! রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলে অপর্ণা।

ঘুরে এসে অপর্ণার পাশে বসে আনন্দ। বলে,—"ক্লাস পালিয়ে আসা কি সোজা ব্যাপার! পঞ্চাশটি ছেলের কাছে পঞ্চাশ রকম কৈফিয়ৎ দিতে হ'ল। তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোকের এক কথা,—সবাইকে বলেছি যে—"

"থাক, থাক, থামো—আর ওজোর দেখাতে হবে না—" কথার ভেতর বেশ একটু সরোষের ঝাঁঝ মিশিয়ে অপর্ণা বলে,—"আমি যেন আর ক্লাস পালিয়ে আসিনি—"

"আহা, তোমাদের, মানে মেয়েদের কথাই আলাদা,—" বুঝিয়ে বলার সুরে আনন্দ বলে,—"চোখে চোখে ইশারাতেই বুঝে নেয়, বড়ো জোর মুখ টিপে একটু হাসে। কিন্তু আমাদের যে দস্তুর মতো কথা কয়ে জবাব দিতে হয়। ওসব আভাস ইঙ্গিতের সূক্ষ্মতা মেয়েদেরই শুধু মানায়। আমরা, যাকে বলে একটু স্থূল,—সব বিষয়েই—"

"এবং নিরেট—" যোগ দেয় অপর্ণা।

"ঝগড়াই করবে শুধু আজকের এই আশ্চর্য বিকেলে?" সোজা-

সুজি প্রশ্ন করে আনন্দ।

"করব না? একশোবার করব। জানো, আধঘণ্টা ধরে ঠায় বসে আছি এখনো চুপটি করে। কত লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গেল,—কী ভাবলো বলত?" রাগ করে যে কথার শুরু তার শেষ দিকটাতে অভিমানের রেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অপর্ণার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আনন্দ বলে,—"ভাববে আবার কি? সত্যি কথা যা তাই ভেবেছে। ঐ দেখনা, ওপাশের ও বেঞ্চিটায় আমার মতো উদাস প্রেমিক একটি ছেলে একলাটি বসে আছে, ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে,—বার বার ঠোঁট কামড়াচ্ছে,—মেয়েটির দেখা নেই এখনো।—নাও, এবার দুঃখ ঘুচলো তো? চলো, কোথায় তোমার সেই পাঞ্জাবী রেষ্টুরেণ্ট,—শিক কাবাব খাবার জন্য নোলা লকলক করছে—"

"পেটুক কোথাকার—" প্রতীক্ষার সব ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে অপাঙ্গে আনন্দের পরিপাটি বেশভূষার দিকে তাকিয়ে অপর্ণা বলে।

উঠে দাঁড়ায় ওরা দু'জন।

বিকেলের ফুরফুরে বাতাসে অপর্ণার বিশ্বভারতী শাড়ির আঁচল ওড়ে, বেণীর প্রান্ত দোলে আর মন ভোলে প্রিয় সমাগমে।

পাশাপাশি হাঁটে ওরা। মাঝে মাঝে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত ঠেকে যায়। দু'জনে চোখ তুলে দুজনের চোখে তাকায়, হেসে ওঠে।

ভাবনা-চিন্তাহীন পরিচ্ছন্ন ওদের জীবনে প্রথম প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে। বিশ্বভুবন যেন মধুমাখা। জীবিকার্জনের রুদ্র সংগ্রাম থেকে এখনো অনেক দূরে ওরা। হৃদয়ে এখনো তাপ আছে, চোখে

আছে স্বপ্ন।

অল্পদূরে, জমকালো সাইনবোর্ডের নিচে কাটা দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢোকে আনন্দ-অপর্ণা।

লোক গিসগিস করছে দমবন্ধ ছোটো ঘরটায়। চেয়ারগুলো সব ভর্তি। ডিস হাতে ছুটোছুটি করছে ব্যস্ত বেয়ারাগুলো। আটসাঁট শাড়ি পরা কয়েকটি মেয়ে-পরিচারিকা খদ্দেরদের কাছে গিয়ে তাদের ভোজনস্পৃহা জেনে নিচ্ছে। এক কোণে ক্যাস-বাক্স আর মশল্লা নিয়ে বসে আছেন বিপুলকায় সর্দারজী। কথাবার্তা হৈ হট্টগোলে ঘর সরগরম।

ভাগ্য ভালো ওদের। দেয়ালের কাছে লেডিজ্ লেখা ছোটো ঘরটা খালি পেল ওরা।

ভেতরে ঢুকে বসতে না বসতেই বাসনা এসে কাছে দাঁড়ায়, বলে,—"আপনাদের কী দেব বড়দা?"

বড়দা! চোখ তুলে বাসনার দিকে তাকায় আনন্দ। বেঁটে মোটাসোটা মেয়েটির বয়েস বছর পঁচিশ হবে। গোল, শামলা রংএর মুখে হু'চারটি বসন্তের দাগ। সাদা শাড়ির সবুজ পাড়টি সাপের মতো পা থেকে উঠে গেছে পরিণত উদ্ধত বুকের মাঝখান দিয়ে কাঁধের ওপর।

অভ্যাসবশে বড়দা বলেই লজ্জায় পড়ে গেছে বাসনা। এরই মধ্যে অপর্ণাকে খুঁটিয়ে দেখা সারা হয়ে গেছে তার। বুঝে নিয়েছে ওদের সঠিক সম্বন্ধ। বুকের ভেতরটা করকর করে ওঠে বাসনার।

ভাবলেশশূন্য স্বরে এবার বলে,—"কী দেব আপনাদের বলুন?"

বাসনা 'বলুন' কথাটি শেষ করতে পেরেছে কি পারেনি, জোরের

সঙ্গে আনন্দ বলে ওঠে,—"শিক কাবাব। শিক কাবাব দু প্লেট—আর চা—"

অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে যায় বাসনা। যথাস্থানে বলে এদিকে আসতে আসতে ভাবে—বেশ মিলেছে কিন্তু জোড়াটি—পকেটে পয়সা কম,—কিন্তু রেষ্টুরেণ্ট খাবার শখ আছে ষোল আনা।

বুকের ভেতর কেমন একটা বেদনা অনুভব করে বাসনা। রোজ রোজ লেডিজ্ লেখা পর্দাঘেরা ঘরগুলোতে জোড়া জোড়া তরুণ-তরুণীর খাওয়া, হাসি, ঠাট্টা, মান-অভিমান দেখে দেখে তার নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক মনেও কেমন একটা শিরশির ভাব জেগে ওঠে। নিত্য-দিনের টাকা-আনা-পাই-এর হিসাবের বাইরেও যে একটা অতিসুন্দর জগৎ আছে, তার অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে অনুভব করে।

কিন্তু এ জগতে তার প্রবেশাধিকার নেই। সে শুধু নীরব দ্রষ্টা। দেখে দেখে শুধু মনে ব্যথা পেতে পারে সে।

এখানে লোক আসে, ঝনাৎ করে পয়সা ফেলে খেয়ে যায়, কিন্তু দুটি ভাত খাবার জন্য পয়সা জোগাড় করার সংগ্রামটা যে কী কঠিন, কী ভয়ানক তার পরিচয় লেখা আছে বাসনার দেহে আর মনে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাসনা। বুকের ভেতরটা সীসার মতো ভারী হয়ে ওঠে।

"তিন নম্বর কেবিনে দুটো শিক কাবাব আর দুটো চা—" এক পাক ঘুরে সর্দারজীকে বলে আসে বাসনা।

শিক কাবার আর চা পৌঁছে যায় তিন নম্বর কেবিনে।

সোৎসাহে খেতে থাকে আনন্দ আর অপর্ণা। সামান্য সামান্য কথায় দু'জনে হেসে ওঠে খিলখিল করে। সেই হাসি রেষ্টুরেণ্টের

সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে ওঠে, এমনি তার প্রাণশক্তি।

"শিক কাবাব খেয়েই তো সময়টা কাবার হল আজ—বেড়াবে আর কখন ?" তৃপ্তির উদ্‌গার তুলে চা'য়ে চুমুক দিয়ে আনন্দ বলে।

"কার হল কাবার ? আমার না তোমার ?" তরল স্বরে অপর্ণা বলে।

"আমার,—আবার কার ?"

"হতে পারে তোমার, আমার নয়,—আমার হাতে আজ অঢেল সময়,—এমন কি সিনেমা দেখাও চলে—" চোখ নাচিয়ে অপর্ণা বলে।

"সত্যি ?—" দু'চোখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আনন্দের।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দু'খানা সিনেমার টিকিট বার করে আনন্দের নাকের ডগার কাছে দুলিয়ে অপর্ণা বলে,—"তোমার এ কথা জেনে লাভ ? তোমার তো আর সময় নেই—"

"সময় হচ্ছে রবারের মতো, যতো ইচ্ছে টানা যায়, আর যতো টানা যায় ততই বাড়ে। এ টানাটানিতে আমার মতো ওস্তাদ খুব কমই আছে—" হাত বাড়িয়ে টিকিট দুটো অপর্ণার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে আনন্দ বলে। হাত সরিয়ে নেয় অপর্ণা। কাড়াকাড়ি পড়ে যায় দু'জনে।

পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে ওদের কথাগুলো যেন গিলতে থাকে বাসনা। ওর বঞ্চিত বুভুক্ষু মনে অপর্ণা-আনন্দের খুনসুড়ি ছোটো ছেলের রূপকথা শোনার তৃপ্তি আনে।

নোংরা বস্তিতে একখানা মাত্র ঘর।

বাপ গোকুল কারখানায় মিলের চাকার দাঁতের কাছে গোটা ডান হাতখানা রেখে দিয়ে এসেছে আজ দু'বছর। বাতের ব্যথা কম থাকলে পাড়ায় পাড়ায় বাসন মাজার কাজ করে বেড়ায় মা সৌদামিনী। ছোট ছোট তিনটি ভাই বোন সব সময়ে খাবার জন্য হাঁ করে আছে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে, অনেক কিছু খুইয়ে রেষ্টুরেণ্টের এ চাকরীটা পেয়েছে বাসনা। এই পঁচিশ বছরের জীবনে মনের কোনো সাধ আহ্লাদকেই পুরাতে পারে নি সে।

তারও ইচ্ছে করে এই মেয়েটির মতো বেণী দুলিয়ে, ছিমছাম শাড়ি পরে গোবিন্দর সঙ্গে গিয়ে কোনো রেষ্টুরেণ্টের কোণে বসে খায়, হাসে, গল্প করে। তারপর সিনেমায় যায় একসঙ্গে।

কিন্তু ছুতার মিস্ত্রি গোবিন্দের হাতে রোজ টাকা পয়সা থাকে না। যেদিন থাকে সেদিন মদে এমন চুর হয়ে থাকে যে কোনো কথা ভালো করে শোনার হুঁশ থাকে না তার। ভালোকথা বল্লেও গালাগালির বন্যা ছুটিয়ে দেয়। মন্দ কথা বল্লে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। কিন্তু অন্য সময়ে গোবিন্দ একেবারে মাটির মানুষ। বাসনার জন্য আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে চায়। কিন্তু বাসনা চাঁদ চায় না, চায় চাঁদি। চায় সেই চাঁদি ভাঙ্গিয়ে এক আধদিনের ফুর্তি।

আচ্ছা, গোবিন্দ যদি এই ছোকরাটির মতো সুন্দর স্যুট পরে বের হয় তাকে সঙ্গে নিয়ে। কল্পনা করতেও দম বন্ধ হয়ে আসে বাসনার। গোবিন্দের পেশীবহুল সুঠাম পরুষ দেহটা চোখের সুমুখে ভাসে। এমন মেয়েলি চেহারা নয় তার গোবিন্দের। হ্যাঁ, সাচ্চা পুরুষ একটি। নাই বা রইল তার স্যুট। আধময়লা ধুতিতে আর

কাঠের গুঁড়ো লাগা তাঁতের হাফ্ শার্টেও চমৎকার মানায় গোবিন্দকে।

হঠাৎ একটা তীব্র ইচ্ছা বাসনার বুকটাকে যেন চিরে ফেলে। ধ্বক ধ্বক শব্দ করতে থাকে তার হৃৎপিণ্ডটা।

কাছেই ফার্ণিচারের দোকানটায় কাজ করে গোবিন্দ। এখনো বোধ হয় কাজ করছে। দু'প্লেটে শিক কাবাব আর দু কাপ চায়ের কতই বা দাম! জীবনের কোন্ সাধটাই বা পূর্ণ করেছে বাসনা। প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা-খাবার খাওয়াটা বেশী কী আর এমন? গোবিন্দর কাছে টাকা থাকলে সিনেমা দেখবে, না থাকলে না-ই দেখবে। পর্দাঘেরা একটা ছোট খুপরিতে মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে গল্প করবে সে আর গোবিন্দ। কথায় কথায় অম্নি করে হেসে উঠবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কামনায় অধীর হয়ে ওঠে বাসনা।

বিল এনে আনন্দের হাত থেকে টাকা নিয়ে ভীড়ের ভেতর দিয়ে মালিকের ক্যাশবাক্সের দিকে হাঁটে না সে। কেউ তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা লক্ষ্য করতে করতে আনন্দ-অপর্ণার পেছনে পেছনে কাটা দরজা ঠেলে পথে গিয়ে নামে।

অল্পদূরেই গোবিন্দের ফার্ণিচারের দোকানটার সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে।

× রাত্রিচর
×
×
×
×
×
×
×
×
×

॥ এক ॥

রাত তো নয়, যেন একটা রাক্ষসী,—তার আকাশ পাতাল হাঁ-এর গহ্বরে হারিয়ে গেছে দিনের আলো। এতক্ষণে বুঝি বা জীর্ণও হয়ে গেল। আশে পাশের ঝুপ ঝুপ অন্ধকারগুলো যেন সেই রাক্ষসীর বিশাল থাবা। নিঃশব্দে অপেক্ষা করে আছে আক্রমণের চরম মুহূর্তটির জন্য। গাঢ় অন্ধকারে আবছা দেখা শাল শিমূলের গাছ গুলো যেন তার হিংস্র দাঁতের চকিত ঝলক।

গা ছম ছম করে, বুক কাঁপে বিনয়ের। ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ করে চলতে চলতে হঠাৎ বুঝি থেমে যাবে ওর হৃৎপিণ্ডটা, হিম হয়ে আসা রক্তের ভেতরে শুনতে পায় অজানা বিভীষিকার ডাক। কিন্তু পাশে বসে থাকা বাদল নির্বিকার, মাঝে মাঝে টর্চটা জ্বেলে ঘরের এখানে ওখানে আলো ফেলছে সে।

বেশ বড়ো মাপের ঘর। তিন দিকের দেয়ালেই বড়ো বড়ো জানালা ছিল এককালে, এখন আছে শুধু ইঁট বার করা ফোকর গুলো,—যার ভেতর দিয়ে অবিরাম হাওয়া আসছে একটানা। চতুর্থ দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভারী কাঠের দরজা, পাশের ঘরে যাবার ঐ একমাত্র পথ। ইঁদুরের আক্রমণে ঘরের

লাল সিমেন্টের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই—হাঁটতে গেলেই সুরকির গুঁড়ো জুতোর নিচে চাপা পড়ে আর্তনাদ তোলে। দেয়ালের চুন বালিগুলো খসে খসে পড়ে কিম্ভূত মানচিত্র এঁকে চলেছে, সে গুলো যে কোনো কিউবিষ্ট শিল্পীর আদর্শ হতে পারতো। ঘরের যেখানে সেখানে অসংখ্য জাল পেতে মাকড়শাগুলো সম্ভাব্য শিকারের নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় বসে আছে। রাত দুপুরে বিনয়-বাদলের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি তাদের। শুধু মাথার ওপর দিকে ছোট্ট একটা বাদুড় বাচ্চা পাখা ঝট পট করতে করতে অবিরাম ঘরের ভেতর পাক খেয়ে মরছে, তার মা বাবা ভাই বোনেরা কখন যে জানালার খোলা ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে দিকে তার হুঁশই নেই।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে এই ঘরটাই যা একটু ভালো, তাই আজ রাতের জন্য এটাই বেছে নিয়েছে বাদল।

টর্চের আলো বাঁ হাতের মণিবন্ধে ফেলে সময় দেখে বাদল। চক্রাকারে আলো ছড়িয়ে পড়ে তার খাকী হাফ-সার্ট, ফুল-প্যাণ্ট আর কোমরে বাঁধা রিভলবারের কালো বাঁটের ওপর। আবছা আলোয় পাশে দাঁড়ানো বিনয়ের পোষাকও বাদলেরই মতো। ওর চোখের সাদা অংশটা চকচক করে ওঠে। আলোর রেখা দেখতে পেয়ে ভয়ের শাসন কাটিয়ে মুক্ত হয় ওর মন, কোমরে বাঁধা রিভলবারটির বাঁট ডান হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে সে, যেন পায় পরম আশ্বাসের নির্ভরতা।

রাত এগারোটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট।

চাঁদ নেই আকাশে। জানালার ফোকর দিয়ে দেখা যায় কয়েকটি তারা। অন্ধকার আকাশের থালায় তারার প্রদীপগুলি জ্বেলে কার আরতি করছে বিশ্ব প্রকৃতি কে জানে!

রাত্রির হিমেল হাওয়ায় জীবনের তপ্ত শ্বাসের স্পর্শ নেই, আছে শুধু প্রেতময়ীর অলৌকিক মৃত্যুশীতল উপস্থিতির ঘ্রাণ।

দিনের উজ্জ্বল আলোতে, সাথী সঙ্গীদের উপস্থিতির ঘন উষ্ণ আবেষ্টনীর ভেতরে যে সব কথা মনে হয়েছিল অত্যন্ত লঘু আর চপল, এই নিশীথ অন্ধকারের অসীম নির্জনতায় তারা যেন গভীরতর অর্থের শাল মুড়ি দিয়ে মনের বুক ঘেঁসে এসে দাঁড়ায়। আপাদ-মস্তক অজানায় মুড়ি দেওয়া, গভীর রহস্যময় তাদের চেহারা।

ভয় পাবার ছেলে নয় বাদল। তবু টর্চের আলো নেভাবার সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত অন্ধকারের রাশি একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে, দুরন্ত সমুদ্র তরঙ্গের মতো মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়ে দেয় তার মন। বাদুড় বাচ্চাটাও এতক্ষণের শূন্য পরিক্রমার পর কোথায় যেন বসে পড়েছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার অখণ্ড ঐক্যতান হঠাৎ একযোগে থেমে গিয়ে নৈঃশব্দের পরম ভয়ংকর রূপটি ফুটিয়ে তোলে।

বাদলের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে অল্প শিরশিরানির ভাব নিচে থেকে ওপরের দিকে উঠে যায়।

॥ দুই ॥

সেই চির পুরাতন অথচ চির নবীন ভূত এসে আসর জাঁকিয়ে বসেছিল যোগেন সেনের ছোট্টো ছিমছাম ঘর খানাতে। বিকালের

পড়ন্ত রদ্দুর তখনও তার জানালার শিক ধরে যাই যাই করছিল।

কথাটা কে তুলল মনে নেই বিনয়ের, কিন্তু দেখতে দেখতে হাতে ধরা পেয়ালা ভর্তি চা-এর চেয়েও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো তাদের আলোচনা।

বিনয়ের মুখে ছোটো ছোটো উজ্জ্বল চোখ দুটি পেতে অমিতা বলেছিল, "কী আশ্চর্য! ভূত মানেন আপনি বিনয় বাবু? বিংশ শতাব্দীতে?"

যদিবা মনে দ্বিধা ছিল, ছিল কিছুটা সন্দেহ, তবু অমিতার অতল গভীর কালো চোখ দুটির দিকে তাকাতেই মুহূর্তে কর্পূরের মতো উড়ে গেল সে সব। মাথা নেড়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বিনয় বলেছিল—"মানবার তো কোন কারণ দেখছি না আমি। ভূত প্রেত, দৈত্যদানা যদিই বা ছিল, আজকের দিনে বিদীর্ণ এ্যাটমের তেজস্ক্রিয় ভস্মচূর্ণ খেয়ে নিশ্চয়ই গ্রহান্তরে যাত্রা করেছে তারা—"

"—এবং বায়ুমণ্ডলে ভাসমান থেকে থাকলেও এতগুলো স্পুটনিকের তাড়া খেয়ে সৌরমণ্ডল ছেড়ে যাবার কথা চিন্তা করছে এতদিনে।"—পরিহাস তরল সুরে বলে উঠেছিল অজয়।

—"ঠাট্টা করছ,—করো—" উদাসীন সুরে বলল ভারতী, একটু পরেই আবার বলে উঠলো,—"কিন্তু নিজের চোখে দেখা ব্যাপার তো আর অস্বীকার করতে পারি না আমি।"

ঝড় উঠলো। আলোচনার ঝড়। ভূত-বিশ্বাসী ভারতী, শিবনাথ আর গোপাল উত্তেজিত ভাবে বক্তৃতা দিল অনেকক্ষণ ধরে। মাঝে মাঝে অজয়ের ছোটো ছোটো অথচ সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলি রসদ জোগালো তাদের উত্তেজনায়।

এদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একা বিনয় বিপর্যস্ত হয়েও অচল অটল। অমিতার চোখের দীপ্ত চাহনি তাকে যেন মরিয়া করে তুললো। অনেকগুলো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনে মনে মনে দমে গিয়েও মুখে কিছুতেই স্বীকার করল না সে। হাত মাথা নেড়ে চলল অবিরাম।

এমন সময়ে বাদল এসে জুটলো।

তাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য তর্কটা থেমেই আবার দ্বিগুণ তেজে উদ্দাম হয়ে উঠলো।

বাদল মিলিটারী অফিসার। ক'দিনের ছুটিতে পুণা থেকে নিষ্কাশনপুরে এসেছে। তর্কের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে বন্ধুদের বদ্ধ কুসংস্কারে ক্ষুব্ধ হ'ল সে। চেঁচিয়ে বলে উঠ্লো "অল্ ট্র্যাশ—"

অন্য সবাই থেমে গেল কিন্তু কলকণ্ঠী অমিতা তখনো চেঁচিয়ে চলেছে।

এতক্ষণে অমিতার দিকে ফিরে তাকাল বাদল, পলকের জন্য কী যেন ভাবল মনে মনে তার পর বলল—"এই, কী হচ্ছে মিতা, ভূতের স্বপক্ষে সাফাই গাইছ? তুমি না বড়াই করতে যে সব সংস্কার থেকে মুক্ত তুমি!"

কথার মাঝ পথেই থেমে গেল অমিতা. বাদলের কথা শুনে পলকের জন্য পাংশু হয়ে গেল তার মুখ, চোখ তুলে তাকাতেই পারল না বাদলের মুখে।

ভৌতিক স্তব্ধতা নেমে এল ঘরের ভেতর।

অদূরে বসা রেডিও মেরামত রত যোগেনের দিকে তাকাল অমিতা। মনে মনে নিজেকে বুঝি সংবরণ করে নিল কিছুটা।

তারপর কৃত্রিম কোপ ভরা চোখে সোজাসুজি বাদলের মুখে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল—"সে ত ইহলৌকিক ব্যবহারিক জীবনে। আমাদের আলোচনা চলছিল পারলৌকিক ব্যাপার নিয়ে।"

মাথা নেড়ে দৃঢ় স্বরে বাদল,—"না। মুখে যাই বলো, তুমি সংস্কার মুক্ত নও ব্যবহারিক জীবনেও—"

ভয় পেল অমিতা। এ সব কী বলছে বাদল। চুকে যাওয়া ঘটনাগুলো মনের কবর খুঁড়ে বার করছে কেন আজ?

দু' চোখ ভরা অসীম ব্যথা নিয়ে বাদলের চোখে চোখ রাখল অমিতা। কী একটা কথা বলার জন্য তার ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হয়ে উঠল যেন, কিন্তু পরক্ষণেই দূর থেকে এক জোড়া চোখ তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে অনুভব করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর শূন্যে সাঁতার দেওয়া পাখীর মতো ভাসতে ভাসতে এ ঘর ছেড়ে চলে গেল অমিতা।

বাদলের হাম বড়াই ভাব মনঃপূত হয়নি শিবনাথের। এতক্ষণ উসখুস করছিল সে, এবারে গলা চড়িয়ে বলল—"আপনি ভৌতিক ব্যাপার মাত্রকেই ট্র্যাশ বললেন কোন হিসেবে?"

অমিতার ভয় চকিত চাহনি, তার ত্রস্ত ভাব আর হঠাৎ উঠে যাওয়া বাদলের মনকে বেশ নাড়া দিয়েছে, সেকথা ভাবতে ভাবতে সিগারেট কেস খুলে একটা সিগারেট বার করছিল সে। শিবনাথের প্রশ্নের উত্তরে আনমনাভাবে বলল,—"যার কোনো অস্তিত্বই নেই তাই নিয়ে আবার তর্ক! তাকে ট্র্যাশ বলব না তো বলব কাকে?"

"কী বল্লেন? অস্তিত্ব নেই? জানেন—" রক্তিম মুখে বলে উঠলো গোপাল,—"জানেন বশীকরণ, মারণ, উচাটন ইত্যাদি

প্রক্রিয়া এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি এ দেশ থেকে—"

—"এবং ডামরী, ভামরী, চামরী প্রমুখ চৌষট্টি যোগিনীদের এখনো প্রত্যক্ষ করতে পারেন সিদ্ধ তান্ত্রিকেরা—" সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে ভারতী।

"নিরাকার বায়ুভূত ভূতও প্রয়োজনীয় প্রোটোপ্লাজম সংগ্রহ করে শরীর ধারণ করতে পারে,—পারে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে—" চিবিয়ে চিবিয়ে বল্ল শিবনাথ।

এতগুলি কথার উত্তরে একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বাদল শুধ্ বলল—"অল বোগাস"—

ক্ষেপে উঠলো শিবনাথ, ভারতী আর গোপাল। বাদলের সমর্থন পেয়ে বিনয়ও পিছিয়ে রইল না ওদিকে।

॥ তিন ॥

মিনিট দশেক পরে বাথরুম থেকে ভালো করে মুখ চোখ ধুয়ে আবার যখন ফিরে এল অমিতা, তখন বাজী ধরা হয়ে গেছে।

নিষ্কাশনপুরের নগর প্রান্তের নির্জনতায় একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গীষ্পতি-নিবাস। আশে পাশে সিকি মাইলের মধ্যেও আর কোনো বাড়ি না থাকায় ও দিকটায় দিনের বেলাতেই লোকজনের আনাগোনা কম, আর রাত হ'লে তো কথাই নেই,—জীবন্ত প্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না তার ধাবে কাছে।

বাড়িটা ভূতুড়ে।

সেই বাড়িটায় রাত কাটাতে হবে এই অবিশ্বাসী দু'জনকে।

বাজী এক শ' টাকা।

রাজি হয়েছে বাদল। একটু ইতস্ততঃ করে রাজী হতে হয়েছে বিনয়কেও। ঘরে ঢুকেই বাজীর কথা শোনামাত্র অমিতার চোখে মুখে কিসের একটা আলো পড়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। সভা না ভাঙ্গা পর্যন্ত বিমনা হয়ে রইল সে।

রেডিও সারা মুলতুবী রেখে বাজীর সর্ত লেখা কাগজখানা ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে রাখল স্বল্পভাষী যোগেন—আর কেউ না দেখলেও অমিতা লক্ষ্য করল বিচিত্র ধরণের একটা তীক্ষ্ণ হাসি তার ঠোঁটের প্রান্ত ছুঁয়ে ভারী চোয়ালের প্রান্ত বেয়ে মিলিয়ে গেল।

এর পর জমল না আর কোনো আলোচনা। একটা অনির্ণেয় গুরুভার সবার বুক চেপে ধরল। থমথমে গুমোট গম্ভীর ঘরে ছ'চারটে অসংলগ্ন কথার পর একযোগে উঠে পড়ল সবাই।

সভা ভাঙ্গল রাত আটটায়। যোগেনের আবার রাত পাল্লার ডিউটি। তা ছাড়া খাওয়া দাওয়া শেষ করে দশটার মধ্যেই গীষ্পতি-নিবাসে পৌঁছুতে হবে বিনয়-বাদলকে।

সবাই চলে গেল, খালি হয়ে গেল ঘর, শুধু বাদল বসে রইল জানালার ধারের বেতের চেয়ারটায়।

দেড় বছর পরে আজই সকাল দশটায় নিষ্কাশনপুরে ফিরে এসেছে বাদল। কড়া সামরিক নিয়মে থাকতে থাকতে তার বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পড়েছে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। মুখে ফুটে উটেছে রুক্ষ পরুষ ভাব। ঘরের অল্প অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে নিমেষহারা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল অমিতা। কোন এক নিবিড় যন্ত্রণায় বারে বারে কুঁচকে উঠছিল তার কোমল মুখ। হঠাৎ আসা

অন্ধ আবেগে ফুলে ফুলে উঠছিল তার হৃদয়।

নীরবে রেডিওর সব কল-কব্জা গুছিয়ে রেখে যোগেন চলে গেল বাথরুমে, কাজে যাবার প্রস্তুতি পর্ব সেরে ফেলতে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো অমিতা চেয়ারে বসা বাদলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল, ক্ষণকাল নীরবে থেকে বাদলের স্পর্শ উপভোগ করল, বলল,—"বীর পুরুষের মতো বাজী রাখলে, ভয় পাবে না তো শেষটায় ?"

"ভয় ! ভয় তো পায় মেয়েরা—" ঘন হয়ে দাঁড়ানো অমিতার উষ্ণ স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চেয়ারের অন্য দিকে চেপে বসে বাদল, "আমি কোনোদিন কোনো কিছুকেই ভয় করি না তার প্রমাণ তুমি কি পাওনি মিতা ?"

বাদলের গম্ভীর গাঢ় কণ্ঠের কথা ক'টি কাঁপিয়ে দিল অমিতাকে, দু' চোখ জলে ভরে উঠলো তার। আরও ঘন হয়ে এসে অমিতা ধরা গলায় বল্ল,—"জীবনের একটি মাত্র ভুলকে কি ভুলতে দেবে না তুমি বাদলদা ?"

অমিতার চুলের গন্ধ, জবাকুসুম তেলের গন্ধ, বাদলের নাকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। জানালা দিয়ে বাইরের জি, টি, রোড, তার ওপারে রাত্রির ছায়া মাখা মন্টিসরি স্কুলের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল বাদল। কোনো কথা বলল না।

কাঁপা গলায় অমিতা আবার বলল,—"একদিন না হয় ভুলই করেছিলাম, সাজাও তো কম পেলাম না তার জন্য। আমার জন্য ভাবি না, কিন্তু কত দূরেই না চলে গেলে তুমি। একটি বার দেখা পাব তারও উপায় রাখলে না—" বলতে বলতে দরজার দিকে একবার

তাকালো অমিতা, তারপর বাদলের হাতটা চেপে ধরল সে, গভীর আবেগে বলে উঠলো, "আগেকার দিনগুলো কি আর ফিরে পাওয়া যাবে না বাদলদা,—কী দুঃসহ যন্ত্রণাকে যে মনের ভেতর চেপে রেখেছি তা কি তুমি টের পাও না—"

অমিতার মুখে আবেগ-গভীর স্বরে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে বহুদিন পরে আবার শিরশির করে উঠলো বাদলের শরীর, রক্ত-তরঙ্গে বেজে উঠলো অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। মিলিটারী অফিসার বাদল রায়ের মনটাও তার শরীরের মতোই ডিসিপ্লিনের কঠিন বাঁধনে বাঁধা।

আস্তে আস্তে নিজের হাতটি মুক্ত করে নিল বাদল, মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলল,—"অমিতা, তুমি এখন পরস্ত্রী। ভুল যারই হোক, সে অধ্যায়ের ওপর যবনিকা টানা হয়ে গেছে চিরকালের মত, চেষ্টা করলেও আর আগের দিনগুলো ফিরে পাওয়া যাবে না। সামাজিক বন্ধন অস্বীকার করতে পারো না তুমি। আমাকে দেখলেই যদি তোমার পূর্ব স্মৃতি জ্বলে ওঠে তবে এখানে আসবই না আর। যোগেন আমার বাল্যবন্ধু, তার কোনো ক্ষতি করতে পারি না আমি,—তোমার জন্যও না।"

ক্রূর হিংসার ছায়া নামে অমিতার সুন্দর মুখে। হাতের আঙ্গুল-গুলো বেঁকে যায় রুদ্ধ আক্রোশে। মনে হয় যেন বাদলের বুকটা ফালা করে ফেলবে তার তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে। জ্বলন্ত চোখ দু'টি দিয়ে যেন পুড়িয়ে ফেলতে চায় নীতিবাগীশ বাদলকে।

এমন সময়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে যোগেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ার মতো তার পাশ কাটিয়ে

বেরিয়ে যায় অমিতা।

দুই বন্ধু নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

মৃদুস্বরে যোগেন বলে,—"তোমাকে দেখলেই একটু ক্ষ্যাপাটে হয়ে ওঠে অমিতা। গত দেড় বছর ধরেই দেখছি তো। থেকে থেকে চমকে ওঠে, রাতে ঘুমের ঘোরে গোঙায়। আবার কখনো সখনো রাতের পর রাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। ডাক্তার বোসকে দেখিয়েছি, তিনি বলেন নার্ভ-শক্, অনেক দিন ধরে চিকিৎসা করতে হবে। গত দেড় বছরে স্ট্রোক হয়েছে দু'বার। প্রথম তোমার মিলিটারী চাকরী নিয়ে চলে যাবার খবর শোনার দিনে আর দ্বিতীয় বোম্বাই-এর দাঙ্গায় তোমার খুন হবার গুজব ছড়াবার দিনে। ডাক্তার বোসের মতে তৃতীয় স্ট্রোকটাই হবে মারাত্মক—"

"আমার এখানে আসা বোধহয় ঠিক হবে না আর—" ম্লান হেসে বাদল বলে,—"বোধ হয় আসা আর হবেও না। কারণ আমাদের ইউনিট শিগগিরই ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছে জাতি সংঘের উদ্যোগে। আমি বলি অমিতাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একজন স্পেশালিষ্ট দেখাও তুমি। তৃতীয় স্ট্রোক যেন আর না আসতে পারে, যেমন করে হোক্ ঠেকাতেই হবে তাকে—"

বাদলের কণ্ঠ দিয়ে উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা ঝরে পড়তে থাকে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখে পলকের জন্য তাকায় যোগেন। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে চিন্তিত সুরে বলে,—"ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছি, আশা করি পেয়ে যাবো। এমনি দেখে কিন্তু বোঝা যায় না কিছু, দিব্বি হেসে খেলে বেড়ায়। হঠাৎ আবার অকারণেই ভীষণ রেগে ওঠে, হাতের কাছে যা পায় সব কিছু ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে ফেলে।

কার ওপরে যে ওর এই রাগ আর আক্রোশ বুঝি না কিছু।"

"নিজের ভাগ্যের ওপরেই বোধহয়—" অন্য দিকে তাকিয়ে আপন মনে বাদল বলে,—"ধরা ছোঁয়া পাবার উপায় নেই তার, তাই বুঝি প্রচণ্ডতর হয়ে ওঠে ওর ক্রোধ--"

"এই দেখ না—" রেডিওটার দিকে হাত বাড়িয়ে যোগেন বলল —"সেদিন রেগে উঠে রেডিওটার কয়েলগুলো ধরে এমন টান মারল যে আমার মত ওস্তাদ কারিগরও এটাকে ঠিক করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে—"

ঢং করে শব্দ হ'ল দেওয়াল ঘড়িতে।

ছুজনেই তাকিয়ে দেখল সেদিকে। রাত সাড়ে ন'টা।

"তোমার ডিউটি তো রাত দশটায়? এবার তাহলে উঠি আমি বিনয়কে নিয়ে আবার গীষ্পতি-নিবাসে রাত কাটাতে হবে, আমাকে—"

যোগেনের কাছে বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগল বাদল।

পীচ ঢালা মসৃণ পথ। ছু পাশে অনেকখানি জায়গা নেওয়া বিশাল বাংলোগুলোর গা ছুঁতে পারছে না পথের দুধারের শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুতালোক বর্তিকাগুলি। অনেক দূরে নিষ্কাশনপুরের ক্লাব-গৃহটি অপরূপ আলোকসজ্জায় রূপসী অভিসারিকার মতো সংকেত স্থানে এসে যেন প্রিয়-সমাগমের প্রতীক্ষা করছে নীরবে। তার দক্ষিণে গল্‌ফ মাঠের বিশাল বিস্তার।

বাদলের মনে পড়ল এই গল্‌ফ খেলার মাঠে অমিতার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার দিনগুলির কথা। এই মাঠের প্রত্যেকটি ঘাস যেন

বাদলের চেনা, তার আর অমিতার নিভৃত আলাপনের মূক সাক্ষী।

বাদলের বুক চিরে একটা নিঃশ্বাস পড়ল, মিশে গেল হিমেল বাতাসে মৃদু কম্পন জাগিয়ে।

॥ চার ॥

চটাশ!

এক চড়ে আট দশটা মশা মারা পড়ল বোধ হয়।

চমকে ওঠে বিনয়। বাদলের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের হিম তার অস্থিমজ্জায় ঢুকে পড়ছে। ঠক ঠক করে কাঁপাচ্ছে তার শরীর।

পোড়ো বাড়ির খোয়া-ওঠা মেঝেতে বসে নোনা ধরা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে নিভৃত মনের ভাবনাগুলো নাড়াচাড়া করে বাদল। পাশে ঘনিয়ে বসা বিনয়ের শরীরটা ভারী হয়ে হেলে পড়েছে তার গায়ে। কখন যে তার চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে বুঁজে গেছে, টেরও পায় নি সে।

জেগে আছে শুধু বাদল।

বাইরের ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের ডালে বসা পাখিটা মাঝে মাঝে পাখা ঝটপট করে উঠছে, ঠিক তারই মতো অতন্দ্র হয়ে জেগে আছে বাদলের চোখ দুটি।

স্মৃতির সরোবরে কতো ঢেউ আনাগোনা করে। মনে পড়ে প্রথম যৌবনের জ্বালা ভরা দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে অমিতার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটি,—মধুর, করুণ, নিষ্ঠুর দিনটির কথা। আজ মনে হ'চ্ছে তাদের দেখা না হলেই যেন ভাল হ'ত। শরাহত

পাখির মতো রক্তাক্ত হৃদয়ক্ষতটাকে বয়ে বয়ে বেড়াবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হত না তা হলে। না-না-না, নিজের মনেই মাথা নাড়ে বাদল। দেখা হয়েছে ভালোই হয়েছে, তা না হলে এই আশ্চর্য সুন্দর পীড়নের স্বাদ পেত কি করে সে। নিষ্ফল প্রেমে বেদনা আছে ঠিকই কিন্তু তার ভেতরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো সুনিবিড় আনন্দানুভূতিও লুকিয়ে আছে।

বাদলের মনে পড়ে—বাধা-বিঘ্নের কাঁটা ভরা ডালেও তাদের প্রেমের গোলাপটি কি সুন্দর ভাবেই না ফুটে উঠেছিল। কী সতেজ, কী মনোরম!

কিন্তু রইল না। সামাজিক অনুশাসনের তপ্ত নিঃশ্বাসে সে গোলাপটি ম্লান হয়ে গেল। ঝরে পড়ে গেল তার পাপড়িগুলো তাদেরই চোখের সুমুখে।

জাতিভেদের দুস্তর বাধা তাদের মিলনে।

বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে বাদলের। শেষ বিদায়ের দিনে এই বুকে মাথা গুঁজে কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল অমিতা।

কিন্তু অমিতারা শুধু কাঁদতেই জানে। দুজনে মিলে পালিয়ে যাবার যে দুঃসাহসিক প্ল্যান করেছিল বাদল, তাতে রাজী হয়েও চরম মুহূর্তে পিছিয়ে গিয়েছিল অমিতা।

সে রাতও ছিল এমনি নিবিড় কৃষ্ণ, চন্দ্রমাহীন। থেকে থেকে দমকা বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল তার অলকগুচ্ছ, উড়িয়ে নিচ্ছিল তার বুশ সার্টের প্রান্ত দুটি। মাথায় ওপর টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল শিরীষ ফুল। ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে আর দূর অন্ধকার পথের দিকে উৎসুক চোখে তাকানো ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল

না তার।

ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে এসেছিল। দূর দিগন্তে উষা ও অনিরুদ্ধের লুকোচুরি খেলা শুরু হল, কিন্তু অমিতা আসে নি।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাদল। হয়তো ঠিকই করেছে অমিতা। কক্ষচ্যুত তারকার মতো জ্বলতে জ্বলতে নিভে ছাই হতে না চেয়ে ভালোই করেছে।

যোগেন তার বন্ধু। যোগেনের সাথে বিয়ে হয়েছে ভালোই হয়েছে। যোগেন ভালোবাসে অমিতাকে। সব কিছু জেনেও বিয়ে করেছে তাকে। শান্তিময় হোক তাদের জীবন। আর না, এবার চিরকালের জন্য দূরে সরে যাবে বাদল, অমিতার জীবনে বিপর্যয় টেনে আনবার জন্য আর কোনো দিন তার সুমুখে এসে দাঁড়াবে না। যোগেন যতই উদার হোক না কেন, কোনো স্বামীই তার স্ত্রীর মনটি চুম্বকের মতো উত্তর পুরুষের দিকে সর্বক্ষণ চেয়ে থাক এটা সহ্য করতে পারে না। দূরত্বই আকর্ষণ শিথিল করবার একমাত্র উপায়।

এমনি সময়ে বাইরে থেকে হু হু করে আসা বাতাস থেমে এল। স্বচ্ছ মেঘ এসে বুঝি ঢেকে দিয়েছে আকাশের তারাগুলো। নিবিড়-তর অন্ধকারের বিশাল সমুদ্রে গীষ্পতি-নিবাস যেন একটা দ্বীপ।

ঠিক তখনি কানের কাছে কার নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করে বাদল আর সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় বিনয়। হতবুদ্ধি বাদলকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই বুঝি হঠাৎ তার কানের কাছে ফেটে-পড়ল একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অট্টহাসি। কার লঘু বিলীয়-মান পদশব্দের সঙ্গে সে হাসিও মিলিয়ে গেল,—গলে গেল পাশের ঘরের অন্ধকারে।

ভীষণ ভয় পেয়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগল বিনয়, আর তার হাতের ঝটকা লেগে বাদলের হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ল দূরে।

আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করে না বিনয়। দিশেহারা হয়ে এক লাফে গরাদহীন জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে নিচে, তারপর প্রাণ-পণে ছুটতে থাকে মাঠের ভেতর দিয়ে। তার কেবলি মনে হতে লাগল যেন লম্বা লম্বা তালগাছগুলো গুঁড়ি থেকে আলগা হয়ে এক পায়ে ছুটে আসছে তাকে পিষে মেরে ফেলবার জন্য। মরীয়া হয়ে ছুটতে থাকে বিনয়। কিছু দূর এগিয়ে শাখাবহুল বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়ে ছুটবার সময়ে মাটির ওপরে উঁচু হয়ে থাকা শিকড়ে পা বেঁধে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর উঠলো না।

বিনয়ের আকস্মিক পলায়নের পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল বাদল। হঠাৎ তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে কার যেন উপস্থিতি অনুভব করল সে। একটা লঘু উষ্ণ নিঃশ্বাস তার ডান কান ছুঁয়ে চলে গেল। তার খুব কাছেই ঘন অন্ধকারে একটা আকারহীন অবয়ব ভেসে থাকতে দেখল সে।

মাথার চুলগুলো সব দাঁড়িয়ে গেল বাদলের। আলো নেই, টর্চটা কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে, অভ্যাসবশে ডান হাত দিয়ে কোমরে বাঁধা রিভলবারের বাঁটটা চেপে ধরল। এক সঙ্গে মনে পড়ে গেল আজ সন্ধ্যায় শোনা অনেকগুলো ভৌতিক কাহিনী। এমন সময়ে তার বিমূঢ় চেতনাকে আচ্ছন্ন করে অন্ধকারের ভেতর থেকে কার দুটো হাত যেন সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরল তার গলা। ধীরে ধীরে একটা অদেখা শরীরের দৃঢ় আলিঙ্গনের নিষ্পেষণে ভেঙ্গে দুমড়ে যেতে চাইল তার শরীর।

কঠিন যন্ত্রণায় প্রাণপণ শক্তিতে গলায় চেপে ধরা হাত দুটি বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল বাদল। মণিবন্ধের সোনার চুড়িগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গেল সেই প্রবল চাপে। প্রাণঘাতী যন্ত্রণা ভুলে অসীম বিস্ময়ে বাদল বলে উঠল, "কে—কে তুমি? অমিতা?"

সেই ঘন অন্ধকারেও চোখের কাছে দু'পাটি দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল। খোনা গলায় সেই অদেখা মূর্তি বলে উঠলো,—"অঁমিতাই ছিলুম। এঁখন আমি পেত্নী—" ততক্ষণে বাদলের যুযুৎসুর প্যাঁচে ধরাশায়ী হয়েছে আততায়ী। মাটিতে পড়ে দু হাতে বাদলের পা ধরে এমন টান দিল যে হুমড়ি খেয়ে বাদলও পড়ল মাটিতে।

অনেকক্ষণ ধরে ঝটাপটি করে একটা সুযোগ পেয়েই আন্দাজে রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ল বাদল।

একটা তীব্র চিৎকার, তারপর মৃদু গোঙানি, দু' বার গড়াগড়ি যাওয়া। তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল সব।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টর্চটা খুঁজে পেল বাদল। কিন্তু বিকল টর্চ আর জ্বলল না।

গুরুতর পরিশ্রমের ফলে ঝড়ের মতো নিঃশ্বাস পড়ছে বাদলের নাক মুখ দিয়ে। ঘামে গেঞ্জী জামা সব ভিজে গেছে। হাত পায়ের নানান জায়গা ছড়ে গেছে। এতক্ষণ পরে জ্বালা করছে।

দেয়ালে পিঠ মাথা ঠেকিয়ে অবসন্নের মত বসে রইল বাদল।

ভোর হ'ল। তাড়া খাওয়া শেয়ালের মতো পালিয়ে গেল নিশীথ অন্ধকার।

সদলে শিবনাথ, গোপাল আর ভারতী গীষ্পতি নিবাসের বড় ঘরটায় ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেল।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকা মৃত যোগেনের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে উস্কখুস্ক চেহারার বাদল রায়। এক রাত্রেই তার বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

আর কী আশ্চর্য, যোগেনের পরনে শাড়ি। হাতে সোনার চুড়ি। রিভলবারের গুলিটা কাঁচুলি আঁটা বুক ভেদ করে চলে গেছে।

না। অমিতার তৃতীয় স্ট্রোক হতে পারে নি। হবেও না আর।

× বাঁকাচোরা
×
×
×
×
×
×
×
×
×

বদরপুরের বড়ো দারোগা বৃন্দাবনকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে। হতাশা আর ক্ষোভ উঁকি দিচ্ছে তার ছোট ছোট চঞ্চল চোখের ভেতর দিয়ে।

নৌকোটা পাশাপাশি তিন ঘর ঠেলে পরেশ বলে,—"কিস্তি।"

কিস্তি সামলাতে গিয়ে ঘোড়াটাকেই মরিয়ে দেয় বৃন্দাবন।

জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করে মাথা নেড়ে পরেশ মল্লিক বলে,—"তোমার আজ হয়েছে কি হে বৃন্দাবন! অমনি অমনি ঘোড়াটাকে দিয়ে দিলে? জব্বর খেলছিল যে ঘোড়াটা—"

খেলাটা আর একটু এগুতেই পরেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে যে খেলাতে একেবারেই মন নেই দারোগাবাবুর।

একটু পরেই কিস্তি মাৎ হয় বৃন্দাবন, অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগে, অনেক খারাপভাবে।

বড়েগুলো গুনে থলিতে তুলতে তুলতে পরেশ বলে,—"খুলেই বলো না ব্যাপারটা—কৈফিয়ৎ তলব করেছে পুলিশ সাহেব, না ঘুষ নেবার বেনামী দরখাস্ত পড়েছে তোমার নামে?"

বাইরে ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে। আকাশের কোন কোণে যে একফালি চাঁদ আছে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। আধা

শহর বদরপুরে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বৃন্দাবন বলে,—"মহা মুস্কিলে পড়ে গেছি দাদা—"

মুচকি হাসি খেলে যায় পরেশের ছুঁচলো মুখে।

হোমিওপ্যাথি করে পরেশ মল্লিক। জমিজমাও আছে কিছু, ভাগে চাষ হয়। বেশ একটু ঠাটের সংগেই থাকে। কিন্তু মাথার ভেতরে অনেকখানি বুদ্ধি ঠেসে দিয়েছেন ভগবান, রোগের লক্ষণ বিচার করেও তার অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকে। তারই এক অংশ খরচ ক'রে বদরপুর থানার ছোকরা দারোগাদের নানান সমস্যা মেটায়। ঐ সূত্রে মাঝে মধ্যে বেশ কিছু টাকাও হাতে এসে যায় আচমকা। থানার সংগে দহরম মহরম আছে বলে আশেপাশের অনেকগুলো গাঁয়ের মানুষ বিশেষ সমীহের সঙ্গে এড়িয়ে চলে তাকে।

আড়ালে বলে—ব্যাটা স্পাই, ইনফর্মার—টাউট—

সদরের ইনস্পেক্টর বাবুও পরেশকে জানেন একজন টাউট বলে।

আর এক দফা চা আসে চাকরের হাত দিয়ে। সদ্যোন্মুক্ত অন্দরের দরজার দিকে পরেশের চোখ এড়িয়ে সতৃষ্ণ চোখে তাকায় বৃন্দাবন। পাশেরটাই পরেশের শোবার ঘর। একটা ফর্সা হাতের ঝিলিক দেখেই চোখ ফেরায় বৃন্দাবন।

চা খেয়ে দুজনেই চাংগা হয়ে ওঠে। আলমারি মাথায় রাখা চ্যাপ্টা বোতলটার দিকে চোখ যায়।

"খাওয়া দাওয়ার পরে, বুঝলে,—" চোখ টিপে বলে পরেশ,—

"তোমার কোয়ার্টারে তো মেয়েছেলে নেই, নিয়ে যাবো তোমার ওখানেই। এখন তোমার মনমরা ভাবের ব্যাপারটা খুলে বলো, শুনি—"

"সেই বেগমগঞ্জের কেসটা—" দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরটার আড়ামোড়া ভেংগে বলে বৃন্দাবন। লণ্ঠনের লাল আলো ওর লম্বাটে মুখে আর চকচকে চোখে পড়ে। পেছনের সাদা চুণকাম করা দেয়ালে বিকৃতগঠন কিম্ভূত ছায়াটা কাঁপে,—"একটা ছুকরীকে এ্যারেষ্ট করেছি আজ সকালে, আসামী কাল্লু শেখের ভাগ্নী। দেখে শুনে মনে হ'ল বেটি জানে সব কথাই—চোরাই মালটার হদিশও জানে বলে মনে হয়। কিন্তু মুখে যেন কুলুপ এঁটে আছে শালী, বাগ মানাতে পারলাম না কোনোমতেই।"

"দু'চার ডিগ্রি চাপিয়েছিলে কি?"

"আরে ধ্যুৎ, ও বেটি অল ডিগ্রি প্রুফ। স্বয়ং কাল্লু শেখের ভাগ্নী যে হে—ও দু'চারটে চড় কিম্বা বাঁশডলাও চোখ বুঁজে সয়ে যাবে।"

"বয়েস?"

"তেইশ চব্বিশ—"

দু'চোখ বুঁজে ভাবতে থাকে পরেশ বাইরের দিকে মুখ ক'রে। অন্দরের দিকে মুখ ক'রে বসে প্রতীক্ষা করে বৃন্দাবন। অন্দরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে যায়। পরেশের দ্বিতীয় পক্ষের অল্পবয়সী বউ কনকলতার গোল মুখটা উঁকি দেয় একবার। দু'চোখ দিয়ে এক বিচিত্র ইসারা ছড়িয়ে দেয়। তারপরেই সাঁৎ করে সরে যায়।

একটু আগেই পরেশ মল্লিকের মুখে যে ধরণের হাসি ফুটেছিল

তারই ছোঁয়া লাগে বৃন্দাবনের ঠোঁটে।

"ঠিক আছে—" মাথা নেড়ে পরেশ বলে,—"কিস্তি মাৎ হবে বলেই মনে হয়। মেয়েটা আছে কোথায়?"

"লক-আপে"।

"আমাকে নিশ্চয়ই চেনে না মেয়েটা। মোক্তার সেজে যাবো ওর কাছে, ওর জামিন হতে। উপকারী মোক্তারের কাছে সব কথা খুলে বলতে আপত্তি করবে না নিশ্চয়ই। আর একান্তই যদি কাৎ না হয় এ চালে, তবে আর একটা বুদ্ধিও এসেছে মাথায়—চলো তাহলে ওঠা যাক এবার—"

কাছেই বদরপুর থানা। তিন মিনিটের রাস্তা।

নীল সাইনবোর্ডে সাদা হরফে বাংলা আর ইংরিজীতে থানার নাম লেখা। ভেতরে ঘরে তিনটি টেবিল, পাঁচ সাতটা চেয়ার, বেঞ্চি। দেয়ালে দেয়ালে চার্ট, র‍্যাকের ওপর রেজিষ্টার, ফর্ম, পুরোনো জেনারেল ডায়েরীর স্তূপ। কাছেই বেংগল কোল-এর বড়ো কলিয়ারী, তাদের আনুকূল্যে বিদ্যুৎ আলোয় ঝলমল করছে থানাটা।

বড়োবাবু বৃন্দাবনকে দেখে কর্মরত এ. এস. আই. সন্তোষ চোখ তুলে তাকায়, তাকিয়ে দেখে জরার চিহ্ন আঁকা পরেশ মল্লিকের উত্তেজিত মুখ। সেকেণ্ড এস. আই. পীর মহম্মদ কেস ডায়েরী লিখতে ব্যস্ত। ক্রশবেল্টটা খুলে চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে প্যান্টের প্রথম বোতাম দুটো খুলে ভুঁড়িটাকে একটু আলগা ক'রে বসেছে সে।

বৃন্দাবনের ঘন কালো চুল আর ভ্রূ আর ছাঁটা গোঁপে বিদ্যুতের

আলো পড়ে চিকচিক করে, চিকচিক করে, মসৃণ পালিশ করা ক্রেশবেল্ট আর খয়েরী রং-এর জুতো।

চেয়ার টেনে জেনারেল ডায়েরী নিয়ে বসে বৃন্দাবন। পাশের দিকে সিপাহী ব্যারাকের দিকে এগিয়ে যায় পরেশ মল্লিক।

হাবিলদার রামকিষুণ ব্যারাকের ভেতরে লোহার খাটিয়ায় বসে খইনি বানাচ্ছিল বাঁ হাতের তালুতে। অকস্মাৎ পরেশ মল্লিককে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ায়। তাকে ডেকে নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কানে কানে কি যেন বলে পরেশ। রামকিষুণের মস্ত গোঁপের একটা প্রান্ত পরেশের গালে লাগে, সুড়সুড়ি দেয়।

সব শুনে মাথা নেড়ে রামকিষুণ বলে,—"ঠিক হ্যায় বাবুজী—"

খুশী মনে গায়ের চাদরটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে জেনানা হাজতের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় পরেশ।

গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখে। একটা বাঘিনী যেন বন্দিনী হয়ে আছে খাঁচায়। কালো পাথরে খোদা অপূর্ব সুন্দর শরীর স্বল্প বাসের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে অনবদ্য যৌবনশ্রী।

দেখে দেখে পরেশের মিয়িয়ে আসা ঠাণ্ডা রক্তেও যেন আগুন ধরে যায়।

কালো উদ্ধত চোখে পরেশকে একবার দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেয় মেয়েটা।

ফিসফিস করে পরেশ ডাকে—"এই আতর······শোন ইদিকে —ভয় নেইরে, আমি মোক্তারবাবু, শুনলাম কাল্লু শেখের ভাগ্নিটাকে পুলিশে ধরেছে, তাই ছুটে এলাম। কাল্লু আমার পুরনো মক্কেল

কি না—"

সন্দিগ্ধ চোখে পরেশের দিকে তাকায় আতর বিবি। দুই চোখের কালো তারায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।

"এই আতর, শোন না ইদিকে"—চাপা স্বরে আদেশের সুর ধ্বনিত হয়।

অনিচ্ছুক পায়ে একপা দু'পা করে লোহার গরাদের কাছে এসে দাঁড়ায় আতর বিবি। পরেশের মুখে সোজা চোখে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে।

নাঃ, স্নিগ্ধ অমায়িক হাসি ছাড়া অন্য কিছু নেই পরেশের মুখে।

"হ্যাঁরে একরার করিসনি তো দারোগার কাছে?"

নিঃশব্দে মাথা নাড়া দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে পরেশের; বলে, "আমি জানি প্রাণ গেলেও তুই তা করবি না। সে মেয়েই তুই নোস। দারোগার কাছে কি আর কবুল করতে আছে রে! তবে আমাদের কথা আলাদা, আমরা হচ্ছি মোক্তার। সব কথা শোনা জানা হলে তবেই না কেসটি ঠিক মতো সাজাবো। তা জামিনের জন্য ভাবিস না, জামিন দেবে না কোন ব্যাটা? তবে হ্যাঁ সব কথা না শুনে তো আর ধারা ফারা গুলো সব ঠিক করা যাবে না—"

একটু আশার আলো নেচে উঠেছিল আতরের মুখে চোখে। পরেশের শেষ কথা শুনে দপ্ করে নিভে গেল।

তাই লক্ষ্য করে ব্যাকুল হয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে আতরের হাত চেপে ধরে পরেশ, বলে,—"কেন মিছে ভাবছিস—মোক্তারকে সব কথা খুলে না বল্লে মামলা লড়ব কি করে?"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় আতর বিবি। দুই চোখে বিদ্যুৎ ছড়ায়। তাড়াতাড়ি আধো অন্ধকার হাজত ঘরের এক কোণে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

শিকার ফস্কে যেতে দেখে রাগে আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে পরেশের। চাপা তর্জন সুরে বলে—"মরবি তুই, আমার আর কি। রাত্তির বেলা······সেপাই ব্যারাকের পাশেই থাকার মজাটা বুঝবি তখন।"

কান খাড়া করে পরেশের কথা শোনে আতর। তার নির্বিকার মুখে ব্যাকুল শংকার ছায়া পড়ে,—কিন্তু সে শুধু পলকের জন্যই। মাথা উঁচু করে আতর বলে,—"ব্যারাকের পাশে আবার ভয়টা কিসের ?"

"ভয়টা কিসের ?" মুখটা ছুঁচলো করে পরেশ মল্লিক।—"জানিস না ? নেকী নাকি তুই ? তোর গা ভরা যৌবন, আর ও দিকে সেপাই গুলো উপোসী নেকড়ের মতো হন্যে হয়ে আছে,—আমি তোকে জামিনে খালাস না করলে আজ রাতে ওরা তোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে—"

আতর বিবির চোখের তারায় শঙ্কা ঘনায়, তবু জোর করে অবিশ্বাসের সুরে বলে ওঠে,—"যাঃ, তাও কি কখনো হয় ? এটা থানা না ?"

আতরের কথা শেষ হবার আগেই। প্রচণ্ড সোরগোল তুলে পাঁচ ছ' জন বিশালকায় ভোজপুরী সিপাহী খালি গায়ে শুধু প্যান্ট পরে হাজির হয় পরেশের পেছনে। সবার হাতে একটি করে জলভরা বালতি। অনেক দূরের আলোর রেখা ওদের খোলা বুকের লোমে

আর অনাবৃত ভুঁড়িতে পড়ে চকচক করছে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে ওদের পৃথুল দেহ।

বুটের খট খট শব্দ তুলে রামকিষুণ এসে হাজতের তালাটি খুলে দিয়ে চাবি নিয়ে সরে পড়ল, আর সংগে সংগে খোলা দরজার মুখের কাছে হুড়মুড় করে এসে পড়ল পেছনের সিপাহীরা। একজনের হাতের বালতি থেকে খানিকটা জল চলকে পড়ে ভিজিয়ে দিল মেঝে।

"হাম পহলে যায়গা,"—বজ্র গর্জনে হেঁকে উঠলো খোদাবক্স।

"হাম যায়গা—" আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে রাম নগিনা।

"নেহি নেহি, হাম যায়গা—" তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে রাম-নেহোরা।

"হাম যায়গা—"

"হাম যায়গা......"

"মোক্তারবাবু, আপ হিঁয়াসে হঠ্ যাইয়ে—" বলে আলগাভাবে পরেশকে ঠ্যালা দেয় গৌরীশংকর।

রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে আতর বিবি। বেতস লতার মতো কম্পমান ওর যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সিপাহীরা, তারপর ক্ষিপ্ত কোলাহলে যেন উন্মাদ হয়ে যায়। কে যেন গান গেয়ে ওঠে হোলির অশ্লীল গানের একটা কলি।

এক পা দু' পা সরে যায় পরেশ মল্লিক। হাজতের কোণার দিকে পৌছবামাত্র এক ছুটে দৌড়ে এসে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার চাদরের খুঁটটা খামচে ধরে আতর বিবি।

ভয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

সে দিকে চেয়ে একটা পাশব উল্লাস অনুভব করে পরেশ তার রক্তের মধ্যে। বলে,—"দেখছিস তো ওদের,—কাল সকালে আর আস্ত পাওয়া যাবে না তোকে—"

নাকের ফুটো ফুলে ওঠে আতর বিবির। স্পষ্টভাবে দেখা যায় বুকের সঘন উত্থান-পতন। আর্ত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে,—"যাবেন না, যাবেন না মোক্তারবাবু,—জামিনে খালাস করুন আমাকে—দোহাই আপনার—" হাঁপাতে থাকে আতর বিবি।

সূচী-সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ হাসিটুকু বেমালুম গোপন করে পরেশ বলে,—"কিন্তু সব কথা খুলে না বললে—"

"সব বলব, সব বলব আমি, ঐ ওদের হাত থেকে বাঁচান আমাকে, আপনি আমার মা বাপ—"

মুহূর্তে চেহারা পাল্টে যায় পরেশের—বজ্র গর্জনে হেঁকে ওঠে—"এ্যাইও সিপাহী লোগ—ই ক্যা বেকানুনী বাৎ—ভাগো জলদি, নেহি তো বড়াবাবুকো বুলায়গা হাম—"

থেমে যায় সিপাহীদের বোলচাল।

কে একজন শুধু বলে—"আচ্ছাঃ, যাতা হ্যায় আভি। লেকিন আপ্ চলা যানকে বাদ ফির্ আয়গা হামলোগ। ছোড়ে গা নেহি উস্কো। হাঁ।"

বস্ত্রভেদী দৃষ্টি দিয়ে আতর বিবির সর্বাংগ লেহন করতে করতে সিপাহীরা চলে যায় একে একে।

কান্নায় ভেংগে পড়ে আতর বিবি। সর্ব প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। হাজতের ভেতর ঢেকে পরেশ।

ঘণ্টাখানেক ধরে নানান জেরা করে, টুকিটাকি সবকিছু জেনে নেয় পরেশ। তারপর হাবিলদার রামকিষুণকে ডাকে।

হাজতের তালা আঁটা হয় আবার।

"জামিনের ব্যবস্থা করে এখুনি আসছি আমি,—" বাইরে দাঁড়িয়ে আতরকে আশ্বাস দেয় পরেশ,—"ভয় নেই তোর—ওরা আর আসবে না।"

উল্লাসভরা বুকে থানার ঘরে ঢোকে পরেশ। ফাঁকা ঘর, এক কোণে শুধু মালখানার এ. এস. আই. হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। দেয়ালঘড়িতে চোখ পড়তে চমকে ওঠে পরেশ,—ইস্, রাত এগারোটা বেজে গেছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা বাড়ায় পরেশ।

সদর দরজায় বারংবার অসহিষ্ণু টোকা দিয়েও বেশ খানিকক্ষণ বাইরের ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে। অল্প দূরে পেছনের খিড়কীর দরজার কাছে খর খর শব্দ ওঠে। সাপ কি শেয়াল কে জানে ভেবে দরজার সঙ্গে সিটিয়ে দাঁড়ায় পরেশ।

ঘুম ঘুম ফোলা চোখে দরজা খুলে দেয় কনকলতা।

রান্নাঘরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আঁচাবার পর শোবার ঘরে ঢুকে যেন সাপ দেখে পরেশ।

খাটের বাজুতে বৃন্দাবনের ক্রশবেল্টটা ঝুলছে।

পরেশের বৌ কনকলতার চোখ দুটোও যেন আটকে গেছে বেল্টটার ওপর। ফ্যাকাশে গোলমুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নেই।

বিড়বিড় করে বলতে থাকে পরেশ,—"এটা এখানে এলো কি করে—এটা এখানে এলো কি করে—এ্যাঁ…"

মাথায় রক্ত উঠতে থাকে, খুন করবার মতো রাগ বুকের হাপর থেকে বেরিয়ে এসে দুর্নিবার জ্বালা নিয়ে শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপে পরেশ মল্লিক···তার প্রৌঢ় রক্ত ক্রোধের অগ্নি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না।

× দুরাশা
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ইয়ুনিয়ন আপিসের সামনে বারান্দায় বসে আছে নজর আলি। প্রায়ই বসে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গালে দশ বারো দিনের না কামানো দাড়ি,—কাঁচা পাকা, অনেকটা কদম ফুলের মতো। বসা নাক, ছোটো চোখ, বসন্তর দাগ ভরা মুখে চোয়ালের হাড় দুটো বিশ্রী রকমে উঁচু। পোড় খাওয়া লিকলিকে শরীর।

আপিসের ভেতর দামী চেয়ারে বসে আছে ইয়ুনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী হাকিম মিঞা, তার সামনে পেছনে, আসে পাশে অনেক লোকের ভীড়। রোজ ঘী দুধ খাওয়া, ডন বৈঠক করা শরীর ওদের কামানো ঘাড় মেদভারে স্ফীত। গয়া, আরা আর হাজারীবাগ, গোরখপুর আর মজঃফরপুরেরও কমতি নেই, আছে রাণীগঞ্জ, পাঁড্‌রা আর অণ্ডালের চাষী, বাগ্দী বাউড়ীরা। নিষ্কাশনপুর মজদুর ইয়ুনিয়নের চাঁই সভ্য এরা।

"হামার কেস ক্যা ভইল, এ হাকিম সাব্—"

"হামার ডবল ইনক্রীজ চাহী—"

আবেদন নিবেদনের আর অন্ত নেই।

প্রসন্ন মুখে ডান হাতের বরাভয় মুদ্রা উত্তোলিত করে সবাইকে

অভয় দেয় হাকিম মিঞা। ডিপার্ট নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে গোপনে।

এদের ভীড় ঠেলে সামনে এগুতে পারে না নজর আলি, মেশিন সপের অয়েলম্যান সে। ওভার হেড শাফ্‌টে চেপে বসে তেল চর্বি ঠুসতে ঠুসতে নিচের দিকে তাকালেই ভির্মি লাগে তার। বয়েস হয়েছে, লোহার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পা কাঁপে তার থরথরিয়ে। একটাকা ছ' আনা রোজ আর মাহাংগী পঁচিশ টাকা, এই দিয়েই সংসার চালাতে হয় তাকে। সংসারটিও ছোটো নয়, পাঁচটি বালবাচ্চা ও একটি বিবি বর্তমান। সহজ সরল নির্বিরোধ মানুষ নজর; দল নেই তার কিন্তু দেনা আছে।

দেনা করেছিল দু'বছর আগে রামভরোসার কাছে,—পঞ্চাশ টাকা। বড়ো ছেলে চেরাগ আলি তখন নিউমোনিয়ায় যায় যায়। বড়ো ডাগ্‌দর ডাকতে হয়েছিল তাকে। কোম্পানীর ডাক্তার ঘরে আসতে চায় না, এলেও লম্বা ভিজিট চায়। আর কোম্পানীর হাসপাতালের ওষুধ তো পানি বরাবর। সেই দেনা। আজ পর্যন্ত প্রতিমাসে দশটাকা করে সুদই দিয়ে যাচ্ছে সে। আসল আর শোধ হয় না তার। প্রত্যেক হপ্তার দিন খাটালির খাম খানা দিতে হয় রামভরোসার হাতে। খাম ছিঁড়ে পাঁচ টাকার করকরে নোটটি বার করে নেয় সে—নজর আলির ফোঁটা ফোঁটা রক্তে তৈরী নোট, নির্নিমেষ বোবা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখে সে। যা ফেরৎ পায় তাতে সংসার চলে না নজর আলির। আবার দেনা করে ইলিয়াস খাঁর কাছে। ইদানীং তার সুদ মিটিয়ে যা থাকে তাতে শুধু চালের খরচটাই হয় নজর আলির।

গত দশ বছর ধরে ইনক্রীমেণ্ট বন্ধ আছে তার। গ্রেডের শেষ সীমায় নাকি পৌঁছে গেছে সে। তার মজুরী আর বাড়াতে চায় না কোম্পানী।

এ জন্যই ধর্না দিয়েছে ইয়ুনিয়ন আপিসে। যদি গ্রেডটা বদলায়। ইলিয়াস খাঁ, মহতাব আলি, রামনগিনা ওঝা, রাম অওতার সিং সবাই ছিল ঐ এক টাকা ছ' আনার গ্রেডে। কিন্তু ইয়ুনিয়ন সেক্রেটারীর সুপারিশে ওরা সবাই এখন দু' টাকা তিন আনার গ্রেডে পৌঁছে গেছে।

পড়ে আছে শুধু নজর আলি।

মুরুব্বি তার নেই কেউ। বোলচাল ঝাড়তেও ওস্তাদ নয় সে। কাজের চাপে আর সংসারের ভারে কুঁজো তার পিঠখানা নজরেই পড়ে না কারুর। তার মুলুকের কোন লোক ইয়ুনিয়নের চাঁইও নয়। সে পারেও না ম্যানেজারের বাংলোয় হুইস্কির বোতল পৌঁছাতে, সাহসে কুলোয় না।

ইয়ুনিয়ন আপিসেও আসত না সে। কিন্তু মাস চারেক আগে এক মাস-মিটিংএ ইয়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্ট সাহেবের বক্তৃতাটাই তার মাথা গোলমাল করে দিয়েছে। মজদুররাজের এক স্বপ্নছবি এঁকেছিলেন তিনি ভাষার তুলি দিয়ে। সে রাজ্যে দুঃখী নেই কেউ, অভাব নেই কারুর। শোষণ, অত্যাচার আর নিপীড়নের সমাধি দেওয়া হয়েছে সে রাজ্যে। শুনতে শুনতে শরীরের স্বল্পাবশিষ্ট রক্তও টগবগ করে উঠেছিল নজর আলির। এতদিন ধরে সে জেনে এসেছে যে এই কোম্পানী কোন এক হেজহগ সায়েবের, এবারে শুনলো যে তা নয়, কোম্পানী তাদেরই, তারাই আসল মালিক।

যারা মেহনত যোগায়, নিজের বুকের রক্ত ঢালে তিল তিল করে, কারখানা তাদেরই।

"মজতুররাজ কায়েম করতে হবে। সংগঠন মজবুত করতে হবে, ভাই সব, আপন আপন চাঁদা জমা দাও ইয়ুনিয়ন আপিসে..."

উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন প্রেসিডেণ্ট সায়েব।

আকাশ-ফাটা জয়ধ্বনি ওঠে। নজর আলির ক্ষীণ কণ্ঠও মেশে সে সংগে।

অবিশ্বাস্য সুন্দর, ঝকঝকে কার-এ করে পাটনার দিকে চলে গেলেন প্রেসিডেণ্ট সাহেব। ট্রেণের ঝামেলা তাঁর পোষায় না, হোক না একটু পেট্রোল খরচ। সবাই চাঁদা দিলে তার দাম উঠে আসতে কতক্ষণ? মজতুরদের চিন্তায় রাতে তাঁর ঘুম হয় না দু'পেগ হোয়াইট লেবেল সেবন সত্ত্বেও। আর তাঁর একটু আরাম বিধানের চেষ্টা কি করবে না মজতুররা কৃতজ্ঞ চিত্তে?

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে ছিল মিস্ সাহানা সেন। লাউড স্পীকারে প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তারও। হ্যাঁ ক্ষমতা আছে বটে লোকটার। সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি বললেও ধরবার যোটি নেই কারুর।

ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি ষ্টার্ট দেন প্রেসিডেণ্ট। চতুর্দিকে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি মুখর অগণ্য জনতা। সুমুখে দাঁড়িয়ে হাকিম মিঞা। দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট গংগাধর মোদক। যোগেশ্বর রায়, রামনাথ সিং আর বিষণ মহারাজও প্রেসিডেণ্টের সান্নিধ্যে যাবার প্রতিযোগিতায় ঠেলাঠেলিতে ব্যস্ত।

কট করে শব্দ হ'ল। জ্বলে উঠলো হিংস্র দানবের চক্ষুর মতো

তীব্র হেডলাইট দুটি, জ্বলে ওঠে রক্ত চোষা বাদুরের চোখের মতো পিছনের রক্তিম বাতিটি—। ছেড়ে দিল গাড়ি। পিচ্‌ঢালা জি. টি. রোডের মসৃণ পথে গলে গলে গড়িয়ে গড়িয়ে তেলালো গতিতে নিঃশব্দে ছুটতে লাগলো দামী অষ্টিন।

বাঁ হাত খানা প্রসারিত ক'রে মিস সাহানার গালে মৃদু টোকা দিয়ে প্রেসিডেণ্ট বল্লেন,—"কেমন শুনলে আজকের ভাষণ ?"

রোমাঞ্চ জাগে সাহানার শরীরে। বেড়ালের মতো ঘড় ঘড় শব্দ হয় গলার ভেতর। মৃদুস্বরে বলে—"চার্মিং।"

"ইউ আর এ ডার্লিং—" আদর মাখা সুরে বলেন প্রেসিডেণ্ট।

এ্যাক্‌সেলেটারে মৃদু চাপ দিতেই উল্কা বেগে ছুটে চলে গাড়ি। কোম্পানীর বড়ো কর্তার সংগে নৈশ ভোজনের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে আজ তাঁর। দু নৌকোয় পা দিয়ে খাসা আছেন তিনি।

সারারাত ঘুম হয় না নজর আলির। তারাই তা হলে আসল মালিক এ কারখানার। শ্বেতচর্মরা কেউ নয় তবে! আজাদী এসেছে দেশে। গরীব লোকেরও ইজ্জৎ আছে, জানোয়ার নয় তারা। তাদের সংগে বে-ইনসাফি করবার হক্‌ নেই কারুর।

ছেঁড়া চ্যাটাই এ শুয়ে, তৈলসিক্ত ফাটা বালিসে মাথা রেখে মশক দংশন বেদনা ভুলে গিয়ে স্বপ্নের ঘোরে মিটি মিটি হাসে নজর আলি। পাশে শুয়ে আছে তার বিবি আতর জান। আধপেটা খাওয়ার নিত্যক শারীরিক যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আসে শরীর তার। পাশে শোওয়া পাঁচটি বাচ্চার পাঁজরের হাড় উঁচু হয়ে আছে।

পচা নর্দমার গন্ধ আসে দমকা বাতাসে। ঘুমের ঘোরে নজর আলি ভাবে বেহেস্তের গন্ধ।

পরদিনই সবাই অবাক হয়ে যায় নজর আলির ব্যবহারে। এ নজর যেন সে নজরই নয়। দিব্বি বোলচাল ঝাড়ছে সে। সারাক্ষণ শুধু আজাদীর গল্প। চোখ দুটো যেন নেশা না করার নেশায় ঢুলুঢুলু।

পরের হপ্তার দিনে খাটালির খাম খানা নির্দ্বিধায় তুলে দিল না অপেক্ষমান রামভরোসার হাতে ; বল্ল, "এৎনা রোজ হো গিয়া, রুপেয়া অসূল নেহি হুয়া ?"

"ক্যা বোলা ?" গর্জন করে ওঠে রামভরোসা। চোখের পলকে বাঘ থাবায় নজর আলির শার্টের কলার চেপে ধরে সে,—"মাতোয়ালা হুয়া ক্যারে—" ডান হাতে জোর করে কেড়ে নেয় নজর আলির হপ্তার খাম। দশ টাকার নোট খানা বার করে নেয় এক মুহূর্তে। ফিরতি টাকা কটা নজর আলির গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে অন্য শীকারের সন্ধানে এগিয়ে যায় রামভরোসা।

সুমুখে দাঁড়িয়ে ছিল লেবার আপিসের কর্মচারী টুনু সেন। সব দেখে মুচকে মুচকে হাসে সে। যদিও সুদ নেওয়া কোম্পানীর আইনে নিষিদ্ধ, তবু চুপ করেই থাকে সে। কে যাবে রামভরোসার মতো গুণ্ডার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে। লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটলে কি কোম্পানী দেখবে তাকে ?

এই কেস নিয়ে ইয়ুনিয়ন আপিসে গেল নজর আলি। প্রেসিডেন্টের ভাষণ থেকে বাছা বাছা কথা উল্লেখ করে নিবেদন করে রামভরোসার আর ইলিয়াস খাঁর অত্যাচারের কথা। বালবাচ্চা তার ভুখা থাকে। পসীনা জল করা টাকার ওপর এ অন্যায় হামলার প্রতিবিধান করতেই হবে সেক্রেটারী সাহেবকে।

ধৈর্য ধরে সব কথা শুনলো হাকিম মিঞা। আশা দিল প্রতিকারের। কিন্তু তার আগে গত দু' বছরের ইয়ুনিয়নের বকেয়া চাঁদা মিটিয়ে দিতে হবে।

কম্পিত হাতে পকেট থেকে শেষ দশ টাকার নোটটি বার করে দেয় নজর আলি। ফেরৎ পায় তিন টাকা ছ' আনা।

চোদ্দদিনের সংসার চলা চাই এই টাকায়।

দেড় সের ওজন কমে গেল নজর আলি, তার বিবি আর বাচ্চা-দের ভয়ংকর এই চোদ্দদিনে।

খুসখুসে কাশি আর ঘুষঘুষে জ্বর দেখা দিল আতর বিবির।

পরের হপ্তাতেও আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। "কম্‌প্লেন কৈল হো?" চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করে রামভরোসা আর ইলিয়াস খাঁ। নজর আলির প্রতিবাদের তীক্ষ্ণ সুরের পরিসমাপ্তি ঘটে শারীরিক যন্ত্রণার কাতরোক্তিতে।

তার পরের হপ্তা। তারও পরের হপ্তা। পৃথিবীর আদিম নিয়মের সামান্যতম ব্যতিক্রমও ঘটে না।

অথচ ফুরোয় না হাকিম মিঞার নিরন্তর আশ্বাসবাণী ও প্রতি-কারের প্রতিশ্রুতি।

মিটিমিটি হাসে শুধু টুনু সেন। রামভরোসার কুস্তী লড়া শরীরের দিকে তাকায়। ঘাড়ে গর্দানে মহিষের মতো লোকটাকে ঘাঁটাবে কে?

মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে হাকিম আলি। চাঁদা দিয়ে ইয়ুনিয়নের ভিৎ শক্ত করবার উপদেশ দেয় সে।

আতর জানের কাশি আর জ্বর বেড়েই চলে। কাশতে কাশতে

মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে।

পনেরো মাইল বেগে গাড়ি চালাবার নিয়ম বাঁধা রাস্তায় পঞ্চাশ মাইল বেগে বোঝাই ট্রাক চালায় সর্দার হুকুম সিং। তারই ধাক্কায় ছিটকে পরা নজর আলির মেজো ছেলে খোঁড়া হয়ে যায় চিরদিনের জন্য।

মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক কনষ্টেবল গোঁপে চাড়া দেয়। হুকুম সিং-এর তেল লাগা ময়লা পাঁচ টাকার নোট তার পকেটে চলে যায়। পুরোনো খদ্দের তার হুকুম সিং। নজর আলির ছেলের পায়ের জন্য কোনো মাথা ব্যথা নেই তার।

দিশেহারা হয়ে যায় নজর আলি। কোনোদিকে দেখতে পায় না সামান্য আশা আশ্বাসের আলোক-ইসারা।

আবার জমে মাস-মিটিং। ট্রেড্ ইয়ুনিয়নের বিখ্যাত এক নেতা আসেন বক্তৃতা দিতে। প্রেসিডেণ্টের সংগে অনেক দিনের দোস্তি তাঁর।

প্রেসিডেণ্টের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সততা আর সরলতা, মানব-প্রেম আর আদর্শবাদ প্রভৃতি বিরল গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। চঞ্চল হয়ে ওঠে শ্রোতৃবৃন্দ। সত্যি, তাদের প্রেসিডেণ্টের মতো এতবড়ো নেতা ক'জন আছে দেশে! শ্রদ্ধায় বিগলিত হয় সবমজদুর-চিত্ত। মনের কোণায় ধূমায়িত ক্ষোভ আর হতাশা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

> "আরাম হারাম হ্যায়—
> প্রোডাকশান বাঢ়াইয়ে—
> দেশমাতাকি সেওয়া কীজিয়ে—"

লাউড স্পীকারের কৃপায় বহু দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ।

"ঝুট্ বাৎ, সব ঝুট্ হ্যায়—" পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে নজর আলি। দু' হাত মাথার ওপর তুলে লাফিয়ে ওঠে সে। সভাপতির কথার খেই হারিয়ে যায়। জ্বলন্ত সত্যের চোখ ধাঁধানো দীপ্তি ক্ষণ-কালের জন্য বাকরুদ্ধ করে দেয় তাঁকে। কঠিন দৃষ্টিতে তাকান বহু দূরের ছেঁড়া জামা আর নোংরা পাৎলুন পরা লোকটির দিকে। কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে নজর আলি।

রামভরোসা আর ইলিয়াস খাঁর দল লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে নজর আলির ওপরে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো। অস্পষ্ট কাতরোক্তি করে মাটিতে পড়ে যায় নজর আলি। পৃথিবীর সকল অত্যাচার আর অবিচারের বোধ ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসে তার আচ্ছন্ন চেতনায়।

"কৌন হ্যায় ও—?" প্রশ্ন করেন সভাপতি।

"পাগলা হ্যায় হুজুর—" হাত কচলে উত্তর দেয় হাকিম মিঞা।

উদাত্ত গম্ভীরে বক্তৃতা শুরু হয় আবার:

"ভাইয়োঁ, ইস্ মজদুররাজমে কোই কিসি সে ছোটা নেহি, সবকা অধিকার বরাবর হ্যায়........."

× ধূসর গোধূলি
×
×
×
×
×
×
×
×
×

"আমি পারবনা, পারব না, পারব না। এই আমার শেষ কথা—" তীক্ষ্ণ স্বরে বলে প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে বিমলা। আগুনের শিখার মত টক্‌টকে লাল মুখ, চোখ দুটোর মধ্যে যেন হীরকের তীব্র দ্যুতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

গুম্ হয়ে নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে ছিল সুগত। দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁট কামড়াতে থাকে সে। ছাঁটা গোঁফে টান লাগার মৃদু বেদনাটুকু অনুভবও করতে পারে না।

কলকারখানা প্রধান এই অঞ্চলে ওরা এসেছে অল্প দিন। ঢালাই লোহার এই বিরাট ফ্যাক্টরীতে টাইপিষ্ট-এর কাজ পেয়েছে সুগত। মাইনে যা পায়—বাড়ী ভাড়া, জল আর চাল, ডাল, তেল, মসলাতেই কাবার। মাসের শেষে চিরকালের টানাটানিটা থেকেই যায়। তবু বাঁচোয়া যে, ছেলেপুলে হয় নি এখনও।

এ কারখানার উঁচুদরের চাকুরেদের নাকটা একটু বেশী রকমে উঁচু। ভালো মাইনে, ভালো কোম্পানীর বাড়ী আর নিজেদের উঁচু পদমর্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন তারা। কারখানার বাইরে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাই বলেন না—অভ্রভেদী মর্যাদাটা

ধূল্যবলুণ্ঠিত হবার আশঙ্কায়। তাঁদের ক্লাব আলাদা, পাড়া আলাদা ছেলেমেয়েদের স্কুলও আলাদা।

এখানে এসে হাঁপিয়ে উঠেছে বিমলা। কৃত্রিমতা ভরা এখানকার জীবনযাত্রার চাপে দম আটকে আসে তার। কলকাতার উদার আবহাওয়ায় বড় হয়েছে সে। স্কুল-কলেজে কত বড়লোকের মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে পড়েছে। মিশেছে ধনবৈভবে প্রচণ্ড-নামাদের ছেলে মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু এখানে এসে অবধি দেখেছে অফিসার গিন্নীদের বাঁকা দৃষ্টি আর বাঁকা সানুনাসিক কথা। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায় তার।

তাই বাড়ী থেকে বেরয় না বড় একটা। মেশে না কারুর সঙ্গে।

স্কটিশ চার্চ থেকে বি. এ. পাশ করেছে বিমলা। এখানকার বহু অফিসার গিন্নীর চেয়ে শিক্ষা আর সংস্কৃতিতে উঁচু সে আর অমার্জনীয় এই অপরাধের জন্যই বুঝি তাঁদের সমবেত ঈর্ষার তাপ তার দিকেই বইতে থাকে।

বাপ মার পঞ্চম মেয়ে, তাই গ্র্যাজুয়েট টাইপিষ্ট-এর চেয়ে বড় কিছু জুটল না তার কপালে। তবু অখুশী নয় বিমলা। স্বামী সুগতর হৃদয়ের ঐশ্বর্য অফুরান।

কিন্তু এই নিষ্কাশনপুরে মন টেঁকে না কিছুতেই।

বিপর্যয়টি ঘটে গেল স্বল্পতোয়া বরাকর নদীর বালুময় তীর দিয়ে বেড়াবার সময়ে।

সূর্য-ডোবা অন্ধকারে মুমূর্ষুর দেহে ক্ষীণ প্রাণস্পন্দনের মত তির তির করে বয়ে চলেছে বরাকরের জল। দূর দক্ষিণে—পঞ্চকোটের

বিরাট পাহাড় সেদিককার আকাশকে সম্পূর্ণ আবৃত করে মহাকায় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর ক্ষীণ শরীর বরাকর নদী বন্দিনী সুন্দরীর মত লুটিয়ে পড়েছে তার পদপ্রান্তে। অন্য দিকে মাইথন বাঁধের বিদ্যুৎ-বাতির মালা। অদূরের কলিয়ারীর চিম্‌নীটা সারাদিন ধরে ধূম উদ্গীরণ করে করে যেন ক্লান্ত হয়ে করুণ চোখে আসন্ন রাত্রির নিঃশব্দ আগমন লক্ষ্য করছে। অল্প একটু পরেই সবার চোখেই নামবে ঘুম, কিন্তু ঘুমুবার উপায় নেই তার। সারারাত ধরে কলিয়ারীর ফুসফুস থেকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস টেনে টেনে ছড়িয়ে দিতে হবে বাইরের স্থির নিষ্কলঙ্ক নৈশ বাতাসের গায়ে।

সুগত আর বিমলা আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছিল নরম ভিজে বালির ওপর দিয়ে। এখানে ওখানে গ্রাম-বধূদের বালি খুঁড়ে জল নেবার অজস্র চিহ্ন ছড়িয়ে আছে।

বিপরীত দিক থেকে আসছিল একটি সাহেবী পোষাক-পরা লোক। পাশে পাশে চেনে বাঁধা একটি প্রকাণ্ড এ্যাল্‌সেশিয়ান। কাছাকাছি হতেই তাকে চিনতে পারল সুগত। ওয়ার্কস্‌ ম্যানেজারের পার্শ্ব-সচিব মিষ্টার এন্‌. এল্‌. বরাট। তার বিনীত নমস্কারটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই পেরিয়ে যাচ্ছিলেন বরাট সাহেব, হঠাৎ বাঁকা চোখটা বিমলার পাণ্ডুর মুখে আটকে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়লেন বরাট সাহেব, মুহূর্তের দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলে বলে উঠলেন—"এক্সকিউজ মি, আমার মনে হচ্ছে আপনাকে কোথাও যেন দেখেছি আমি—"

থেমে গেল সুগত আর সঙ্গে সঙ্গে বিমলা। মুখোমুখি দাঁড়ালো

ওরা। নদীর ওপারে চিরকুণ্ডায় আলোর মালা জ্বলে উঠেছে, তারই ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল পরিচয়ের দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে বরাট সাহেবের চোখ। পলকের জন্য যেন মিথ্যা অভিজাত্যের মুখোশ খসে পড়ল, মসৃণ মধুক্ষরা সুরে বলে উঠলেন তিনি—"আরে, এ যে দেখছি বিমলা, তুমি এখানে?"

তারপর সুগতর পরম আপ্যায়িত মুখের দিকে চোখ পড়ামাত্র ঘাড় নেড়ে বললেন—"I see. বুঝেছি।"

অস্পষ্ট গলায় বিমলা কি যেন বলল বোঝা গেল না, কিন্তু সুগতর বিগলিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ অন্ধকারের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়ল চার পাশে—

"ইনি আমার স্ত্রী বিমলা স্যার।"

"So I guess—" সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ওদের দু'জনার দিকে তাকালেন বরাট সাহেব। বিমলার শরীর থেকে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ শক্তি বেরিয়ে যেন বেঁধে ফেলেছে তাঁর পা দুটো, চলে যেতে চাইলেও যেতে পারছেন না।

অনেক দিন আগের স্মৃতির দাগ কাটা মনের রেকর্ড যেন কথা কয়ে উঠল। সাত বছর আগের আবেগচঞ্চল দিনগুলি মনে পড়ল।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র তখন তিনি। নীরস পাঠ্য বইয়ের পাতা থেকে সহপাঠিনীদের সরস সজীব আকর্ষণই ছিল অনেক বেশী প্রবল। আবার অনেক মুখের প্রদর্শনীর মাঝে বিশেষ একটি মুখই মুগ্ধ করেছিল তাঁকে—সে মুখখানা বিমলার। আজকের এই গম্ভীর স্থৈর্যে বালুচরের ওপর দাঁড়ান বিমলার সঙ্গে

সে মুখের মিল থেকে অমিলই যেন বেশী। প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর সেই শ্যামাঙ্গী মেয়েটি তাঁর এবং আরও অনেক যুবক-চিত্তই প্রলুব্ধ করেছিল তখন। কলেজের কমনরুমে যাবার পথে অথবা কলেজের সামাজিক অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে আলাপ করার চেষ্টা করেছেন অনেকবার। কিন্তু কেমন যেন নীরব ঔদাসীন্যের বর্মে ঠেকে ভেঙে যেত তাঁর সকল চেষ্টা। তার কারণ অবিষ্কার করতেও বেশী সময় লাগেনি তাঁর। সায়েন্স ষ্টুডেন্ট অমিয় রায়ের সঙ্গেই যেন বেশী মাখামাখি বিমলার। তার সঙ্গে বিমলাকে দু' চারদিন সিনেমা বা রেষ্টুরেন্টেও দেখতে পেলেন তিনি। কি একটা উন্মাদনায় ভরপুর হয়ে নিজের পড়ার বা কাজের বহু ক্ষতি করেও অলক্ষ্যে ওদের দুজনকে অনুসরণ করেছেন সেদিনের ঈর্ষাকাতর নন্দলাল। তাঁর গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতাকে যতই এড়াতে চায় বিমলা ততই তাকে পাবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন।

প্রথম যৌবনের উষ্ণ তাজা রক্ত টগবগিয়ে ফুটতো শুধু অনুরাগে নয় রাগেও।

তারপর এলো সেদিন, যেদিন জয়হিন্দ রেষ্টুরেন্টের একটি নিভৃত কেবিনে বসে অমিয়র জন্য অপেক্ষা করছিল বিমলা। প্রসাধনের সামান্য হেরফেরে রক্তে যেন আগুন জ্বালছিল সে।

চুপি চুপি চোরের মত পা টিপে টিপে কাটা কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দেন নন্দলাল। জনপূর্ণ রেষ্টুরেন্টে কেউ লক্ষ্য করল না তাঁকে।

চুপ করে কনুই দুটি টেবিলে ঠেকিয়ে দু'হাতের তালুর বাটিতে থুৎনী ডুবিয়ে ভূমিলগ্ন চোখে বসে আছে বিমলা। অশোক বনের

সীতার ছবির মতো বিমলার মুখখানা দেখে বুকের ভেতরটা হু হু করতে থাকে তাঁর। চক্ষের পলকে প্রলয় ঘটে গেল, কি করছেন কি আর বলছেন হুঁশ রইল না তাঁর।

হুঁশ হ'ল তখন যখন বিমলার ডান হাতের চারটি আঙ্গুলই তাঁর বাঁ গালে রক্তাভ স্পষ্টতা নিয়ে ফুটে উঠল। সুমুখের ভয়ঙ্করী মূর্তিই কি বিমলা? লেলিহান অগ্নির আভা তাঁর সারা মুখে পরিব্যাপ্ত, বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে দুই চোখ দিয়ে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরছে বারে বারে। মাথার চুলগুলোও যেমন ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তেমনি ফুলে ফুলে উঠছে ওর বুক।

তার পর হৈ হৈ, চীৎকার, অনেক লোকের ভিড় আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। এরই মাঝে কোথা থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে অমিয়। থর থর কাঁপা অপমানের বিষে জর্জর বিমলাকে নিয়ে চলে যায় তার সবল ব্যক্তিত্বের জোরে।

সেদিনকার ছায়াছবির মতো দৃশ্যের সবগুলি মনেও পড়ে না বরাট সাহেবের।

আবার বদলায় দৃশ্যপট। বি. এ. পাস করে বাপের পয়সায় বিলেতে চলে যান বরাট সাহেব। সেখান থেকে রপ্ত হয়ে আসেন সাহেবিয়ানায়। মুরুব্বির জোরে আর নিজের চেষ্টায় আজ তিনি এই নিষ্কাশনপুরের ঢালাই লোহার কারখানার একজন হোমরা-চোমরা অফিসার।

কার কাছে যেন শুনেছিলেন ছেচল্লিশের দাঙ্গায় খুন হয়েছে রিসার্চ স্কলার অমিয় রায়।

সূর্যাস্তের পর যে তরল স্বচ্ছতাটুকু আকাশের বুক থেকে

পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তা মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকারের ঘন কালো আস্তরণ ক্রমে ক্রমে ঢেকে দিচ্ছে চারদিক। মিলিয়ে গেছে ধূম উদগীরণরত কালো চিমনীটা, মিলিয়ে গেছে আকাশের পটে আঁকা পঞ্চকোট পাহাড়ের বিশাল দেহ।

কিন্তু বহু পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি মিলিয়ে যাওয়া দূরে থাক, ক্রমেই যেন ভাস্বর হয়ে জ্বল জ্বল করে উঠছে মিষ্টার বরাটের মনে। সেদিনের সেই প্রত্যাখ্যান আর অপমানের বেদনার তীব্রতা আর অগ্নিজ্বালা যেন নতুন ভাবে অনুভব করতে লাগলেন তিনি।

নিজের অজান্তেই এক পা এগিয়ে গেলেন বিমলার দিকে। শিউরে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল বিমলা। অন্ধকারে তার মুখখানি দেখা না গেলেও স্পষ্ট অনুভব করলেন বরাট সাহেব সে মুখখানি যেন ছাই ছাই হয়ে গেল।

প্রথম যৌবনের পরিণামহীন আবেগ বিহ্বলতা আর নেই। কঠোর সংযম আপনা থেকেই বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনে বরাট সাহেবকে।

সুমুখে দাঁড়িয়ে একজন অতি নগণ্য কর্মচারীর স্ত্রী—যে কর্মচারীকে ইচ্ছে করলে নিমেষের মধ্যে একটা পিঁপড়ের মতো আঙ্গুলে পিষে মারতে পারেন তিনি।

একটা বিচিত্র হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে।

আর একটিও কথা না বলে চট করে ঘুরে গিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান বরাট সাহেব। দামী সিগারেটের গন্ধ ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসে।

এতক্ষণে যেন জীবন ফিরে পায় সুগত। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে—"বরাট সাহেবকে তুমি চিনতে নাকি বিমল? কই এ্যাদ্দিন

এখানে এসেছি, এ কথাটা বল নি তো কোনোদিন!"

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল বিমলা। ক্লান্ত সুরে বলল, "চল বাড়ী ফিরি এবার, রাত হয়ে গেল অনেক।"

নিঃশব্দ গতি বরাকরের স্তব্ধ বাতাসে তার কণ্ঠের কাঁপা করুণ সুরটি মিলিয়ে যায় নিঃসীম অন্ধকারে।

"বরাৎ খুলে যাবে আমার, বুঝলে বিমলা," অদূরবর্তী জি. টি. রোডের দিকে এগুতে এগুতে দ্রুত ছন্দে বলতে থাকে সুগত, "বরাট সাহেবের নজরে পড়লে আর কিছু না হোক অফিস এ্যাসিস্ট্যাণ্টের পোষ্টটা তো একেবারে বাঁধা। হুঁ, হুঁ, চারশো টাকার গ্রেড—"

এর পর দুই-তিন দিন গুম হয়ে রইল বিমলা। সুগতর বারম্বার আগ্রহব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকুই বলল যে, কলেজে এক সঙ্গে পড়েছে নন্দলাল বরাটের সঙ্গে।

আর এটুকু সম্বল করেই আকাশে তাসের প্রাসাদ তৈরি করতে থাকে সুগত। এক একখানা তাস বসায় আর বিমলাকে ডেকে এনে দেখায়, বোঝায় তার গঠননৈপুণ্য, তার সুন্দর ভাস্কর্য।

কিন্তু কিছুই বলে না বিমলা। মুখখানা শুধু ম্লান হয়ে আসে তার।

সাত দিন মাত্র। আট দিনের দিন চীফের ঘরে ডাক পড়ল সুগতর। রাগে অগ্নিবর্ণ চীফ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে গুড় গুড় করে উঠলো তার বুক। ছুঁচলো পেন্সিলের মাথা দিয়ে সুগতর সদ্য টাইপ করা কাগজটার এক অংশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে চীৎকার করে উঠলেন তিনি, "What's this bloody nonsense!"

অপমানে চোখে জল এসে যায় সুগতর, তবু প্রাণপণে আত্ম-

সংবরণ করে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা দেখে সে। সামান্য ভুল, যা টাইপিষ্ট মাত্রই করে। এর জন্যই সানকিতে বজ্রাঘাত!

বিমূঢ়ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এক মিনিট।

খাঁটি স্কচম্যান তার চীফ। সিগারের প্রান্ত কামড়াতে কামড়াতে স্থগতর অপাদমস্তক লক্ষ্য করছিলেন তিনি। এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন, "Get out, get out you idiot. Any more of such mistakes and you will get a sack."

স্বপ্নের ঘোরে নিজের চেয়ারে এসে বসে স্থগত। অন্য কেরাণীরা আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফিস্‌-ফিসানি জুড়ে দেয় নিজেদের মধ্যে। অনেকেই খুশী হয়েছে স্থগতর এই অপমানে— অনেক ম্যাট্রিক-ফেল করা কেরাণীরা, যারা স্থগতর গ্র্যাজুয়েট হওয়াটাকে একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করে।

বিপর্যস্ত মনটাকে সামলে গুছিয়ে নিতে অনেকটা সময় যায় স্থগতর। টাইপরাইটার মেশিনটা স্থমুখে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে। ভেবেই পায় না তাদের প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড সহসা এত গরম হয়ে উঠলেন কেন। এ ভুলটা তো অতি সাধারণ, ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

এর পর যত দিন যেতে থাকে ততই এ কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, স্থগতর ধর্তব্যের মধ্যে না থাকা ভুলগুলো ধরবার জন্যই ম্যাক্‌ডো-নাল্ড যেন হঠাৎ সহস্র-চক্ষু হয়ে গেছেন। স্থগতর সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য দিনগুলোই মনে মনে অপছন্দ করেন বরং।

টাইপিষ্ট-এর পোষ্টটা অদূর ভবিষ্যতেই খালি হবে এই আশায় আশায় কয়েকজন অত্যুৎসাহী সামান্য টাইপ-জানা ছোকরা কেরাণীরা

দরখাস্ত করে বসল ঐ পোষ্টের জন্য। খেজুর রং-এর গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসলেন ম্যাক্‌ডোনাল্ড সে সব দরখাস্ত পেয়ে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের উগ্র সুরা সেবন করতে করতে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন তিনি। স্বাধীন ভারতের হীনবীর্য নাগরিকদের গালি-গালাজ করে আর সাজা দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রতিশোধ-স্পৃহার চরিতার্থতা খোঁজেন তিনি।

কথাটা কিন্তু গোপনে রইল না বেশী দিন। সুগতর শুভানুধ্যায়ীরা আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, চাঁদের যেমন নিজস্ব আলো নেই, তেমনি ম্যাক্‌ডোনাল্ডের এই হাঁক-ডাক, তর্জন-গর্জন সব কিছুই আসলে আসছে—মিষ্টার বরাটের কাছ থেকে।

এই আকস্মিক বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে মিষ্টার বরাটের কথা ভুলেই গিয়েছিল সুগত। এবারে মনে পড়ল সেই প্রদোষ অন্ধকারে তাদের সাক্ষাতের কথা।

অদৃষ্টের পরিহাসে অমৃত গরলে পরিণত হয়েছে।

পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে বরাট সাহেবের বাংলোয় না যাবার এই ফল।

তাই বিমলার কাছে বরাট সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করে সুগত। যদি কোনো কারণে ক্ষুব্ধও হয়ে থাকেন তবে তার কারণটাও জানা যেতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য, একেবারে বেঁকে বসে বিমলা। শক্ত আরক্ত মুখে সুগতর সব অনুনয় আর যুক্তি শোনে সে, কিন্তু ঐ ছোট্ট 'না' শব্দটি ছাড়া আর কোনো কথা বেরয় না ওর মুখ থেকে।

অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে সুগত। এর মধ্যে দোষাবহ কিছু

দেখতে পায় না সে। বিমলার মতো শিক্ষিতা নারীও যে কেন এ রকম অবুঝপনা করে! শেষটায় তিক্ত কণ্ঠে বলে, "তা হ'লে কাজে জবাব হয়ে যাক আমার—তোমারও বোধ হয় এই-ই ইচ্ছে?"

"জবাব হবে কেন? কাজ ছেড়ে দাও তুমি—" এতক্ষণ পরে শান্তসুরে বলে বিমলা, "তুমি পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেছ, অন্য একটা কাজ যোগাড় করে নিতে পারবে না?"

চটে ওঠে সুগত, বলে, "বলাটা খুবই সহজ, চট করে কাজ পাওয়াটা মুখের কথা নয়। তা ছাড়া এতদিন এখানে কাজ করে সিনিয়ার হয়েছি আমি, আর একটা লিফ্‌ট পাওনা হবে দু' মাস পরে, ক'বছর পরে পাওনা হবে গ্র্যাচুইটি। নতুন জায়গায় তো সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে শুরু করতে হবে আবার!" ভাবতেও শিউরে ওঠে সুগত। প্রাক্-চাকরিজীবনের বেকারত্বের ছবিটা জ্বল জ্বল করে ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। দরজায় দরজায় ধরণা দেবার দুঃস্বপ্নের মতো রুক্ষ কঠিন দিনগুলির কথা মনে পড়ে।

"কেন মিছে ভাবছ?" পাশে বসে সুগতর বিরাগভরা মুখখানা দু' হাতে ধরে নিজের দিকে ফেরায় বিমলা, বলে, "আমিও তো আছি, একটা স্কুল মিষ্ট্রেসের কাজ পাওয়াটা বোধ হয় কঠিন হবে না।"

বিমলার স্পর্শ আর কোমল সুরের ছোঁয়ায় শীতল হয়ে আসে সুগতর তপ্ত মন। নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "বি. টি. না হলে স্কুল-মিষ্ট্রেস হওয়াও কঠিন আজকাল।"

"বি. টি.-টা না হয় দিয়েই দেব বাবার ওখান থেকে"—অল্প হেসে উঠে দাঁড়ায় বিমলা, বলে, "চল, খেতে দি তোমাকে। রাত বড়ো

কম হয় নি। ঘুম পেয়েছে আমার।"

কিন্তু খাবার পর বিছানায় শুয়ে ঘুম পাবার কোনো লক্ষণই দেখায় না বিমলা। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে নতুন চাকরি পাবার পরিকল্পনা করে দু'জনে।

কিন্তু তপ্ত নিশায়, প্রেয়সীর সঙ্গ-সুখের নেশা-ঢুলুঢুলু মনের সব কল্পনাই দিনের রূঢ় কঠিন আলোকের ঘায়ে ভেঙে মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে। চাকরি ছাড়ার পথে দেখা দেয় বহু দুস্তর আর দুরতিক্রম বাধা।

ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নির্যাতন অব্যাহত থাকে।

তীব্র অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে এক-একদিন আপিস থেকে বাড়ী ফিরে বিমলাকে শক্ত শক্ত কথা শোনায় সুগত। কখনো অনুনয়ের, কখনো বা বিনয়ের সুরে লুব্ধ করতে চায় তাকে, বলে, "অচেনা তো আর নন, এক সঙ্গে পড়েছ কলেজে, একটিবার গেলেই যদি কাজ হয় তবে তোমার এই না-যাবার অহেতুক জেদের মানে তো আমি বুঝি না বিমলা। চলো, আজ যেতেই হবে তোমাকে।

"না, না, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, জোর কোরো না তুমি"— আর্তস্বরে বলে ওঠে বিমলা, দু' হাতে মুখ ঢাকে। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে কাঁপতে থাকে ওর পিঠ, আর সে দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় সুগত। দু' হাতে জোর করে তুলে ধরে বিমলার অশ্রু-কলঙ্কিত মুখ। কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে দেয় তার চোখের জল, তার পর গভীর প্রেমে চুম্বন এঁকে দেয় তার থর্‌থর্‌-কাঁপা ঠোঁটে।

অবস্থা চরমে উঠলো। কাজে ক্রমাগত অন্যমনস্কতার জন্য একদিন চার্জসীট পেল সুগত।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে টাইপ-করা কাগজটা বিমলার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে গভীর ঘৃণায় বলল, "এই নাও তোমার অসঙ্গত জেদের পুরস্কার। মনস্কামনা পূর্ণ হল বোধ করি—"

কাগজখানা তুলে নিয়ে তার ওপরে চোখ বুলালো বিমলা। মুখখানা প্রথমে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তার পরে হঠাৎ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে টক্‌টকে লাল হয়ে গেল।

চার্জসীটের নীচে সহি করেছেন মিষ্টার এন্. এল. বরাট। আঁকা-বাঁকা সেই সহিটার দিকে তাকিয়ে বিমলার চক্ষু দু'টি শান-দেওয়া ছুরির মতো ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো। সারা মুখে নেমে এলো একটা অবিচল সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। একটা ক্রুর প্রতিহিংসার ছায়া যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

নন্দলালের অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই বিমলাকে হারাতে হয়েছে প্রথম যৌবনের প্রেমাস্পদকে। তারই অকারণ শত্রুতার জন্য বিমলাকে হারাতে হবে স্বামী আর সংসার। পাকে পাকে নাগ-পাশের মত বেঁধে ফেলতে চায় তাকে নন্দলাল।

কিন্তু কেন? কিসের এত দর্প তার? কিসের এই তেজ? কোন্ প্রলোভনে এতো নীচে নেমে যাচ্ছে এই নন্দলাল বরাট?

মাথার ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে বিমলার।

দীর্ঘ দিন পরে প্রসাধনে বসলো বিমলা। রক্তলাল-শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে গায়ে দিল ঘোর রঙের কটকী কাজ করা ব্লাউজ। পায়ে গলালো বাটার লাল জুতো। অল্প রুজের ছোঁয়ায় গাল দুটি থেকে রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। কবরী বন্ধ খুলে পিঠে ছড়িয়ে দিল

কৃষ্ণ সর্পিল বেণী। তার পর হতোদ্যম সুগতর কাছে এসে বলল—
"নাও চল—"

অগ্নিস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল সুগত, বলল, "যাবে?"

কালবিলম্ব না করে ফর্সা ধুতী-পাঞ্জাবী পরে বিমলার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে পথে।

পশ্চিম-আকাশে মেঘের গা থেকে সন্ধ্যার শেষ সিন্দূরটুকু অবলুপ্ত হয় নি তখনও। বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকল বিমলা আর সুগত। বারান্দার খুঁটিতে চেনে বাঁধা এ্যালসেশিয়ানটা গর্জন করে ওঠে। সে চীৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বরাট সাহেব। বাগানের দিকে চোখ পড়তেই দ্রুতপদে এগিয়ে আসেন।

"আঃ, কি সৌভাগ্য আমার—রাণী এসেছেন দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে—" নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে বিভক্ত ওষ্ঠাধরে বলে ওঠেন তিনি।

কথাটা গায়ে না মেখে স্মিত সুন্দর হাসল বিমলা। মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলো ঝক ঝক করে উঠল, বলল—"চল, চল ঘরে চল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর রসিকতা করতে হবে না।"

মুখ থেকে আধ-পোড়া সিগারেটটা বারান্দার ফুলের টবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বরাট সাহেব। ব্যস্ত পায়ে এগোতে এগোতে বললেন—"এস, এস—আসুন—কি নাম আপনার? ওঃ সুগত, হ্যাঁ, সুগতবাবু—"

বারান্দায় উঠল তিন জন। তিনটি বেতের চেয়ার নিয়ে কাছা-কাছি বসল তারা। প্রভুকে দেখে এ্যালসেশিয়ানটা বসে বসে চোখ পিট পিট করে।

"কাউকে দেখছি না যে—তোমার স্ত্রী কোথায়?" একটু ঝুঁকে

বসে বলল বিমলা—

"স্ত্রী! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—" হাসি আর থামে না বরাট সাহেবের—"কোনো খবরই রাখ না আমার তুমি। বিয়ে আর করলাম কবে? একটি বাবুর্চি আর একটি চাকর এই নিয়ে আমার সংসার। ওরা গেছে আবার সিনেমায়। একটু যে চা করে খাওয়াব—"

অন্য দিকে তাকিয়ে ক্ষণকালের জন্য বিমনা হয়ে গিয়ে ছিল বিমলা। চায়ের কথা শুনে চোখ তুলে তাকাল বরাটের মুখের দিকে। আধো অন্ধকারে ত্নটি রাক্ষসী-লুব্ধদৃষ্টি তার জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে।

চমকে উঠল না বিমলা। এটুকু দেখবার অপেক্ষাতেই যেন ছিল সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু ভাবে বলল—"চা-টা না হয় আমিই করে খাওয়াচ্ছি। চল, রান্নাঘরটা কোন দিকে দেখাবে চল—"

চট করে উঠে দাঁড়ালেন বরাট। আকাঙ্ক্ষিত অভিপ্রায় যে এত সহজে হাতের মুঠায় এসে পড়বে এ তিনি কল্পনাও করেন নি।

"সুগতবাবু, একটু বসুন তাহলে—এই ফিল্ম ফেয়ারটা দেখুন ততক্ষণ—" পাশের বেতের টেবিলে রাখা পত্রিকাটি উড়ন্ত পাখীর মত ঝপ করে সুগতর কোলে এসে পড়ল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বস তুমি—চা নিয়ে আসছি আমি" বলে কেমন যেন অস্থির পায়ে বরাটের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে গেল বিমলা। ঝুলন্ত পর্দাটা বার কয়েক আন্দোলিত হয়ে থেমে এল।

একা একা চুপ করে বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে পায়ে

ঝিঁঝিঁ ধরে গেল সুগতর। কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল বিমলার ব্যবহার। এ যেন অন্য জগতের বিমলা, তার চেনা-জানা বিমলার স্বল্পাবশিষ্টও যেন এর মধ্যে নেই! আর এতক্ষণ ধরে ঘরের ভেতর ওরা করছেই বা কি। চা করতে ত এত দেরী হবার কথা নয়।

কোম্পানীর এই বাংলোটি শহরের শেষপ্রান্তে। কাছাকাছি না আছে অন্য কোন বাংলো, না আছে অন্য কারও বাড়ী ঘর। দু'ধারের ধানক্ষেত চিরে বঙ্কুর জি. টি. রোড পূর্ব-পশ্চিমে নিজের অজগর দেহ বিছিয়ে দিয়েছে। অনেক পরে পরে দু'একটা ট্রাক বা কার ছাড়া সে পথও জনহীন।

উঠি উঠি করে সুগত। ভেতরে যাবার মতলব ভাঁজে মনে মনে। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। রাত্রির অন্ধকারে চারদিক লেপামোছা। কাছেই বাগানের গাছের পাতাগুলো দেখা যাচ্ছে না। স্তব্ধ নিঝুম চার দিক।

এমন সময়ে সেই স্তব্ধ বাতাসের বুক চিরে একটা মৃত্যু শীতল আর্তনাদ শুনে হিম হয়ে যায় সুগতর সর্বশরীর। পরমুহূর্তেই এক লাফে দৌড়ে চলে গেল ভেতরে। একটা দরজার কাছে বিপরীত দিক থেকে ছুটে-আসা বিমলার সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার। দু'জনেই ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর।

দরজার ওপাশে নজর যেতেই হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল সুগতর।

মসৃণ মেঝের ওপর পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছেন বরাট সাহেব। এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত কাটা মস্ত হাঁয়ের মুখ দিয়ে রক্তস্রোত নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে সব।

দিশেহারা হ'ল না সুগত। এগিয়ে গিয়ে মূর্চ্ছিতা বিমলার হাত থেকে তীক্ষ্ণধার রক্তাক্ত ক্ষুরটা খুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এক দৌড়ে কোণ থেকে একটা কুঁজো এনে গব গব শব্দে জল ঢেলে ধুয়ে দিল বিমলার রক্ত-মাখা হাত।

তার পর গভীর অনুরাগে বিমলার অচেতন দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৃঢ়পদে বেরিয়ে পড়ল জনমানবহীন পথে।

এ্যালসেশিয়ানটা শুধু কি মনে করে করুণ সুরে ককিয়ে উঠল একবার।

× ক্ষণ-বসন্ত
×
×
×
×
×
×
×
×
×

পড়ার টেবিলে ব'সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি একটা বই পড়ছিল সরোজ, কখন যে মা ঘরে ঢুকে ওর পাশে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছেন টেরই পায় নি। কাঁধের কাছে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল, বলল, "কি বলছ মা?"

পড়ায় বাধা দেবার জন্য মনে যে সঙ্কোচটুকু জমেছিল তা কাটিয়ে মৃদু কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বললেন, "বেলা ত পড়ে এল, এখন না গেলে যে অনেক রাত হয়ে যাবে সরোজ—"

মা-র কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য বিমনা হয়ে রইল সরোজ, খোলা কলমটা দিয়ে সামনের সাদা কাগজের ওপর নানান আঁকিবুকি করতে করতে বলল, "আর কাউকে পাঠাও না মা—"

"শোন ছেলের কথা—" সস্নেহে হেসে হেমাঙ্গিনী বললেন, "আর এ বাড়ীতে কে আছে যে যাবে? উনি ত একটু পরে কোর্ট থেকে ফিরেই এলিয়ে পড়বেন, শঙ্কর আজ সিনেমায় যাবে বলে রেখেছে, ওর টিকিটও নাকি কেনা হয়ে গেছে, বাকী আছিস শুধু তুই—"

"আর সে জন্যই বুঝি তোমার যত কিছু কাজের বোঝা আমার

ঘাড়ে চাপাতে চাও, না? সে হবে না মা,—আমার পড়া আছে—" অসহিষ্ণু স্বরে সরোজ বলে।

ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় হেমাঙ্গিনী বলে ওঠেন, "সে কি রে। এখন না করলে চলবে কেন? খবর পাঠান হয়েছে, ব্যবস্থা-ট্যবস্থা সব ঠিকঠাক,—এখন না গেলে ওরা কি ভাববে বল্‌ দেখি? নে বাবা, আর অমত করিস নে,—যাই আমি তোর জামা-কাপড় সব বার ক'রে দিই গে—"

সরোজকে আর আপত্তি করবার অবকাশ না দিয়ে দ্রুতপদে হেমাঙ্গিনী চলে যান পাশের ঘরে, আলমারিতে চাবি ঘোরানোর শব্দ ওঠে, পাল্লা দুটো মৃদু শব্দ ক'রে খুলে যায়, ধপ্‌ ক'রে একরাশ কাপড়-জামা মেঝেতে পড়ে যায়, সে শব্দও সরোজের কানে আসে।

গোঁজ হয়ে বসে থাকে সরোজ। অনিচ্ছা তার যাওয়া-আসার পরিশ্রমের জন্য নয়। চেষ্টা ক'রে যাকে ভুলতে হয়েছে, আজ আবার তারই সান্নিধ্যে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। এমন কি কমলা আসবে শুনে অবধি সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, যে ক'দিন কমলা এ বাড়ীতে থাকবে সেক'টা দিন সে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কাটিয়ে দিয়ে আসবে পড়াশোনা ক্ষতি হবার অজুহাতে। কিন্তু তার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে গেল সকালে চায়ের টেবিলে।

সকালবেলার রোদ তখনও তাদের ছাদের চিল-কুঠুরীর জানালার শিক ছুঁতে পারে নি। নিচের তলায় বাবা আর শঙ্কর চা খেয়ে উঠে যাবার পর সরোজের দৈনন্দিন বরাদ্দ দ্বিতীয় কাপটি এগিয়ে

দিয়ে মা বলেছিলেন, "হ্যাঁ রে সরোজ, আজ সন্ধ্যায় কি তোর কোনো কাজ আছে?"

একটু অন্যমনস্ক ছিল সরোজ, তাই মায়ের কথার জবাবে বলেছিল, "না মা—"

"তা হ'লে তুই-ই যা, কমলাকে নিয়ে আয় গেণ্ডারিয়া থেকে। বাপের বাড়ি এসে অবধি তিন-তিনটি চিঠি লিখেছে বেচারী, আহা, আমাকে মাসীমা বলতে অজ্ঞান মেয়েটা, আমাকে ঠিক মায়ের মতই দেখে—"

মায়ের এই কথাগুলো কানে যেতেই চমকে উঠেছিল সরোজ, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে সে। তবু প্রবল আপত্তি তুলে হাত নেড়ে বলেছিল, "না মা, ও-সব আমার দ্বারা হবে না তুমি যোগেশকে পাঠাও—"

বিরক্ত হয়ে হেমাঙ্গিনী বলেছিলেন, "আচ্ছা তুই কি হ'লি বল্ ত? এ কি চাকর-বাকরের কাজ? কমলার মা কি মনে করবেন বল দেখি?"

গোঁজ হয়ে সরোজ বলেছিল, "তা হ'লে শঙ্কর বা আর কাউকে পাঠাও মা—"

একটু কঠিন দেখিয়েছিল হেমাঙ্গিনীর মুখ। বলেছিলেন, "অত খোসামোদ করতে পারব না আমি। বড় হয়েছ, ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছ। আমার বলার ভাগ আমি বললাম, এখন তোমার কর্তব্য বলে ত যেও, না হয় যেও না—"

রুষ্ট মুখে সেখান থেকে উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিলেন হেমাঙ্গিনী। তাঁর শেষ কথাগুলো বসে-থাকা সরোজের কানে

বাজছিল—"নেহাৎ বাসাটা পাল্টে অনেক দূরে চলে গেছে, তা না হ'লে কারুর আনতে যাবার দরকারই হ'ত না, নিজে থেকে ঠিক চলে আসত কমলা।"

এক চুমুকে জল হয়ে-যাওয়া চা-টুকু শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে জালে ধরা-পড়া পাখীর মত ছটফটে মন নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিল সরোজ। তার পর ওপরে এসে পড়ার টেবিলে বসে এ বই ও বই ওল্টাতে ওল্টাতে পড়ার বই-এর পাতায় পাতায় কমলার নাম আর ছবি দেখে চমকে উঠেছিল। অনেক দিন আগের ভুলে-যাওয়া ভোঁতা বিষণ্ণ বেদনা মেরু-রজ্জু থেকে উঠে আস্তে আস্তে সারা মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফেলে-আসা রূপ-বর্ণ-গন্ধময় দিন-গুলির ভেতর তার নিস্তেজ মন ক্রমেই ডুবে যেতে থাকল।

সেদিনও নিজের পড়ার টেবিলে বসে এমনি ভাবেই একমনে এমনি ভাবেই পড়ছিল সরোজ। তার এই ছোট্ট পড়ার ঘরে কেউ আসে না বড়। তাই হঠাৎ খিল্ খিল্ হাসির শব্দ শুনে চমকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল সে। টানা টানা ভুরু দুটির নীচে নদীজলে-পড়া চঞ্চল আলোর মত উজ্জ্বল দুটি চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে সম্মোহিত করে রাখে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে কমলার সুগৌর মুখে অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো এসে পড়েছিল, সেই আলো যেন সরোজের মনকেও এক নিমেষে রাঙিয়ে দিয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সরোজ।

পলকের জন্য চোখ নামিয়ে আবার সরোজের মুখে তাকিয়ে হাসিমুখে কমলা বলেছিল, "বাব্বাঃ, ধন্যি পড়া আপনার। এই

যে এতক্ষণ ধ'রে ছাদে এসেছি, চারদিক্ ঘুরে-ফিরে দেখেছি তাতেও আপনার হুঁশ নেই। তা না থাক, কিন্তু এই অল্প আলোয় পড়াশুনা করলে যে দুনিয়ার কোন লেন্সই আপনার চোখে আলো আনতে পারবে না—"

বাইরে ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের দিকে একবার তাকিয়ে সুমুখের মোটা বইটা বন্ধ করে দিয়েছিল সরোজ, বলেছিল, "তাই ত, আলোরা যে কখন চুপি চুপি পালিয়ে গেছে তা জানতেই পারি নি, ভাগ্যিস তুমি এলে, মনে করিয়ে দিলে—"

এতদিনের আপনি থেকে সরোজ আজ হঠাৎ তুমিতে নেমে এসেছে লক্ষ্য করে কমলার বড় বড় দু' চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল, সারা শরীরে খুশির তরঙ্গ তুলে বলেছিল, "আপনি যে আত্মভোলা মানুষ, অনেক কিছুই পালিয়ে যাবে, আপনি জানতেও পারবেন না। নিন্ এখন উঠুন, চলুন ঐ ঘেরা ছাতে। দেখুন, দেখুন, পশ্চিমের ঐ আকাশে মেঘের দল কেমন আবির খেলছে—"

ছাদের উঁচু আলসের ধারে খুব পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল সরোজ আর কমলা, মৃদুস্বরে সরোজ বলেছিল, "বাঃ কি সুন্দর, সূর্য যেন শ্রীকৃষ্ণ, মেঘের দল যেন ষোড়শ গোপিনী, মনের আনন্দে হোরী খেলায় মেতে উঠেছে সবাই—"

কৌতুকোচ্ছল স্বরে কমলা বলেছিল, "আচ্ছা, ঐ মেঘ-রাঙা একটা শাড়ি পেলে কি মজাটাই না হ'ত। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কেমন রাঙা হয়ে উঠত—"

হতাশ কণ্ঠে সরোজ বলেছিল, "ওঃ, ঘোর গন্ত মেয়ে তুমি, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না—"

তেমনি সুরে কমলা বলেছিল, "মেয়েদের একটু গন্ধ হওয়াই ভাল সরোজদা, ছেলেদের আকাশ-কুসুমগুলো আঁচল ভরে তুলবে কে তা না হ'লে—

মাঝে মাঝে ওদের কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছিল, সরোজের নাকে ভেসে আসছিল কমলার চুলের মৃদু গন্ধ, সান্ধ্য প্রসাধনের স্নিগ্ধ সৌরভ আর উন্মোচিত নিটোল যৌবনের বিহ্বল করা উষ্ণ স্পর্শ সরোজের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল। চোখের সামনে প্রসারিত সান্ধ্য আকাশের অপার সৌন্দর্য দেখবে কি, বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যথা বার বার মোচড় দিয়ে উঠছিল। কমলার ছোট ছোট কথা আর ছোট ছোট হাসি কিছুই কানে যাচ্ছিল না তার।

তখন সরোজ জানত না যে এ ব্যথা যৌবনের, এ বেদনা প্রেমের। উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত মন যুগে যুগে এ বেদনার সৃষ্টি করেছে, একে লালিত করেছে।

এর পর কখন যেন পশ্চিম আকাশের ঐ আশ্চর্য সব রঙ শুষে মুছে নিয়ে আদিম অন্ধকার তার বিশাল থাবা বিস্তার করে হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল ছাদে কখন যেন নিঃশব্দে ঝরে-পড়া শেফালীর মত হারিয়ে গেল কমলা, সে সব কথা ভাবতে পারে না সরোজ। শুধু সেই সন্ধ্যার আনন্দ-বেদনাটুকু মধুর স্মৃতি হয়ে তার সারা মন জুড়ে আছে এখন।

আলমারি থেকে সিল্কের পাঞ্জাবি আর পাট-ভাঙা শান্তিপুরী ধুতি হাতে নিয়ে এ ঘরে ঢুকে অবাক্ হয়ে যান হেমাঙ্গিনী। সরোজ তখন হাত দুটি পেছনে মুঠো করে ধরে ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ

পর্যন্ত লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারা মুখে যন্ত্রণার সুস্পষ্ট চিহ্ন আঁকা।

ভয় পেয়ে হেমাঙ্গিনী বললেন, "কি রে, অমন করছিস কেন? শরীর খারাপ লাগছে নাকি? থাক্ তবে, না গেলি কমলাকে আনতে—"

মায়ের কথা কানে যেতে থমকে দাঁড়ায় সরোজ, যেন স্পষ্টভাবে কমলার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, "সরোজ দা—আমাকে কি একেবারেই ভুলে গেলে? একটা ভুল ভোলা কি এতই কঠিন?"

বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে এসে মা-র হাত থেকে জামা-কাপড় নিয়ে বারান্দায় এসে বাড়ির কাপড় ছাড়ে সরোজ।

একটু পরে নিউকাট পাম সু'র মস্ মস্ শব্দ তুলে রাস্তায় পা দেয় সরোজ।

ঘোড়ায়-টানা পাল্কী গাড়ী নবাবপুর রোড দিয়ে এগিয়ে যায়, রায় সাহেবের বাজার পার হয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের মোটা মোটা থামওয়ালা বিশাল অট্টালিকা ডান দিকে রেখে বাংলা বাজারের রাস্তায় পড়ল। গাড়ীর ঘড়ঘড়ানির ও দুলুনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলল সরোজের অশান্ত মন। দু'ধারের শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকাশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখা গাছের শ্যামল পত্রগুচ্ছের মত তার মন অতীতের ঝিলিক দেখতে পেল।

সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। হন হন করে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল সরোজ। ডাক-বাংলোর কাছাকাছি আসতেই সুমিষ্ট কণ্ঠের আহ্বানে তার পা

দুটো আপনা থেকেই মন্থর হয়ে এল—থেমে গেল এক সময়ে। পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে কমলা বলেছিল—"বাব্বাঃ ছুটতেও পার তুমি সরোজ দা। সেই কখন থেকে তোমায় ধরবার জন্য ছুটছি, কিছুতেই পারলাম না, শেষটায় লজ্জার মাথা খেয়ে ডাকতে হ'ল—তাও কি কানে যায়? আচ্ছা, সব সময়ে অন্যমনস্ক থাক কেন বল ত?"

পরিহাসের সুরে সরোজ জবাব দিয়েছিল, "যদি বলি তোমারই ধ্যানে থাকি বলে—"

একটু লাল হয়ে কমলা জবাব দিয়েছিল, "আহা, আমি যেন আর জানি না কিছু, ধ্যান কর ত তোমার সহপাঠিনী মালবিকা সেনের—"

"হ্যাঁ, রাক্ষসীমন্ত্র জপ করবার সময়ে তাঁর ধ্যানের প্রয়োজন হয় বটে। কিন্তু বর্তমানে আমি ইন্দ্রানীর ধ্যানে মগ্ন আছি, বুঝলে—" বলে জনবিরল রমণার মাঠ দিয়ে চলতে চলতে কমলার ডান হাত-খানা নিজের হাতে টেনে নিয়েছিল সরোজ।

কোন বাধাই দেয় নি কমলা, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, "মিছে কথাও তোমার মুখ থেকে শুনলে সত্যি বলে মনে হয়। যাক্, এখুনি বাড়ী ফিরবে? চল না নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসি একটু আড়ালে—"

"বেশ ত, চল, সত্যি-মিথ্যের প্রশ্নটারও একটা মীমাংসা হয়ে যাবে এখন—"

দু' আনার চিনে বাদাম কিনে গবর্ণার প্যালেসের কাছাকাছি ঘন সবুজ ঘাসের গালিচায় পাশাপাশি অন্ধকারে বসেছিল ওরা

দু'জনে। অনেক দূরে ব্রিটানিয়া টকিজের আলো জ্বলে উঠেছে, আলো জ্বলেছে ভিক্টোরিয়া ও উয়ারী ক্লাবের টেণ্টে। আলোর ঐ ভাসমান দ্বীপ কটি ছাড়া রমণার বিশাল মাঠ জুড়ে অন্ধকারের সমুদ্র। দূর থেকে ভেসে আসছে বাড়ী-ফেরা শিশুদের হিল্লোলিত কলধ্বনি, আর জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে-বেড়ানো নারী-পুরুষের বিশ্রম্ভালাপের মৃদু অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি। মেঘাবরণমুক্ত আকাশে একে একে দেখা দিয়েছিল গলানো রুপোর ভিতর ডুব দিয়ে-আসা তারার দল।

জায়গার কোন অভাব ছিল না, তবু ঘন হয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছিল সরোজ আর কমলা।

মৃদুকণ্ঠে সরোজ বলেছিল, "আমাদের বাড়ীতে ভাড়াটে হিসেবে প্রথম যেদিন এলে সেদিন মা-র কাছে তোমার নাম শুনে কি ভেবেছিলাম জান?"

মুখ তুলে সরোজের চোখে চোখ রেখে কমলা বলেছিল, "কি?"

"ভেবেছিলাম, এ ত বেশ যোগাযোগ। আমার নাম সরোজ আর তোমার নাম কমলা, আমার বুকের ওপরেই তোমার আসন—"

হাসির ভঙ্গিমায় কমলার পাৎলা, ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছিল নীচু গলায় বলেছিল, "সত্যি সত্যি ত আর তা নয়, তোমার বুক জুড়ে বিরাজ করছেন মালবিকা সেন—"

কমলার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে সরোজ বলেছিল, "আবার ঐ কথা। বললেও বিশ্বাস করছ না কেন শুনি?"

"তোমার নামে গোলাপী খামে চিঠি আসে—"

অসহিষ্ণু স্বরে সরোজ বলেছিল, "প্রশ্রয় না দিলেও যদি কেউ বোকার মত কাজ করতে থাকে, তবে আমি তার কি করতে পারি

বল ?"

"কিন্তু আমরা তোমাদের বাড়ীতে আসবার আগে কি তাকে খুব প্রশ্রয় দাও নি তুমি ?"

"সে সব ছিল ছেলেখেলা—"

"আর এটাও যে ছেলেখেলা নয় তার কি প্রমাণ দিতে পার তুমি সরোজদা ? তোমরা পুরুষ, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে উড়ে যেতে তোমাদের বাধে না—"

হঠাৎ কমলাকে চেপে ধ'রে গাঢ় অবরুদ্ধ স্বরে সরোজ বলেছিল, "এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি কমলা, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে না পেলে আমার সমস্ত জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে—"

সরোজের আবেগ কমলার মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল, ওর মাথাটা সরোজের কাঁধে নামিয়ে দিয়ে চুপ করে বসেছিল, নিবিড় মধুর অন্তরঙ্গটুকু সমস্ত শরীর মন দিয়ে উপভোগ করছিল।

অনেক পরে উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে স'রে গিয়েছিল। পৃথিবীর শব্দের জগৎ ধীরে ধীরে নীরবতার আশ্রয় খুঁজছিল। এবার গলা পরিষ্কার ক'রে সরোজ বলেছিল, "কমলা—"

যেন অনেক দূর থেকে কমলা বলেছিল, "কি ?"

"তোমার আমার এই নিবিড় সান্নিধ্যকে কি চিরায়ত করা যায় না ?"

অস্ফুট স্বরে কমলা বলেছিল, "কেন যাবে না সরোজদা,—খুব যাবে,—কিন্তু—"

"কিন্তু কি ? তোমার বাবার কথা ভেবে বলছ ?"

"হ্যাঁ—"

অধীর হয়ে সরোজ বলেছিল, "কিন্তু সমাজপতিদের দণ্ড কি চিরকালের জন্যই আমাদের প্রেমের ওপর উদ্যত হয়ে থাকবে?—কি, কথা বলছ না যে?"

উত্তর দিতে গিয়ে কমলার গলা কেঁপে গিয়েছিল, যে কথাটা সরোজকে বলবে ব'লে সেই বিকেল থেকে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল সেই কথাটা বলি বলি ক'রেও বলতে পারছিল না।

গভীর সুরে সরোজ ব'লে চলেছিল, "তোমার বাবা আমাদের ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেন না, তোমরা ব্রাহ্মণ আর আমরা কায়স্থ, শুধু এই একটা সামাজিক কৃত্রিম বাধা আমাদের প্রেমকে ব্যর্থ ক'রে দেবে এ কখনও হ'তে পারে কমলা? চল আমরা দু'জনে অন্য কোথাও চলে যাই"—

কেঁপে উঠে সরোজের হাত দুটো শক্ত ক'রে ধ'রে রুদ্ধশ্বাসে কমলা বলেছিল, "তা হয় না সরোজদা, আর এই বোধ হয় আমাদের শেষ নির্জনে দেখা—"

"তার মানে?"

"বাবা অন্য বাড়ী দেখে এসেছেন গেণ্ডারিয়াতে, কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আমরা, আর এ কথাটা বলব বলেই তোমার খোঁজে বিকেল থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম এখানে—"

কমলার খুব আস্তে আস্তে বলা কথাগুলো সরোজের মনে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল, এক মুহূর্তে নিথর হয়ে গিয়েছিল সে, একটু পরে ম্লান হেসে বলেছিল, "হঠাৎ?"

"হঠাৎ নয়,—যেদিন তোমাকে আমাকে একসঙ্গে রাত্রে অন্ধকার ছাদ থেকে নাবতে দেখেছিলেন বাবা, সে রাত্রে মা-র কাছে খুব একচোট বকুনি খেতে হ'ল, আর তারপরই বাবাও উঠে-পড়ে লাগলেন অন্য বাড়ী দেখতে—"

"ও, তাই তোমাকে ছাদে কি আমার পড়ার ঘরে দেখি নি এ ক'দিন,—আমি ভাবছিলাম কি না কি—এবার বুঝলাম সব। তা, ছোট্ট একটু বকুনির ভয়ই এত বেশী হ'ল তোমার কাছে যে, একবার দেখাটাও করতে পারলে না—"

"মেয়েদের যে কতদিকে কত বাধা সে তুমি বুঝবে না সরোজদা—"

"এবার গেণ্ডারিয়ার নতুন বাসায় গিয়ে তুমিই ভাল ক'রে বুঝে নিও—"

"রাগ করছ কেন সরোজদা—দেহের সান্নিধ্যই কি সব? মনে মনে কি কাছাকাছি থাকা যায় না, না তার কোন দাম নেই জীবনে?"

"দাম তার নিশ্চয়ই আছে"—ব্যঙ্গের স্বরে সরোজ বলেছিল, "খুব চড়া দামই আছে, কিন্তু সে শুধু কাব্যে আর সাহিত্যে। বাস্তব জীবনে তার দাম কাণাকড়িও নয় কমলা—"

নিজের মনের কথাটাই সরোজের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে সুমুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কমলা। তার জলভরা দু'চোখ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, এমন কি পাশে-বসা সরোজকেও না। শুধু বার বার মাথা নেড়ে সরোজের কথাটাকে অসত্য বলে ভাবতে চেষ্টা করছিল সে।

সহ্য করা যায় না এমন একটা ব্যথা সরোজের বুকের ভেতরটা যেন কুরে কুরে খেয়ে চলছিল, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। কমলার চুলের মৃদু গন্ধ, মাঝে মাঝে বেজে ওঠা চুড়ির নিক্বণ, আর শারীরিক উত্তাপ, তাকে বুকের ওপর চেপে রাখা, সে যন্ত্রণাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

একটু থেমে সরোজ বলেছিল, "ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করবার মত ক্ষমতা প্রেমের নেই কমলা, প্রেম ত শুধু মনকে নিয়ে নয়, তার একটা দেহের দিক্‌ও আছে, এই দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। তুমি আমাকে দু' দিনেই ভুলে যাবে কমলা, আমার জন্য পাতা পুরাণো আসন তুলে নতুন আসন পাততে বেশী দেরি হবে না তোমার—"

দু' হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে সরোজের কোলে মাথা গুঁজে অবরুদ্ধ স্বরে কমলা বলে চলেছিল, "না না সরোজদা, আমি কক্ষণও তা করব না, ভুলব না তোমাকে—তুমি ভুলে যেও না আমায়। হয়ত একদিন আজকের এই রক্ষণশীলতা কাটিয়ে এক হয়ে যেতে পারব আমরা—আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকব সরোজ-দা—"

ভাবতে ভাবতে সরোজের চোখে জল এসে যায়। সেদিনের আবেগদীপ্ত বিদ্যুৎ-শিহরিত অনুভূতির ছোঁয়া নতুন ক'রে লাগে তার বুকে। তার ঠোঁটের কোণের করুণ হাসিটুকু যেন বলতে থাকে—না কমলা, যা হয় না তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি ভুল করেছিলে। তা না হলে ক্রমে ক্রমে তোমার চিঠি বিরল হয়ে এল কেন? কেন

তুমি এক বছর কাটতে না কাটতেই আর একজনের গলায় মালা দিলে ? আর একজনের হয়ে গেলে ?

পাঁচ বছর কেটে গেছে তার পর। সরোজের হৃদয়ের বেদনার ক্ষত শুকিয়ে এসেছে সময়ের মলয়ে। এম. এস-সি পাশ করে ঢাকা ইয়ুনিভার্সিটিতেই কেমিষ্ট্রির লেকচারার হয়ে আছে সরোজ। মালবিকাও সরোজের সঙ্গেই পাশ করে তার সঙ্গেই চাকরি করছে। সহপাঠিনী হয়েছে সমকর্মিণী। বাইরে ভালো ভালো অফার পেয়েও মালবিকা ঢাকা ছাড়ে নি, তার এই নীরব প্রতীক্ষার দুশ্চর তপস্যা সরোজকে দগ্ধ করে, কিন্তু পুড়ে-যাওয়া প্রেমের ভস্মে আগুন জ্বালে না।

রাস্তায় রাস্তায় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এক-চোখো আলোগুলো এক ঠ্যাংএ দাঁড়িয়ে অন্ধকারকে নীচে নাবতে দিচ্ছে না। সরোজের গাড়ী কমলাদের বাসার সামনে এসে থামল।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সরোজ। একটা মাঝারি মাপের বসবার ঘর, ভেতরে যাবার দরজায় পুরু পর্দা ঝুলছে। একটু ইতস্ততঃ করে সরোজ ডাকল, "মামীমা—"

পরদা সরিয়ে এক ঝলক বাসন্তী বাতাসের মত ছুটে এল কমলা—কলকণ্ঠে বলে উঠল, "বাব্বাঃ, সেই কখন থেকে সেজেগুজে বসে আছি, এতক্ষণে আসার সময় হ'ল তোমার সরোজদা—"

একটা আধ-ফুটন্ত কলি যেন পরিপূর্ণ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। সুমুখের দাঁড়ান কানায় কানায় ভ'রে-ওঠা নারীকে দেখে চোখ নত করল সরোজ।

ফুটফুটে বছর তিনেকের একটি মেয়ে কমলার আঁচল ধরে টান

দিল, আধ ফোটা স্বরে বলল, "কে মা ?"

চোখে-মুখে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে কমলা বলল, "তোর মামা হয় রে শতদল—যা,প্রণাম কর্—"

মার পেছনে লুকোবার আগেই সরোজ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে, আদরে কাছে টানতে টানতে বলে, "কমলাই কি আর একবার শতদল হয়ে জন্মাল ? কি সুন্দরই না হয়েছে তোমার মেয়ে—"

পুলক আর গর্ব-ভরা চোখে একবার শতদলের মুখে একবার সরোজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কমলা, বলে, "তুমি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছ সরোজদা, অমন সুন্দর ঘন চুল ছিল তোমার, এত পাতলা হ'ল কি করে ?"

সরোজ জবাব দেবার আগেই কমলার মা পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল সরোজ, বলল, "কেমন আছেন মামীমা ?"

মলিনা বললেন, "আমার আর থাকা। এদের রেখে এবার যেতে পারলেই বাঁচি বাবা—"

সরোজ তাকিয়ে দেখল, এ ক'বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর, মেঘের মত কালো চুল ছোট করে ছাঁটা, রিক্ত শুভ্র বেশ একটা সকরুণ বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে তাঁর মুখে। মৃদু স্বরে মলিনা বললেন, "তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো ত বাবা ? কমলা—চা করে নিয়ে আয়—"

চঞ্চল হয়ে সরোজ বলল, "না মামীমা চা থাক। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে, রাস্তাও খুব কাছের না—"

মলিনা বললেন, "হ্যাঁ সে কথা ঠিকই, তা হ'লে সুটকেসটা এখানে নিয়ে আয় কমলা, যাবিই যখন তখন আর দেরি করে লাভ কি ?"

কমলা ছুটে চলে যেতে একটু হেসে মলিনা বললেন, "ক'বছর পরে বোম্বাই থেকে এল। এসে অবধি খালি মামীমার বাড়ী যাব বলে বলে আমাকে একেবারে অস্থির করে তুলেছে। দিদিকে ভীষণ ভালবাসত ত ও—তা যাক্, দিন কয়েক ঘুরে আসুক। শতদল থাকবে আমার কাছে—"

পাশাপাশি নয়, সামনা-সামনি বসেছে ওরা দু'জনে। পাল্কি গাড়ির ভেতরটা খুব অন্ধকার, খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার আলো সেই অন্ধকারের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়শব্দে এগিয়ে চলেছে ঘোড়ার গাড়ি। কালের চাকাও এমনি ভাবেই প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে—তবে তার সেই অলঙ্ঘ্য নিঃশব্দ গতি শোনা যায় না। হাজার চেষ্টা করলেও সে চাকা পেছন দিকে ঠেলে নিতে পারা যায় না। সে যেন সব সময়ে বলছে—অতীতের কবর খুঁড়তে যেও না, বর্ত্তমানের ঝরে-পড়া ক্ষণগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তৈরী করে নাও ভবিষ্যতের মণিহার।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কমলা বলল, সরোজদা"—

—"কি ?"

"তোমার সব কথা শুনেছি আমি মার কাছে। কেন এমন করে কষ্ট পাচ্ছ, আর—আরেকজনকে কষ্ট দিচ্ছ বল ত সরোজদা—"

একটু কঠিন সুরে সরোজ বলল, "সবাইকে তোমার মত হৃদয়হীনা বলে মনে কর কেন বল ত কমলা ?"

আঘাতটা সয়ে নিতে একটু সময় লাগল, তার পর কমলা বলল, "এতদিন পরে ঝগড়া করতে আসি নি সরোজদা, আর আমি হৃদয়-হীনাও নই, তোমাকে আমি ভালবাসতাম, আজও খুব ভালবাসি, তবে আজ হয় ত তার রূপ বদ্‌লেছে—"

"মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা"—প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সরোজ—"যার প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই, তার কোনও কথা আমি আজ বিশ্বাস করি না—"

ধীর স্বরে কমলা বলল, "বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে, সরোজদা। সব শুনলে বুঝবে যে, আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি। আমরা গেণ্ডারিয়ার বাসায় যাবার কয়েকদিন পরেই একদিন মালবিকাদি এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—উদ্‌ভ্রান্ত চোখে, যোগিনীবেশে। আমার হাত ধ'রে আমার কাছ থেকে তোমাকে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তাঁর প্রেমের তীব্রতা দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম, তাঁর কাছে আমার ভালবাসা নেহাৎ ছেলে-খেলা বলে মনে হ'ল। তোমার জীবন থেকে আমি সরে যাব—এই কথা আমি তাঁকে দিয়েছিলাম সেদিন। আমারও কষ্ট হচ্ছিল খুব, কিন্তু এই প্রায়-উন্মাদিনীর হতাশ দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে সংসার পাতবার সাহস আমার হ'ল না। আমাকে তুমি মাপ কর সরোজদা—"

উল্টো দিক থেকে আসা একটা মোটর গাড়ীর তীব্র আলো এসে পড়ল গাড়ীর ভেতরে। সেই আলোতে সরোজ দেখল কমলার দু' চোখে অশ্রুর ফোঁটা মুক্তার মত টল্‌টল্‌ করছে, থর থর করে কাঁপছে

পাৎলা ঠোঁট দুটি।

সরোজের বুকের যে ক্ষতটা সময়ের মলমে সম্পূর্ণভাবে সারে নি, তাই যেন আজ কমলার কথায় আর তার চোখের জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সরোজের বহু অনাদর ও অবহেলা সহ্য করেও যে মেয়েটি সব সময়ে তার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছে, দুটো কথা বলতে চেয়েছে, এক টুকরা হাসি পেলে কৃতার্থ হয়ে গেছে, তার নিঃসঙ্গ মনের বিপুল বেদনা সরোজের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মালবিকার বাইরের রূপ ম্লান হয়ে গিয়ে তার মনের অনিন্দ্য রূপই বড় হয়ে দেখা দিল।

সরোজের বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে থামল।

× অভিমান
×
×
×
×
×
×
×
×
×

১

সামান্য কথা নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল স্বামীস্ত্রীতে।

দোতলা ফ্লাটের পাতলা মেঝের ওপর দিয়ে দুম দুম শব্দে পা ফেলে ঘরের কোণে চলে যায় রেবা, উবু হয়ে বসে কটাং শব্দে নিজের ছোট্ট ট্রাঙ্কটির তালা খোলে আর দেখতে দেখতে মধ্যে শাড়ী সায়া ব্লাউজের স্তূপে পূর্ণ হয়ে ওঠে তার গহ্বর।

গুম হয়ে পাশের ঘরে খাটের ওপর বসে থাকে বিকাশ, ছাঁটা ছোট গোঁফ দু' আঙ্গুলে ধরতে চেষ্টা করে—অল্প আগের গরম গরম কথাগুলো মস্তিষ্কের ভেতর পাক খেতে থাকে।

খোলা দরজার সুমুখে বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ায় রেবা, পরণে তার বাইরে বেরুবার বেশ, নাকের একপাশে আটকে-থাকা পাউডার-টুকু তার দ্রুত প্রসাধনের নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুখ তুলে বিহ্বলের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকে বিকাশ।

"আমি চললাম।" থমথমে গলায় ঘোষণা করে রেবা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে, তার পরে খুট খুট শব্দে জুতোর আওয়াজে সিঁড়িপথ মুখর করে নেমে যায় নীচে। বাক্স ঘাড়ে অনুসরণ করে বালকভৃত্য হরিচরণ।

একটা কথাও বেরোয় না বিকাশের মুখ দিয়ে। দুরন্ত অভিমানের মেঘে দাম্পত্য প্রেমের সূর্য ঢাকা পড়ে।

চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে রাগে ফুঁসতে থাকে রেবার মন। মনে করেছিল যে, বেরুবার পূর্ব মুহূর্তেও নিজের ভুল স্বীকার করবে বিকাশ। বেরিয়ে পড়বার ঠিক আগে দরজার সুমুখে কয়েকটি মুহূর্তের নিষ্ফল প্রতীক্ষা করেছিল সে। মনের কোণে প্রত্যাশার ক্ষীণ ঝিকিমিকি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রত্যাশিত সে আহ্বান শুনতে না পাওয়ায় মনের ভার তার বাড়ে বৈ কমে না।

রেবার পিসতুত বোনের বিয়ে। পিসেমশাই বড় চাকুরে, মেয়ের বিয়েও দিচ্ছেন বড় ঘরে। এই তাঁর শেষ কাজ, তাই কাছে-দূরের সব আত্মীয়স্বজনের কাছেই পাঠিয়েছেন সাদর আমন্ত্রণ-লিপি।

রেবার ইচ্ছে ষাট-পঁয়ষট্টি টাকার মধ্যে একখানা ভাল মহীশূর জর্জেট কিনে দেয় বোনের বিয়েতে, তা না হলে মান থাকে না তার, চারদিক থেকে আসা অগণ্য উপহারের স্তূপে তার উপহারটা নেহাৎ নগণ্য দেখাবে তা না হলে। এদিকে বিকাশের ভীষণ টানাটানি চলছে ক'মাস। পরীক্ষায় ফেল করায় তিনটি ছাত্রের বাড়ী টুইশানি করা বন্ধ হয়েছে তার। এর ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোড়ার মত নিউ ইণ্ডিয়ার এক চ্যাংড়া ছোকরা এজেন্ট এ পাড়ায় বাসা বাঁধায় তার ইনসিওরেন্সের পার্টটাইম আয়ও গেছে কমে। তাই সে প্রস্তাব করল কম দামি একখানি ধনেখালির।

শোনামাত্র রেবা বলে, "না।"

"আহা, কথাটা বুঝে দেখ একবার।" হাতে তুলে রেবাকে

বোঝাতে চায় বিকাশ।

"বুঝবার কিছু নেই।" দৃঢ়স্বরে রেবা বলে, "তোমার লজ্জা না থাকলেও আমার আছে। ও রকম একটা খেলো জিনিস হাতে নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াতে পারব না আমি।"

"কিন্তু যার যেমন অবস্থা—"

বিকাশের কথা শেষ হবার আগেই ঘর ছেড়ে চলে যায় রেবা, গুম হয়ে বসে থাকে রান্নাঘরের ছোট্ট পিঁড়িটার ওপর।

মেয়েদের হৃদয়াবেগের কাছে যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই। তাই বিকাশের অকাট্য যুক্তির শাণিত তীরগুলি রেবার অবুঝ আবদারের কঠিন বর্মে ঠেকে প্রতিহত হ'ল, লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। রেবার দুর্জয় মান, বড়লোক পিসতুত বোনের কাছে মাথা হেঁট করতে রাজি নয় সে কোন মতেই।

তাই এক কথার দু'কথার সূত্র ধরে এগুতে এগুতে শেষটায় কলহের জটিল জালে ক্রমে ক্রমে আটকে পড়ে দু' জনেই।

রেবা চলে গেছে। মনে মনে এ কথাটি একবার আবৃত্তি করে বিকাশ। ছোট্ট দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট, রেবা থাকতে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ভরে ছিল। নীড়াভিলাষী পাখীর মত সারাক্ষণ এটা-ওটা দিয়ে ঘর সাজাতে ব্যস্ত থাকত সে। ঘটি-বাটি নাড়ার, কি পায়ের, কি নিঃশ্বাসের শব্দে যেন বিচিত্র সুর-ঝঙ্কার উঠত। আজ সব শূন্য। নিরাবয়ব সাদা দেওয়ালের দিকে বোবা চোখে তাকায় বিকাশ। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সবই যেন অন্তঃসারশূন্যতায় ভরা বলে মনে হয় তার।

অথচ মাত্র মাসছয়েক হ'ল বিয়ে হয়েছে ওদের। পরস্পরকে গভীর ভাবে পাওয়ার নেশা এখনও অবসাদ আনেনি ওদের জীবনে, কূজনে গুঞ্জনে ভরপুর গৃহে আজ এ কি আকস্মিক ছন্দপতন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ। অলস কল্পনার স্থান অতিশয় সীমিত তার জীবনে, জীবন-সংগ্রামের রুদ্র আহ্বান ডাক দিচ্ছে তাকে বাইরে থেকে।

পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে জীবন বীমার সম্ভাব্য শিকার খুঁজতে বের হয় বিকাশ।

২

ওদিকে দ্রুতগামী গোমো এক্সপ্রেসের নিরালা কোণে বসে প্রতি মুহূর্তে কলকাতা থেকে দূরে, আরও দূরে সরে যেতে যেতে রেবার দু'চোখ বারে বারে জলে ভরে আসে। গাড়ীর দুলুনীর তালে তালে দুলতে দুলতে মনে মনে ভাবছিল যে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল যেন। এ ভাবে চলে না এলেই ভাল হ'ত। অভিমানের কোমল লতায় বড় বেশী টান পড়েছে।

হৃদয়মূলের প্রেমের উৎসে চেপে বসা অভিমানের জগদ্দল পাথরখানা একটুখানি নড়ে উঠল।

সন্ধ্যার অন্ধকারকে ঘাড় ধরে ঠেলে বার করে দিয়েছে আসান্‌সোল স্টেশনের অগুন্‌তি বাতি। চা-গ্রম, পান বিড়ি-সিগরেট আর আরও অনেক হৈ চৈ হট্টগোলকে পেছনে ফেলে রিক্‌সা করে জি. টি. রোডের ওপর একটা দোতলা বাড়ীর সুমুখে এসে নামল রেবা।

হঠাৎ রেবাকে দেখে অবাক হয়ে যান রেবার দাদা মণীশ সান্যাল।

রেবার পেছনে কুলি, কুলির পেছনে দৃষ্টি চালিয়ে কার যেন খোঁজ করেন তিনি, তার পর নিরাশ হয়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টি ফেলেন রেবার মুখে। তাঁর এই অনুচ্চার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আবিরের ছোঁয়া লাগে রেবার মুখে, শাড়ীর কোণ পাকাতে পাকাতে পাকাতে বলে, "ও আসে নি আমার সঙ্গে।"

মক্কেলবিহীন বৈঠকখানায় অবাক হওয়া দাদাকে রেখে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে রেবা, সান্ধ্য-রেডিও শ্রবণরতা বৌদির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ রেবাকে দেখে খুশীর আভায় নেচে ওঠে বৌদির দু'চোখ, দু'হাতে রেবাকে জড়িয়ে ধরে গানের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, "ওরে আমার রেবা এসেছে রে..."

"কই মা, কই মা—" বলতে বলতে পড়ার বইয়ের বাঁধন কাটবার অভাবনীয় উপলক্ষ্য পেয়ে নাচতে নাচতে ছুটে এল মিতা, সীতা আর টুলু।

এর পর বৌদির রঙ্গ-রসিকতা, ভাইপো-ভাইঝিদের হুল্লোড় হুড়াহুড়ি কিছুক্ষণের জন্য রেবাকে ভুলিয়ে দিল সব। মনের ভেতর চেপে বসা ব্যথাটা হালকা হয়ে মিলিয়ে গেল এক সময়ে।

কিন্তু নিশীথ রাতের নির্জনতা আনমনা করে তোলে রেবাকে। বিয়ের পর এই প্রথম ছাড়াছাড়ি, আর তাও কি না এ ভাবে। বড় শূন্য মনে হতে থাকে হৃদয়পুরকে। কার নিবিড় সুখ-স্পর্শের স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা করে তোলে তাকে।

অনেকক্ষণ নিদ্রাবিহীন শয্যায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে শেষটায় অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রেবা।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তার মাথায় কপালে গলায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়।

সুমুখেই কালো বিসর্পিল রেখায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পড়ে আছে নিবিড় অন্ধকারে ঘুমন্ত অজগরের মত। অনেকক্ষণ পরে পরে তীব্র দ্যুতিময় হেড লাইট জ্বেলে সগর্জনে সারা রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলে যায় মাল বোঝাই ট্রাক। অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় তাদের পেছনের রক্তিম বাতি, তার পর হঠাৎ বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকায় রেবা। মাথার ওপর সহস্র চক্ষু আকাশ তারই মত নিদ্রাবিহীন অপলক চোখে নীচের দিকে চেয়ে আছে।

পাশেই দাদা বৌদির শোবার ঘর। ভিতর থেকে মৃদু আলাপনের গুঞ্জন উড়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে চার ধারের নিশীথ অন্ধকারে। হঠাৎ তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে উৎকর্ণ হ'ল রেবা। চারি দিকের স্তব্ধ নির্জনতায় শুনতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তার, তবু আরও ভাল করে শুনবার আশায় এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল রুদ্ধদ্বার কক্ষের দিকে। কাণ পাতল দরজায়।

"আমার মনে হয় একটা কিছু হয়েছে দু'টিতে," গুঞ্জনরবে বৌদি বলেন, "তা না হলে এভাবে কখনো আসে? না চিঠি, না পত্তর।"

"ঠিকই বলেছ শোভা—" জবাব দেন রেবার দাদা, "এই সে-দিনও ত রেবাকে এখানে আসার জন্য চিঠি দিলে ফ্লাটলি রিফিউজ করল বিকাশচন্দর। তাতে রেবারও মত ছিল নিশ্চয়ই।"

"তা আবার ছিল না", খিল খিল শব্দের ঢেউ ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে রেবার কাণ দুটো গরম হয়ে ওঠে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার।

—"মাঝে মাঝে মুখখানা থমথমিয়ে উঠছিল, কেমন যেন অন্ত-

মনস্ক হয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে, লক্ষ্য করেছ ?" বৌদির গলা শোনা যায় আবার।

"ঝগড়াঝাঁটি নয়ত ?"

"তাই বলেই ত মনে হয়। হাজার হোক, তোমারই ত বোন।"

"আহা, নিজে যেন ভিজে বেড়ালটি,—আঃ ছাড় ছাড় শুনতে পাবে।"

আলাপ ক্রমেই ঘোরালো বাঁকা পথ ধরেছে দেখে আস্তে আস্তে সরে এল রেবা। ঘরে এসে বিছানায় বসে জোরে মাথা চেপে ধরল হু হাতে। উষ্ণ রক্তস্রোতের ধারা ততক্ষণে মাথার ভেতরে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে।

অনেকক্ষণ পরে স্বেদলাঞ্ছিত কপোলতল, ঘাড় আর কপাল ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে চোখ বুঁজে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে রইল রেবা।

বিকাশ যে অতদূরে থেকেও এমনভাবে তাকে জ্বালাবে তা সে ভাবতেও পারেনি এর আগে।

পরদিন ভোরে চা খাবার টেবিলে বসে বৌদির চোখে তাকাতেই পারল না রেবা। বৌদি কিন্তু নির্বিকার। হাসি ঠাট্টা রঙ্গ রসিকতায় ঠিক আগের মতই—বরং যেন বেশী।

তুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পান মুখে দিয়ে রেবাকে ডেকে বলেন বৌদি—"চল রেবা, ঘুরে আসি একটু।"

"কোথায় বৌদি ?" নিরুৎসুক সুরে রেবা বলে।

"এই কাছেই, হটন রোডে। বন্দনাকে চিনিস ত ? তাদের বাড়ী," শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বৌদি বলেন।

"কোন্ বন্দনা ?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে রেবা।

"সে কি রে"—খুবই আশ্চর্য হয়ে বৌদি বলেন, "কেন, বিকাশ কিছু বলেনি তোকে ?"

হৃৎস্পন্দন দ্রুতলয়ে চলে,—স্পষ্ট অনুভব করে রেবা, তবু মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়া রক্তিমাভা অস্বীকার করে বৌদির চোখে চোখে রেখে বলে—"কৈ না তো," তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, "হয়ত বলেছে, ভুলে গেছি আমি।"

"বন্দনা হিন্দুস্থানের এজেন্ট" আড় চোখে রেবার মুখ দেখে নিয়ে গম্ভীর সুরে বৌদি বলেন, "সেই সূত্রে বিকাশ যখন আসানসোলে ছিল তখন থেকেই দু'জনায় খুব আলাপ অন্তরঙ্গতা। অন্তরঙ্গতা বাড়তে বাড়তে গভীরতর অন্য কিছুতে পরিণত হতে হতে হয় নি—বিকাশের হঠাৎ কলকাতায় বদলী হবার জন্য। অবশ্য এ সবই তোদের বিয়ের আগের ঘটনা।"

চক্ষু নত করে বুকের ভেতরের ভূমিকম্পটাকে অতি কষ্টে সামলে নেয় রেবা।

ওঃ ভেতরে ভেতরে এত ! মিষ্টি মিষ্টি মন কেড়ে নেওয়া কথাগুলো তবে আসলে শূন্য-গর্ভ ! কে জানে, এই কথাগুলোই হয়ত বন্দনার কাণেও মধু ঢেলেছিল একদিন।

উঃ, কি শঠ আর কপট এই পুরুষ জাতটা ! এই ছ' মাসের মধ্যে বন্দনা নামে একটি মেয়ের সম্বন্ধে একটা কথাও ত তাকে বলে নি বিকাশ। ভুলতে না পারাটাই তো এই গোপনতার আসল মানে।

বেড়াবার ইচ্ছা আর তিলমাত্রও ছিল না। তবু বৌদির হাজার জেরার হাত এড়াবার জন্যই শাড়িটা পাল্টে নেয় রেবা। তার অনিচ্ছুক পা দুটো ম্রিয়মান শরীরটাকে বয়ে নিয়ে গেল জি. টি.

রোডের ওপর দিয়ে হটন রোডের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

বাড়ীতেই ছিল বন্দনা। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায় দু' জনকে, কলকণ্ঠে বলে ওঠে—"ওমা দিদি যে! কি ভাগ্যি আমার···আসুন, আসুন, এ ঘরটা বড় গরম, ও ঘরে চলুন···"

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর আপাদমস্তক দেখল রেবা। বিতৃষ্ণায় মন ভরে ওঠে তার। কি অসভ্য! অতখানি লো কাট ব্লাউজ বুঝি ভদ্রঘরে কেউ পরে? ঠিক যেন যৌবনের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন। রং ত মাজা মাজা, সাদা পাউডারের ছোপ তার ওপরে সুস্পষ্ট। চোখ দুটি অবশ্য মন্দ নয়, সব সময়েই যেন হাসছে—অনিচ্ছার সঙ্গে মনে মনে স্বীকার করে নিল রেবা, তবে রুচির পরিচয় নেই বেশ-বাসে, বাসন্তী রং শাড়ির সঙ্গে লাল রঙের ব্লাউজ পরেছে দ্যাখ না!

খুশীতে ভরপুর বন্দনাকে থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বৌদি বলেন, "ওরে থাম থাম, দম নিতে দে আমাকে। এই যে, আমার সঙ্গে দেখছিস, এ কে বলত?"

এক ঝলক আলো পড়ে যেন রেবার মুখে, বন্দনার বড় বড় চোখ দুটি রেবার কঠিন মুখ ছুঁয়ে যায়!

"পারলি না ত বলতে?" এক পলক অপেক্ষা করে বৌদি বলেন, "এ হচ্ছে আমার ননদ,—বিকাশের বৌ।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বন্দনা, "কি আশ্চর্য! বিকাশদার বৌ আপনি? কি ভাগ্যি যে দেখা হল আপনার সঙ্গে! ভীষণ ঝগড়া আছে কিন্তু বিকাশদার সঙ্গে আমার। চুপি চুপি বিয়ে করে মিষ্টির অঙ্কে শূন্য বসানো বার করব আমি। দেখা হোক না একবার, মজাটা টের পাইয়ে দেব।"

প্রাণোচ্ছলা তরুণী এই বন্দনা। হাসি গল্পে ডুবিয়ে দেয় রেবা আর তার বৌদিকে।

এমন তুখোড় না হলে ইন্‌সিওরেন্সের শিকার ধরবে কেমন করে? মনে মনে ভাবে রেবা, আক্রোশভরা অন্ধ বিদ্বেষ জাগে ওর মনে। কত না নির্জন অবসরক্ষণে এমনি ভাবে গল্পগাছা করেছে বন্দনা-বিকাশ। ভেবে চোখ দুটি জ্বালা করে উঠে রেবার। নিশ্চয়ই গভীর অন্তরঙ্গতার সুর বেজেছিল দু'জনার মনে—মনে মনে ভাবে রেবা—তা না হলে লুকিয়েছে কেন ওর কথা আমার কাছে? কতদূর এগিয়ে ছিল ওরা দু' জনে? তীক্ষ্ণ চোখে বন্দনার মুখে তাকায় রেবা, যেন কোন এক দুরূহ লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে সে।

সহজে ওদের ছাড়ল না বন্দনা। বিকেল হ'ল, চা খাবার খাওয়া হ'ল, তারপর আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে ছাড়া পেল রেবা আর তার বৌদি।

"বড় ভাল মেয়ে এই বন্দনা," ফেরার পথে বৌদি বলেন, "খুব মিশুক আর আমুদে।"

ঐ করেই ত মাথাটা খেয়েছে আমার—মনে মনে ভাবে রেবা, তা না হলে সামান্য একটা শাড়ির জন্য এত কাণ্ড হয় কখনও? এখন হয়ত পুরনো প্রেমের রোমন্থন করছে বিকাশ। তাই বুঝি একটা চিঠিও দিচ্ছেও না, বেঁচে আছি না মরে রেহাই দিয়েছি তারও খোঁজ নিচ্ছে না।

অভিমানের বিপুল তরঙ্গ বুক থেকে উঠে গলার কাছে আছড়ে পড়ে। চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে, কি যেন একটা আটকে আছে গলার ভেতর পুঁটুলির মত। নাকের ভিতরটা কেমন যেন

নোন্‌তা নোন্‌তা।

পথ চলতে চলতে আড় চোখে রেবার আনত মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকান বৌদি। মুখে আর কিছু বলেন না।

৩

এর পরের সাত আটটা দিন রেবাকে যেন কুচি কুচি করে কেটে রেখে গেল। বৌদির রঙ্গ তামাশা, ভাইপো ভাইঝিদের আদর আবদারের অত্যাচার, দাদার স্নেহগর্ভ কথাবার্তা কিছুই ভাল লাগে না রেবার। ঈর্ষ্যা আর সন্দেহের কীট তার ফুলের মত বুকটাকে কুরে কুরে খেতে থাকে।

বিকেল বেলা গা ধুয়ে পরিষ্কার শাড়িখানা পরে আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে কপালে সিন্দুর টিপ পরতে পরতে বৌদি বলেন, "শুনেছিস রেবা—বন্দনা বদলী হ'ল কলকাতার আপিসে।"

জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে চুপ করে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল রেবা—কথাটা কানে যেতেই চমকে বৌদির পিঠের দিকে তাকাল।

আয়নার ভেতর দিয়ে রেবার শুকনো মুখে একটিবার তাকিয়ে বৌদি আবার বলেন, "মহা মুস্কিলে পড়েছে বেচারী, কলকাতায় ওর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই যে গিয়ে উঠবে।"

চুপ করে শোনে রেবা, উত্তর দেয় না।

একটু ইতস্ততঃ করে, কেসে গলাটা পরিষ্কার করে বৌদি বলেন, "আমায় বলছিল তোদের ফ্ল্যাটের দুটি ঘরের একটি তাকে ছেড়ে দিতে পারিস কি না জিজ্ঞেস করতে, তা তোর কি অসুবিধে হবে

খুব ?"

তীরবেগে উঠে দাঁড়ায় রেবা, ওর অগ্নিজ্বলা চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে মুখ নিচু করেন বৌদি, আমতা আমতা করে বলেন, "অবশ্য সাময়িকভাবেই চায় ও, নতুন বাসার খোঁজ পেলেই উঠে যাবে। তা কি বলিস ?"

দাঁতে দাঁতে চেপে রেবা শুধু বলে, "না।"

"বড়ই মুস্কিলে পড়বে বেচারী—কলকাতায় ঘর পাওয়া যে কি" —আক্ষেপের সুরে বৌদি বলেন, "যাই, বলে আসি ওকে। দু'চার দিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছে বন্দনা। ওর ত খুবই আশা যে গিয়ে পড়লে বিকাশ ওকে না করতে পারবে না।"

সাজসজ্জা সেরে বেরুবার মুখে রেবাকে সেখানেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বৌদি বলেন, "বন্দনার ওখানে যাচ্ছি, যাবি আমার সঙ্গে ?"

থর থর কাঁপা ঠোঁট দুটো শক্ত ভাবে চেপে কোন মতে রেবা বলে, "না।"

বৌদি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এক ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রেবা। কান্নার সমুদ্রে জোয়ার আসে।

তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত একটা কথা তার মর্মতল বিদ্ধ করতে থাকে—'বিকাশ ওকে না করতে পারবে না।'

চোখের পাতা দুটি এক করতে পারল না সে রাত্রে রেবা। পরদিন সকালে নিরক্ত কঠিন মুখে দাদা বৌদির কাছে বিদায় নিয়ে সকালের ডাউন কোল্ডফীল্ড এক্সপ্রেস ধরল রেবা।

প্রণাম করবার সময়ে বৌদির মুখে সামান্য একটু হাসির যে ঝলক দেখল রেবা সেকি শুধু চোখের ভ্রম?

পরিচিত ফ্ল্যাটে এসে দুরু দুরু বুকে সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে রেবা। পা যেন আর চলতে চায় না তার। যে প্রচণ্ড আবেগ এতক্ষণ ধরে শক্তি যোগাচ্ছিল তাকে, পুড়ে যাওয়া হাউইর মত তা যেন সহসা নিঃশেষ হয়ে গেল।

পি-১১৭। নেমপ্লেটটিও ঠিক তেমনি আছে। বন্ধ দরজার বুকে আঘাত করার পূর্বক্ষণেই ভেতর থেকে খুলে যায় পাল্লা দুটো। ভ্রমণ-সজ্জায় সুমুখে দাঁড়িয়ে বিকাশ।

"একি, রেবা!" আনন্দের পাড় লাগান সংশয়ের সুর ফোটে বিকাশের কণ্ঠে।

মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে রেবার, টলেই পড়ে যাচ্ছিল, দু' হাত বাড়িয়ে বিকাশ ধরে ফেলে তার বেপথু পতনোন্মুখ শরীর।

একটু পরে দু'হাতে বিকাশের মুখখানা তুলে ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে রেবা। চোখের কোলে কালি পড়েছে বিকাশেরও, শীর্ণ হয়েছে লম্বাটে মুখ।

"একটা খোঁজও ত নিলে না," বলে উচ্ছ্বসিত কান্নায় বিকাশের বুকে ভেঙে পড়ে রেবা। বন্ধনমুক্ত কবরীগুচ্ছ সর্পিল ভঙ্গিমায় লুটিয়ে পড়ে ওর পিঠে। অভিমানের ভরা সমুদ্রে তুফান উঠল যেন।

"কি করে নেব?" ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বিকাশ বলে, "তুমি যাবার পরেই ত বোম্বে যেতে হ'ল আমায় আপিসের কাজে। এই ত ফিরছি, ফিরেই বেরুচ্ছিলাম আসানসোল যাবার

জন্য।"

তারপর দিবাবলুপ্তি আর অন্ধকার, আর সুখের হিল্লোলে ভেসে ভেসে যাওয়া। আনন্দ বেদনার মিশ্র সম্মেলন।

কিছুক্ষণ পরে সুটকেশ খুলে বিকাশ বার করে একটি ময়ূরকণ্ঠির মান্দ্রাজী শাড়ি।

"বোম্বাইয়ে খুব সস্তায় পেলাম। দামও তোমার ধনেখালি আর জর্জেটের মাঝামাঝি।

শাড়িখানা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাসি ফোটে রেবার মুখে, ধারাস্নাত শুভ মল্লিকার ওপর এক ঝলক চন্দ্র-কিরণ পড়ল যেন। শাড়িখানা দূরে ফেলে দিয়ে আবার বিকাশের বুকে মুখ লুকায় সে।

বন্দনার প্রশ্ন তক্ষুণি আর তোলে না রেবা। ভাবে দুদিন যাক, আস্তে আস্তে বার করতে হবে সব কথা।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয় না। পরের দিনের ডাকে বৌদির চিঠিতে সব কথাই জানতে পারে সে।

বিকাশেরই দূর সম্পর্কের মামাতো বোন বন্দনা। আসানসোলে থাকবার সময়ে বিকাশই ওর চাকরী করে দিয়েছিল। মিথ্যাচরণ-টুকুর জন্য বৌদির ওপর যেন রাগ না করে রেবা।

আনন্দ ঘন মিলন মুহূর্তে পরিহাসপ্রিয়া বৌদির মুখখানা রেবার মনের পটে ফুটে ওঠে সুখ যেন হয়ে চোখে কোণে টলটল করতে থাকে।

সংস্কার

ম্যাল থেকে ঘোড়ায় চেপে মহাকাল পাহাড় অর্ধেক প্রদক্ষিণ করে পশ্চিমমুখো হতেই একেবারে সামনাসামনি পড়ে যায় নরেন। রাশ টেনে ধরা মাত্র থেমে গেল পার্বত্য ঘোড়া, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে ফেন-পুঞ্জিত মুখটা অসহিষ্ণুভাবে এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকে।

নরেন ততক্ষণে তার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে।

সুমুখে দাঁড়িয়ে নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা মধ্যবয়স্ক স্থূলকায় এক ভদ্রলোক আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনা। ভায়োলেট রংএর শাড়ির ওপর সবুজ রং এর কোট, আর তার ওপরে ঠিক একটি গোলাপের মত ফুটে আছে কাঞ্চনার হাসিমুখ।

টকটক লাল সিঁথির সিঁদুরে পলকের জন্য আটকে গেল নরেনের দৃষ্টি, পরক্ষণে কাঞ্চনার মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে রাজ্যপাল-ভবনশীর্ষের সুনীল ডোমের দিকে তাকিয়ে থাকে নরেন।

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে কাঞ্চনা, দুর্জয়লিঙ্গর তপস্যা-ভূমে যেন জলতরঙ্গ বেজে ওঠে, হঠাৎ বৃষ্টির জল পেয়ে ঢল নামে যেন পাহাড়ী ঝরনায়।

"নরেনদা, চিনতে পারলে না আমাকে? আমি—"

চমক ভাঙে নরেনের, হাত তুলে বলে, “থাক, পরিচয় দিতে হবে না—”

গম্ভীর হয়ে যায় কাঞ্চনা, আড়চোখে পার্শ্ববর্তীর দিকে তাকায়, তারপর নরেনকে লক্ষ্য করে বলে, “আমার না হোক, এঁর পরিচয় দিচ্ছি,—ইনি আমার স্বামী—”

“শ্রী এ. কে. রায়. অ্যাড্‌ভোকেট” দু' হাত তুলে নমস্কার করে গম্ভীর ভরাট গলায় বলে ওঠেন কাঞ্চনার স্বামী।

“ইনি আমাদের নরেনদা, নরেন লাহিড়ী, ঢাকায় আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন, আর—”

“কাঞ্চনাকে গান শেখাতেন—” বলে ওঠে নরেন, প্রগল্‌ভা কাঞ্চনা কী বলতে কী বলে ফেলবে সেই ভয়ে আগেভাগেই।

নরেনের কথার ভঙ্গিতে কৌতুক-হাসি ওঠে, সব ছাপিয়ে শোনা যায় কাঞ্চনার মুক্ত খিল খিল হাসি, অবারিত সূর্যালোকের মতই তা দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষ দর্শকের মুগ্ধ চোখকে অন্ধ করে রেখেছে যে মুখ, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর একটা শিরশিরানি অনুভব করে নরেন।

“সত্যি, নরেনদার কাছেই আমার হাতেখড়ি,” লীলাভরে মাথা নেড়ে কাঞ্চনা বলে, “আজ যে আমার এত নামডাক, সে সবের মূলে আছে নরেনদার স্বার্থহীন সাধনা। কিন্তু নরেনদা, গানবাজনা সব কি তুমি ছেড়ে দিয়েছ? কোথাও তো তোমার নাম শুনি না আর!”

বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে নরেনের। সেই প্রায়ভুলে যাওয়া অসহ্য বেদমাটা অতীতের ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে মাথা চাড়া

দেয়। শূন্য চোখে হালকা মেঘের মত ধোয়াঁটে কুয়াসার দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

সবাই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর একটু উসখুস করে নীরবতা ভঙ্গ করেন মিস্টার রায়, বলেন, "আজ বিকেলে আসুন না আমাদের ওখানে, গল্পগুজব করা আর চা খাওয়া একই সঙ্গে হবে। উইণ্ডমীয়ার হোটেল, রুম নাম্বার থ্রি।"

"হ্যাঁ, এসো কিন্তু, ভুলো না," চঞ্চল চোখের দৃষ্টির সঙ্গে কথাকটি ছুঁড়ে দেয় কাঞ্চনা, "নিশ্চয়ই এস। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" তারপর রায় সাহেবের গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে স্নমুখের দিকে।

হঠাৎ যেন জায়গাটাকে অন্ধকার মনে হয় নরেনের। দু পা এগিয়ে ঠিক যেখানে কাঞ্চনা দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় নরেন। বাতাসে তখনো ভেসে আছে দুষ্প্রাপ্য গন্ধরেণুর ঘ্রাণ।

একবারও পিছনে ফিরে তাকায় না কাঞ্চনা, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নরেন শুনতে পায় হাসি উচ্ছ্বাসে নির্জন পার্বত্য পথ মুখরিত করে চলেছে কাঞ্চনা।

দেখতে দেখতে পথের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায় তারা দু জন।

রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসতেই মন্দ মন্থরে এগিয়ে চলে পাহাড়ী টাট্টু, এগিয়ে চলে পথে পথে ছড়িয়ে থাকা অজস্র প্রজাপতির মত বহু বিচিত্র পোশাক পরা নরনারীর কোলাহলে মুখর প্রশস্ত ম্যাল্‌এর দিকে।

ঘোড়া জমা দিয়ে হাঁটতে থাকে নরেন। ম্যাল থেকে ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে পথে। দুপাশে সুসজ্জিত বিপণি, কটেজ। উষ্ণ

আমন্ত্রণে দুয়ার খুলে রেখেছে চাইনিজ রেস্তোরাঁ। কোনো দিকে তাকায় না নরেন। সোজাসুজি স্যানেটোরিয়ামের বাগানের একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে পড়ে। প্রভাতের কুয়াসা কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল সূর্যালোক আর সেই আলোতে কাছে দূরে একটা অপরূপ সৌন্দর্যলোকের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। দূর উত্তরে কাঞ্চনজংঘার উঁচু মাথায় রুপোর মুকুটটা চোখধাঁধানো দীপ্তিতে জ্বলছে।

কিন্তু এসব কিছুই দেখছে না নরেন। হাত দুটো ওভারকোটের পকেটে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে বেঞ্চির পেছনে হেলান দিয়ে পা দুটোকে যথাসম্ভব সামনের দিকে প্রসারিত করে দু চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকে।

মন্দ-রৌদ্র শিরশিরে শীতের সকালে দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে যায় নরেন। মনের সামনে ভেসে আসে অনেক দিন আগেকার টুকরো টুকরো অনেক, অনেক ছবি।

প্রাক্-ব্যবচ্ছেদ ঢাকা শহর। রাজার দেউড়িতে নরেনদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। পাশের একতলা বাড়িটা অনেকদিন ধরেই খালি পড়েছিল। হঠাৎ একদিন স্নানের আগে মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় নরেন। সুমুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। একতলা বাড়িটি আর খালি নেই, উঠানের ওপর টাঙানো লম্বা তারে শুকুচ্ছে দু-তিনটি শাড়ি। কথা আর হাসির অল্প গুঞ্জন ভেসে আসে, ভেসে আসে রান্নাঘরে মাছ সাঁতলাবার ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ।

খেতে বসে মা-র কাছে শোনে যে জজকোর্টের কেরাণী ভোলা-

নাথবাবু কায়েতটুলির ভাড়াটে বাসা ছেড়ে এখানে এসে উঠেছেন কাছারী কাছে হবে বলে। বড় মেয়ে ইডেন কলেজে পড়ে, তারও কাছে হবে কলেজ।

দিন কয়েক পরে দোতলার দক্ষিণের ঘরে বসে তানপুরার কান মোচড়াবার সময়ে চমকে ওঠে নরেন। সুরেলা মিষ্টি গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইছে যেন কে। স্পষ্ট, পরিষ্কার নির্ভুল উচ্চারণে কথাগুলো যেন সুরের পাখায় ভর করে দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সুরে সুরে সুরের জালে ভরে যায় ঘর। একটা অব্যক্ত বেদনার চকিত স্ফুরণে প্রাণে বিদ্যুতের ছোঁওয়া লাগে।

মুগ্ধ হয়ে যায় নরেন। স্তব্ধভাবে কান পেতে শোনে অকেনক্ষণ, তারপর গান শেষ হবার আগেই উঠে পড়ে চঞ্চলভাবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায়, মার শোবার ঘরের দুয়ারের সুমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেঝেময় শীতলপাটি বিছানো। ফর্সা রং এর সুশ্রী চেহারা একটি মেয়ে গান গাইছে মাঝখানে বসে। তাকে ঘিরে বসেছে অঞ্জু, মঞ্জু আর রঞ্জু। একটু দূরে মার কাছে বসে একটি ভদ্রমহিলা—বোধ হয় মেয়েটিরই মা, মৃদু কণ্ঠে আলাপ-সালাপ করছেন।

কী করে যেন নরেনের নিঃশব্দ উপস্থিতি টের পায় মেয়েটি। চোখ তুলে একবার তাকিয়েই গানের মাঝখানে থেমে যায়। কর্কশ শব্দ করে থেমে যায় হারমোনিয়াম, খুলে যায় শুনিয়েদের নিমীলিত চোখ।

কলকল করে ওঠে অঞ্জু আর মঞ্জু, "আরে ও তো দাদা, ওকে দেখে লজ্জা পাচ্ছ কেন ভাই? আর দাদাও তো গাইয়ে মানুষ,

তোমার গানের কদর বুঝবে!"

"নাঃ, আজ আর থাক," মুখ নীচু করে আড়চোখে একবার নরেনের দিকে তাকিয়ে বলে মেয়েটি।

নরেনকে দেখতে পেয়ে মা বলেন, "অ নরেন; ইনি হলেন ভোলানাথবাবুর স্ত্রী, আমাদের পাশের বাড়িতে এসেছেন, আর ও হল গে কাঞ্চনা, ওঁর বড় মেয়ে। চমৎকার গলা, কী বলিস?"

গানের গলা সম্বন্ধে সচরাচর সহসা কোন মতামত দেয় না নরেন, তবু কী ভেবে বলে, "হ্যাঁ মা, গলা ভালই, মাজাঘষা করলে আরও ভাল হবে।"

চেঁচিয়ে ওঠে মঞ্জু আর রঞ্জু, "দেখলে কাঞ্চনাদি, বল্লাম না, ভাল না লাগলে কি আর তানপুরা রেখে নীচে আসত দাদা? দাদার এই নীচে আসাটাই তোমার গানের সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট।"

কাঞ্চনার লজ্জারুণ মুখের দিকে একটি বার তাকিয়ে ওপরে চলে যায় নরেন। দোতলার দক্ষিণের ঘরে বসে গলা সাধার উৎসাহ পায় না আর।

পাশাপাশি বাড়ি—ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হয় না। মেয়েদের যাওয়া আসা তো শুরু হয়েছে সেই প্রথম দিন থেকেই। স্বল্পভাষী শান্ত নির্বিরোধ লোক ভোলানাথবাবু কারুর সাতে-পাঁচে থাকেন না। স্ত্রী হেমাঙ্গিনীও চুপচাপ থাকেন, পাঁচজনের সংসারের সব ঝামেলা মিটিয়ে সময় পেলে নরেনের মার সঙ্গে এসে গল্প করেন, কখনো বা নিছক কৌতূহলের বশে উঁকি দেন নরেনের সঙ্গীত সাধনার পীঠভূমি দোতলার দক্ষিণের ঘরটিতে।

কাঞ্চনাও আসে, সহপাঠিনী অঞ্জুর সঙ্গে গল্প করতে করতে

নরেনের ভরাট গলার আশাবরীর আলাপ শোনে উৎকর্ণ হয়ে।

মাস তিনেক পরে, সবাই মিলে গোল হয়ে চা খাবার আসরে যখন সাধারণতঃ নরেনের মেজাজ ভাল থাকে—অঞ্জুই কথাটা তোলে একদিন।

টোস্টের কড়া টুকরোটি এক চুমুকে চাএর সঙ্গে গলা দিয়ে নামিয়ে, গলা পরিষ্কার করে বলে, "কাঞ্চনার ভারী ইচ্ছে তোমার কাছে ক্লাসিক্যাল গান শেখে দাদা!"

গম্ভীর হয়ে থাকে নরেন, কোনো উত্তর দেয় না অঞ্জুর কথার।

মা অঞ্জুর পক্ষ নেন, বলেন, "সত্যি, মেয়েটা গান-পাগল, ঠিক তোরই মত, আর গলাও ভাল, গান গাইছে না সানাই বাজছে দূর থেকে ধরা শক্ত। দে না একটু দেখিয়ে শুনিয়ে, গরীব মানুষ, টাকা দিয়ে ওস্তাদ রাখবার ক্ষমতা নেই ভোলানাথবাবুর।"

চট করে মত দেয় না নরেন, বলে, "দেখি ভেবে।"

ভাববার পালা শেষ হয় দিন কয়েকের মধ্যেই।

বিকেল বেলা। উয়ারীতে মণিকা গুপ্তকে গান শেখাবার টিউশনি সেরে তিক্ত মনে বাড়ি ফিরছিল নরেন। বড় লোকের খেয়ালী আদুরে মেয়ে মণিকা—গান তার নেশা নয়, গান শেখা তার শখ। একটা জলসায় নরেনের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মণিকা। তার পর নরেনের কাছেই গান শিখবার ব্যবস্থা করে তার বাবাকে বলে। হাতখরচা বাবদ মাসিক পঁচাত্তরটি টাকা পেয়ে যাবে ভেবে এবং কতকটা চাপে পড়ে রাজী হয় নরেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই নরেন লক্ষ্য করে যে গানের চেয়ে গায়কের প্রতিই বেশী

অনুরাগ মণিকার।

বিশ্রী লাগে নরেনের, বিশেষ করে বিশ্রী লাগে মণিকার গায়ে পড়া ভাব। সঙ্গীত জগতের অফুরন্ত আনন্দ আহরণ করার চাইতে একটা জৈবিক প্রবৃত্তির দিকে মণিকার বেশী ঝোঁক দেখে বিরক্ত হয় সে।

আজও গান শেখাবার মাঝপথে মণিকার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছে নরেন।

অন্যমনস্কভাবে সাইকেল চালিয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে সহসা ব্রেক কষে নেমে পড়ে নরেন। অল্পের জন্য সাইকেল চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়ে আরক্ত নতমুখে রাস্তার কিনারার দিকে সরে যায় কাঞ্চনা, হাতে একটি বই আর দুটি খাতা। হালকা হলুদ রংএর শাড়িটা ওর ছিমছাম গৌর তনুতে এনে দিয়েছে একটা অনন্য শ্রী।

অপ্রতিভ মুখে নরেন বলে, "আমারই দোষ—"

দীপ্ত চক্ষু দুটি তুলে নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঞ্চনা বলে, "না না, ঘণ্টি শুনতে না পেয়ে আমিই পথের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলাম!"

"ঘণ্টি আমি দিই নি মোটে," জড়তা কাটিয়ে মৃদু হেসে নরেন বলে। বিকেলের পড়ন্ত রদ্দুরে বড় ভাল লাগে কাঞ্চনাকে। গন্ধভারে আমন্থর একটি পুষ্পস্তবক যেন, আর এর পাশে মণিকা যেন রুক্ষ ঋজু দেবদারু, নবযৌবনের পল্লবসম্ভার ছাড়া আর কোন সম্বল যার নেই।

পাশাপাশি হেঁটে চলে নরেন আর কাঞ্চনা। হঠাৎ নরেন বলে

ওঠে, "শুনলাম তুমি নাকি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে চাও আমার কাছে ?"

নীরবে ব্যগ্রমিনতিভরে চোখ তুলে তাকায় কাঞ্চনা। ঐ একটি চাহনিতেই তার সব কথা বলা হয়ে যায়।

এক মাস, দু মাস, ছ মাস কেটে যায়। মনের মত ছাত্রী পেয়ে নিজের বুকে জমানো সঙ্গীতের সুধাভাণ্ড উপুড় করে দেয় নরেন, উজাড় করে দেয় নিজেকে। এক গণ্ডূষে নিঃশেষে টেনে নেয় কাঞ্চনা।

তৃপ্তি আর সুখের আভায় ঝলমল করে নরেনের মুখ। দোতলায় দক্ষিণের ঘরটিতে সঙ্গীত-দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

নরেনের ক্রমাগত অবহেলা আর ঔদাসীন্যের ভাব দেখে আহত হয় মণিকা। তার নবযৌবনকে একটি ফুলের মালার মত গলায় পরে না কেন নরেন ভেবে পায় না সে। উপযাচিকার মনে প্রত্যাখ্যানের বেদনা গভীরভাবে বিদ্ধ হয়। সে যন্ত্রণায় ছটফট করে মণিকা। প্রেম খোঁজে মণিকা, মনের মাঝে নয়, দেহের মাঝে।

বুড়ীগঙ্গার জলে রং এর হোরিখেলা সাঙ্গ করে অস্ত গেছেন সূর্যদেব। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সদর ঘাটের বাঁধানো রাস্তা ধরে অনেকটা দূরে চলে এসেছে নরেন আর কাঞ্চনা। এ দিকটা নির্জন। নদীর ওপারে শুভাঢ্যার ঘন তরুলতার আবেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে দুটি একটি প্রদীপের আলো উঁকি দিচ্ছে। চঞ্চল জলে ছায়ার মত ভেসে যাচ্ছে দু-চারটে পাল তোলা নৌকো। একটা শান্ত নিবিড় স্তব্ধতা নেমে এসেছে চার ধারে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে পতনোন্মুখ হল কাঞ্চনা আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলতেই কম্পমান লতাটির মত নরেনের বুকে এলিয়ে পড়ে কাঞ্চনা। বিদ্যুৎশিহরণ খেলে যায় নরেনের শরীরে।

যে কথাটি অনেক দিনও বলা যেত না, অধরা সেই বাণীর নিঃশব্দ বিনিময় হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

আচ্ছন্নের মত নরেনের বুকে মুখ গুঁজে থাকতে থাকতে এক-সময়ে শিউরে ওঠে কাঞ্চনার সর্ব শরীর। মুখ তুলে জ্বলজ্বলে চোখে নরেনের মুখে তাকিয়ে থাকে। অনেক সাধ আর অনেক কল্পনার আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার বিচিত্র হাসি ফোটে ওর মুখে।

কিন্তু সে শুধু কিছুক্ষণের জন্য। কোন এক আশঙ্কার ছায়া যেন ঘন হয়ে পড়ে কাঞ্চনার সুখ-রক্তিম মুখে। জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে যায় নরেনের উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে, দ্রুতলয়ে ওঠা পড়া বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটি আর্ত সুর, "না না, নরেনদা, এ হতে পারে না, হবার কোনো উপায় নেই।"

চমকে ওঠে নরেন, বলে, "কেন কাঞ্চনা ?"

"সে আমি বলতে পারব না। দূর থেকেই তোমাকে ভালবাসব, কিন্তু কাছের মানুষ হতে পারব না।"

"তুমি ভুল বলছ কাঞ্চনা, ভালবাসাই তো দূরের মানুষকে কাছে আনে, পর হয় আপন।" শান্ত সুরে নরেন বলে, বোঝাতে চেষ্টা করে কাঞ্চনাকে।

কিন্তু আর কোন জবাব দেয় না কাঞ্চনা। পেছনে ঘুরে দ্রুতবেগে হাঁটতে থাকে সেই দিকে, যেদিকে আছে অনেক লোকের মেলা

আর অনেক লোকের জটলার ভিড়।

যেন একটি অশরীরী আকাঙ্ক্ষার দুর্নিবার প্রলোভনকে পেছনে, অনেক পেছনে ফেলে আসবার আশায় জোরে, আরও জোরে ছুটতে থাকে কাঞ্চনা—এত জোরে যে নরেনকে মাঝে মাঝে দৌড়াতে হয় ওর নাগাল পাবার জন্য।

চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ আলোয় আলোময়। দু পাশের দোকান-গুলোতে অসম্ভব ভিড়। একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে নরেন-কাঞ্চনার সামনাসামনি পড়ে যায় মণিকা। দু পক্ষই থমকে দাঁড়ায়।

বাঁকা চোখে ভুরু তুলে কাঞ্চনাকে দেখে নেয় মণিকা। দেখে নেয় ওর পরনের সস্তা দামের তাঁতের শাড়ি, খেলো প্রিন্টের ব্লাউজ, আধ-পুরোনো স্যাণ্ডেল, দু হাতের চারগাছি পাতলা চুড়ি। এ সব দেখতে একটি মাত্র মুহূর্ত লাগে মণিকার। তারপর সোজাসুজি নরেনের কিন্তু-কিন্তু মুখের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলে, "আজ না তোমার আমাদের বাড়ি আসবার কথা নরেন?"

"হ্যাঁ, মানে,—এই কাঞ্চনাকে নিয়ে একটু···" কথা আর শেষ করতে পারে না নরেন।

আগুনের মত জ্বলন্ত একটুকরো হাসি ছুঁয়ে থাকে মণিকার লিপস্টিক ঘষা ঠোঁটের দু পাশে। ভ্যানিটি ব্যাগটা নির্দয়ভাবে মোচড়াতে মোচড়াতে কঠিন ব্যঙ্গের সুরে বলে, "একটু নদীর হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই না? এ রকম ভদ্ররুচি তোমার আছে বলে তো জানা ছিল না!"

পরনের টকটকে লাল শাড়িটার মতই জ্বলতে থাকে মণিকা।

আজ বিশেষভাবে সাজসজ্জা করে অনেকক্ষণ ধরে নরেনের প্রতীক্ষা করেছে সে। তার সেই সাজ আর অনেক দিনের কল্পনার জালে সিঞ্চিত আশার লতিকাটিকে এভাবে ভূমিসাৎ হতে দেখে ক্ষোভের আর অন্ত থাকে না তার। নরেনের উদাসীনতার সত্যিকারের কারণটা খুঁজে পেয়ে অশান্তির ঝড় বয়ে যায় তার মনে।

তিক্ত সুরে কাঞ্চনা বলে, "চল নরেনদা, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।" মণিকার চোখের ও আগুনকে বুঝতে একটুও ভুল হয় না তার।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চল, আচ্ছা মণিকা, কাল যাব তোমাদের বাড়ি।"

ওদের দুজনার অপস্রিয়মান দেহের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজেকে বড় অবসন্ন বোধ করে মণিকা। শরীরের ভার যেন পা দুটো আর রাখতে পারছে না। বুক খালি করে একটা নিঃশ্বাস পড়ে।

ধীরে ধীরে অল্প দূরে রাখা মোটরের দিকে এগিয়ে যায় সে।

রূপসী নয় মণিকা, কিন্তু নিটোল স্বাস্থ্যের সহজ সুন্দর শ্রী একটা সবুজ ঘাসের আভা এনে দিয়েছে ওর সারা দেহে। প্রথম যৌবনের উন্মাদনরসে টলমল করছে তার নবীন চিত্ত, পৌরুষের পানপাত্রে ঢেলে দিতে চায় সেই সুরা। তাই নরেনকে সে শুধু গান শেখাবার যন্ত্র হিসেবেই দেখে না, তাকে দেখে তার যৌবনের কুঞ্জদ্বারে আগত প্রথম অতিথি বলে। নরেনের নির্বিকার মনে আগুন জ্বালার জন্য অপেক্ষা করতে জানে মণিকা।

তাই তার এতদিনের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত হতে দেখে আগুন জ্বলে মণিকার মনে—এ আগুনের জাত আলাদা, প্রকৃতি আলাদা।

সাপের বিষদাঁতের মত তাকে লুকিয়ে রাখে মনের অন্তঃপুরে।

পরদিন গান শেখাতে গিয়ে মণিকার কোনো পরিবর্তন টের পায় না নরেন। বরং অন্যদিনের তুলনায় বেশী যত্নের সঙ্গে নতুন একটা স্বরলিপির সুর তুলতে চেষ্টা করে। গান শেখার ফাঁকে ফাঁকে গল্পও করে। কাঞ্চনার কথা জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রথম প্রেমের রঙীন স্বপ্নে মশগুল নরেন দেখতে পায় না যে তার আবেগের ছোঁওয়া লাগা প্রত্যকটি কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষা-অপমানে কালো হয়ে আসে মণিকার মুখ।

তফাতটা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয় নরেন। মণিকাকে গান শেখানোর ব্যাপারটা যেন নিছক কর্তব্যের বেড়াজাল। প্রতিটি দিনের ছুরি দিয়ে একটি একটি করে জাল কাটে নরেন, কবে সব জাল ছিন্ন হবে, বেরিয়ে পড়বে মুক্ত হয়ে নরেন—তার দিন গোনে সে। অথচ কাঞ্চনাকে গান শেখাতে কতই না আনন্দ। দু জনে সুর মিলিয়ে এক সঙ্গে গান গাইলে যে এমন একটা অতীন্দ্রিয় পুলকোচ্ছ্বাসে হৃদয় প্লাবিত হতে পারে এ তথ্য তার অজানাই ছিল এতদিন। কাঞ্চনার সুগৌর গালে ঘনপক্ষ্ম চোখের পাতার ছায়া কাঁপে, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন গানের সুরে গোলমাল করে ফেলে আত্মবিস্মৃত নরেন।

শুধু গান শেখার সময়েই নয়। নরেনের দক্ষিণের ঘরের সামনে কাঞ্চনাদের খোলা একতলা ছাদে মেঘের মত নিবিড় কালো ভিজে চুলের রাশি শুকুতে আসে কাঞ্চনা আর কেমিস্ট্রির পাতায় আঁকা এ্যাটমিক স্ট্রাকচারের ছবির কথা ভুলে সেই ঘন চুলের অরণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগে নরেনের মনে।

কিন্তু কাছে থেকেও যেন দূরে দূরে থাকে কাঞ্চনা, ধরা দিতে এসেও যেন ধরা দেয় না। কোন এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা যেন তাদের দুজনার মাঝে এসে দাঁড়ায়। সেদিন যে উপায় নেই বলেছিল কাঞ্চনা, তার সেই উপায়হীনতার কারণ জানবার জন্য নিজের মনকে হাজার প্রশ্ন করে নরেন, প্রশ্ন করে কাঞ্চনাকে। কিন্তু এসব প্রশ্নের একটাও জবাব দেয় না কাঞ্চনা, মাটির দিকে চোখ রেখে আঙ্গুল দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকে। ব্যথায় নীল হয়ে যায় ওর মুখ। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার জন্য বড় মমতা বোধ করে নরেন। কাঞ্চনা যেন ঝড়ের মুখে পড়া ক্লান্ত, বিপর্যস্ত পাখিটি, নিজের সবল বক্ষের নীড়ে তাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিতে চায় সে।

মনে মনে একটা কাল্পনিক কারণ খাড়া করে নরেন। ভোলা-নাথবাবু গন্ধ বণিক, আর নরেনরা ব্রাহ্মণ। জাতিভেদের এই দুস্তর বাধাই বুঝি আশঙ্কিত করেছে কাঞ্চনার মন।

মনে মনে হাসে নরেন। যে প্রেমের আলোকরশ্মি জাতিভেদের সামান্য অন্ধকারটুকুও দূর করতে পারে না, কেমন করে অমৃতলোকের সন্ধান দেবে সেই প্রেম?

সময় আর প্রকৃতি নিজের নিজের কাজ করে যায় সবার অলক্ষ্যে দিনে দিনে কাছিয়ে আসে কাঞ্চনা, বুঝিবা তার মনের বাধাকে দূর করেছে সে। প্রেমের এক মুগ্ধ মায়া ক্রমাগত টানতে থাকে তাকে নরেনের দিকে।

নরেন-কাঞ্চনার সম্পর্কের পরিবর্তনটা চোখে পড়ে সবার। অঞ্জু, মঞ্জু, রঞ্জু তিন বোন বেশ খুশী, কিন্তু মার মুখে গাম্ভীর্য নামে।

একাদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। গাছের পাতা দোলানো

অল্প অল্প হাওয়া শরীরের ক্লান্তিটুকু মুছে নিয়ে যায়। দোতলার খোলা ছাতে আলসের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নরেন। নীচে থেকে মঞ্জু-রঞ্জুর তারস্বরে পড়ার নামে গলা সাধার সুর ভেসে আসে, এমন সময়ে গত জন্মদিনে নরেনের দেওয়া নীল শাড়িখানা পরে লঘুপদে কাছে এসে দাঁড়ায় কাঞ্চনা।

হাজার চোখ ইন্দ্রের মত আকাশেরও বুঝি কয়েক লাখ চোখ, ওঠা-পড়া করছে সে সব চোখের পাতা, আর তাদের প্রসন্ন দৃষ্টিতে কাছে দূরে সব কিছুই মনে হয় যেন একটা সুষম গীতিছন্দে বাঁধা। চাঁদের একতারাতে কে যেন কোমল আঙ্গুলের আঘাতে মৃদু ঝঙ্কার তুলছেই অব্যক্ত আনন্দ ফেনিয়ে ওঠে নরেনের বুকের কাছে।

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে কাঞ্চনার বাঁ হাত মুঠো করে ধরে নরেন। সেই ছোঁয়ার অল্প অল্প কাঁপে কাঞ্চনার শরীর।

আরও একটু কাছে সরে আসে কাঞ্চনা, নরেনের কানে তার উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাগে, কাঁপা গলায় কাঞ্চনা বলে, "অনেক দিন ধরেই একটা কথা বলব বলব ভাবছি নরেনদা—"

"কী কথা কাঞ্চনা ?

"সে কথা শোনার পর আমাকে ঘেন্না করবে না তো, দূরে সরিয়ে দেবে না তো ?" মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট সুরে নরেনের কাণের কাছে গুঞ্জন করে কাঞ্চনা।

"ঘেন্না ? তুমি বলছ কি কাঞ্চনা ? প্রেমের অভিষেক বারি দিয়ে যাকে হৃদয়ের রাণী করব ঠিক করেছি তাকে করব ঘৃণা ?" আবেগে গম্ভীর ভরাট গলা নরেনের, চারদিক যেন থমথম করে, "বল কাঞ্চনা, আজ শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক আমাদের।"

এমন সময়ে নীচে থেকে রঞ্জু-মঞ্জুর তার-চীৎকার থেমে যায়। ছাতের সিঁড়ির মুখে দেখা দেন নরেনের মা। একটুখানি ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে রুষ্ট সুরে বলেন,—"নরেন, শুনে যাও—"

চমকে সেদিকে তাকায় কাঞ্চনা, লজ্জায় রাঙা হয়েই ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার মুখ, তারপর মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে নরেনের মার পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে যায়।

নরেন নামে মার পিছু পিছু।

নিজের শোবার ঘরে গিয়ে খাটের ওপর বসেন নরেনের মা। উত্তেজনায় তাঁর বুক ওঠা-পড়া করছে। কিছুক্ষণ নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, "এসব ভাল নয় নরেন, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, বদ্‌নাম রটলে ওর ক্ষতি হবে—"

"কিসের ক্ষতি মা? বিয়ের তো? কিন্তু আমিই তো ওকে বিয়ে করব বলে ঠিক্ করেছি,—" মৃদু কণ্ঠে নরেন বলে।

খাটের পিঠে হেলান দিয়ে বসেছিলেন নরেনের মা। কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসেন, বলেন, "বটে! কিন্তু আমরা বামুন আর ওরা গন্ধবণিক, সেটা জানা আছে কি তোমার?"

"হাসালে মা—" জোরে হেসে ওঠে নরেন, "যাকে বিয়ে করব তার জাতটাও কি জানি না? কিন্তু কী এসে যায় তাতে, বিয়ে তো আমি কাঞ্চনাকে করছি, ওর জাতটাকে তো নয়।"

"কিন্তু কথাটা তুমি উড়িয়ে দিলেও আমরা যে জাত মানি বাবা, ও তো শুধু তোমার বৌ হবে না, এ সংসারের বধূও হবে সে, আমাদের মতামত একেবারে অগ্রাহ্য করতে পার না তুমি—"

মার কাছে গিয়ে বসে নরেন, আস্তে আস্তে বলে, "সন্তানের

সুখ-শান্তির চেয়ে কি তোমার সংস্কারই বড় হবে মা ?”

চট্ করে এ কথার জবাব দিতে পারেন না নরেনের মা। মনে পড়ে অনেক দিন আগে এই নরেন কোলে আসার পরে তিলে তিলে কি ভাবে নিজের সাধ আহ্লাদ সব বিসর্জন দিয়েছেন, সন্তানদের সুখ-সুবিধার জন্য নিজের সুখ-সুবিধাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। দুষ্প্রাপ্য কোনো খেলনার জন্য যেমন ভাবে আবদার করত ছোট্ট নরেন, আজ বড় হয়েও তেমনি ভাবেই একটা সজীব খেলনার জন্য আবদার করছে। সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও বহু আয়াসে ছোট্ট নরেনের সে সব আবদার অপূর্ণ রাখতে পারেন নি, কিন্তু আজ ? আজ কী করবেন তিনি।

মাকে চিন্তামগ্ন দেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নরেন। যে কথাটা এতদিন তার আর কাঞ্চনার মনের নিভৃতে গুঞ্জরণ করে ফিরছিল তাকে আজ বাইরের মুক্ত আকাশ প্রাঙ্গণে মুখর হতে দেখে বড় ভাল লাগে তার।

নরেন-কাঞ্চনার মিলনের বাধাগুলো ক্রমে দূর হয়ে আসে আর কী একটা না বলার ব্যথায় ছটফট করে কাঞ্চনা। নরেনের প্রেমের নাগপাশের উষ্ণ আলিঙ্গন ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেলে তার চৈতন্য। সংজ্ঞা লুপ্তির আগেই কী একটা কথা যেন চীৎকার করে বলতে চায় নরেনকে, কিন্তু পারে না।

হারমোনিয়ামটা দূরে সরিয়ে রেখে মণিকা বলে, “আসছে বুধবার পুরী যাচ্ছি আমরা, চল না আমাদের সঙ্গে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে মজা করে—”

“বুধবার ? কিন্তু বুধবার যে—” বলতে বলতে মণিকার ইস্পাতের

মত ঝকঝকে ধারালো চোখে চোখ পড়াতে থেমে যায় নরেন।

—"তোমার বিয়ে, না? নেমন্তন্ন চিঠি অবশ্য পেয়েছি, বারটা মনে ছিল না। ঐ কাঞ্চনাকেই বিয়ে করছ তো?"

কথার ধারা শুনে অবাক হয়ে যায় নরেন কিন্তু তাকে আরও অবাক করে দিয়ে মণিকা বলতে থাকে, "তা কর, কিন্তু ওর সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ খবর নিয়েছিলে কি?"

"মণিকা?" রক্তিম মুখে চেঁচিয়ে ওঠে নরেন।

কঠিন ব্যঙ্গে বিকৃত হয়ে যায় মণিকার মুখ। কেটে কেটে বলে, "চেঁচিও পরে, কথাটা শুনে নাও আগে—"

জয়ের উল্লাসভরা মুখে দ্রুতকণ্ঠে অনেক কথাই বলে যায় মণিকা, স্তব্ধভাবে শুনতে থাকে নরেন। শুনতে শুনতে অনুরাগের রংএ রাঙানো অন্তর তার কালি হয়ে যায়।

বছর তিনেক আগে। তখন ব্রাহ্মণবাড়িতে ছিল কাঞ্চনা। এক অন্ধকার রাতে, কাঞ্চনার বাবার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে দরমার বেড়া কেটে গামছায় মুখ বেঁধে কাঞ্চনাকে অপহরণ করে দুর্বৃত্ত দল। মাস দুই পরে ময়মনসিংহের ইকড়াটিয়া গ্রাম থেকে বোরখা পরা কাঞ্চনাকে উদ্ধার করে অনুসন্ধানকারী পুলিসের দল। লজ্জা আর অপমানের ভয়ে এ নিয়ে আর বেশী নাড়াচাড়া করেন নি কাঞ্চনার বাবা।

সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে নরেন, রক্তের মধ্যে আদিম বন্যতা জাগে, কোনো কিছু টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য দু' হাতের আঙ্গুলগুলো বেঁকে যায়। কারুর ওপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়বার জন্য শরীরের সমস্ত শক্তি যেন পা

দুটোতে কেন্দ্রীভূত হয়।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় সব। পশ্চিম আকাশের গায়ে নানা বিচিত্র ছবি এঁকে আবার তাকে মুছে দিয়ে ডুব দেয় ক্লান্ত সূর্য। নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে যায় চারদিক। ঠিক তেমনি অন্ধকার ঘনায় নরেনের শূন্য মনে।

অনেকক্ষণ পরে মণিকার জলজলে চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে নরেন বলে, "কিন্তু তুমি এসব জানলে কি করে মণিকা?"

"আমার বাবা যে পুলিস সুপার সে কথা কি ভুলে গেলে?" বলে একটু সময় চুপ করে থেকে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠে মণিকা, "তোমার জন্য নরেন, তোমাকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্য অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে এ সব খবর সংগ্রহ করেছি আমি।"

সত্যিই বুঝি বাঁচে নরেন। তার মনের অনুরাগের মন্দিরটি কোন এক কালা পাহাড় যেন ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়।

বুধবারে বিয়ে করবার পরিবর্তে মণিকাদের সঙ্গে পুরী রওনা হয়ে যায় নরেন।

আজ এতদিন পরে দার্জিলিংএর হিমশীতল কুহেলী ঘেরা পার্বত্য পথে সুখে-গৌরবে ঝলমল কাঞ্চনাকে দেখে নিজেকে প্রশ্ন করে নরেন,—সত্যিই কি বেঁচে গেছে সে? এই যে জীবনভরা এক মহা-শূন্যতা দেশ থেকে দেশান্তরে তাড়া করে নিয়ে চলেছে তাকে, একে কি বাঁচা বলে? দৈহিক শুচিতার একটা অন্ধ সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে না পেরে সে কি তলিয়ে যায় নি শূন্যতার অতল গহ্বরে?

× দাগ
×
×
×
×
×
×
×
×
×

সংসারের কাজের চাকাটা নিশ্ছিদ্র ; অনেকটা ঢালের মত সারাদিন ধরে রক্ষা করে তাকে। কিন্তু মিতা জানে যে সেই অন্ধ, বোবা আতঙ্কটা শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দে ওৎ পেতে বসে আছে আশে-পাশে কোথাও। দেখা যায় না তাকে, তবু তার উপস্থিতির কাঁটা সারাক্ষণ খচখচ করে মিতার মনে।

সত্যিই আর পারে না মিতা, পারে না আর হৃদয়ের এই বিপুল ব্যথার ভার বইতে। নিরবধি কালকে দণ্ড ক্ষণ পল-এ বিভক্ত করেছে পৃথিবীর মানুষ, কিন্তু মিতার মনে হয় যে এ সব ভাগ সত্যিই অর্থহীন। তার মনে হয় যেন তার চার পাশের ঘনবদ্ধ আতঙ্কের বর্মে ঠেকে মহাকালও তার গতি হারিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

হাঁপিয়ে ওঠে মিতা। ভয়ের মেঘে ঢাকা মনের আকাশ ভেদ করে সুখ ও শান্তির সূর্যালোক পৌঁছতে পারে না তার হৃদয়ে।

অথচ এই সেদিনও আর পাঁচজন তরুণীর মত হেসে খেলে বেড়িয়েছে মিতা। সিনেমা দেখেছে, বন্ধুদের সাথে ঠাট্টা তামাশা করেছে,—কপট ক্রোধের ছদ্ম কলহে স্বামী কল্যাণকে নাস্তানাবুদ করেছে।

ছোট্ট শহর নিষ্কাশনপুর। ঢালাই লোহার বিরাট কারখানাটা এশিয়া বিখ্যাত। মসৃণ জি. টি. রোড বাঁকা চাঁদের মত শহরের পাশ দিয়ে চলে গেছে তার অঙ্গে অঙ্গে বহু বঙ্কুতার ঢেউ তুলে। এই পথেরই এক পাশে একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে থাকে মিতা আর কল্যাণ। দক্ষিণ দিকে তাকালেই চোখে পড়ে অনেক দূরে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নীলিম মেঘের টুকরোর মত বাঁকুড়ার খণ্ড-খণ্ড পাহাড়গুলি। সকাল বেলায় তাদের মাথায় সাদা কুয়াসার স্বচ্ছ কিরীট ঝক ঝক করে।

আলো আর জল নেই এই ভাড়াটে বাড়িগুলোতে। রাস্তা পেরিয়ে বেশ খানিকটা দূরে কোম্পানীর জলের কল। কারখানার মজুরেরা অবসর সময়ে বাড়ি বাড়ি জল দিয়ে বেশ দু পয়সা বাড়তি রোজগার করে।

মিতাদের জলভারী সুখুই খবরটা দিল। খাবার জলের কুঁজো আর রান্নাঘরের বালতিতে জল দিয়ে খালি টিনটার দড়ি বাঁকের মাথায় লাগাতে লাগাতে সুখু বলল, "ও বাড়িটা ভাড়া হয়ে গেল মাইজী—"

আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ পরছিল মিতা, হঠাৎ সুখুর কথায় হাত কেঁপে গিয়ে টিপটা বাঁকা-টেরা হয়ে গেল। তোয়ালে দিয়ে সেটা মুছে বারান্দায় বেরিয়ে প্রশ্ন করল, "কোন্ বাড়িটা রে সুখু—"

"ওই যে চড়াই-এর ওধারে—" হাতের ইশারা করে সুখু বলল।

দূরে বেশী নয়, তবে মাঝের রাস্তাটুকু উটের পিঠের মত উঁচু হয়ে থাকার জন্য দেখা যায় না বাড়িটা। বলতে গেলে নিকটতম

প্রতিবেশী।

কৌতূহলের আলো জ্বলে ওঠে মিতার দু চোখে, "ওগো শুনছ—" বলে ঘরের ভেতর তাকায় সে।

রবিবারের সকাল। ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল কল্যাণ, আচমকা ডাকে হাতটা কেঁপে গেল একটু, খুচ করে গাল কেটে একটা রক্তিম সরল রেখা ফুটে উঠল শ্বেত শুভ্র সাবানের ফেনার ভেতর দিয়ে। বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে কল্যাণ বলল, "আঃ দিলে তো গালটা কেটে—"

"ও, তুমি দাড়ি কামাচ্ছিলে বুঝি? খেয়াল ছিল না—" বলে অপ্রতিভ মুখে চুপ করে থাক মিতা।

একটু পরে সগু-কামানো মুখে ক্রীম ঘষতে ঘষতে বারান্দায় এসে নরম সুরে কল্যাণ বলে, "কী বলছিলে বল—"

"সুখু বলছে ঐ খালি বাড়িটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে—"

"সে তো আমি জানি, নতুন অ্যাকাউন্টেন্ট এসেছে বিকাশ রায়, সেই নিয়েছে ও বাড়িটা—"

"কী? কী নাম বললে?" প্রায় চিৎকার করে ওঠে মিতা।

অবাক চোখে তার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কল্যাণ বলে, "বিকাশচন্দ্র রায়,—কেন, চেনো নাকি তাকে?"

চোখের পলকে মিতার মুখের সবটুকু রক্ত সরে যায়। মুখের চেহারাটা লুকোবার জন্যই বুঝি কল্যাণের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চট্ করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে সে। উনুনের ওপর টগবগ করে ফুটতে থাকা ভাতের হাঁড়ি থেকে হাত দিয়ে ভাত তুলে অন্যমনস্কভাবে টিপে পরীক্ষা করতে গিয়ে আঙুল দুটো পুড়িয়ে ফেলে প্রায়।

ঝড় ওঠে মিতার বুকে,—স্মৃতির ঝড়। বর্তমানের অনেকগুলো দিনের ঝরাপাতা উড়ে যায় সেই প্রবল বাতাসে, বেরিয়ে পড়ে তলায় চাপা পড়ে থাকা দু বছর আগের শক্ত মাটি।

সে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি তরুণ-তরুণী। বিকাশ আর মিতা।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে বাজারের থলে হাতে নিয়ে মাংস কিনতে বেরিয়ে পড়ে কল্যাণ আর রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দক্ষিণের ঘন সবুজ ধান ক্ষেতের ওপর জ্বলন্ত সূর্যের আলোর আলপনা দেখতে দেখতে কত কথাই না ভেসে এসে ভিড় করে মিতার মনে।

মনে পড়ে প্রথম প্রেমের তীব্র জ্বালাময় দিনগুলি। অতৃপ্তি, সুখ, উদ্বেগ আর বেদনা মেশা বিচিত্র সে অনুভূতি; আকণ্ঠ পান করতেও যেন সে তীব্র পিপাসা মেটে না। বাপ-মার চোখ এড়িয়ে কত না দুঃসাহসিক অভিযানের কথা মনে ভেসে আসে।

প্রথম যেদিন অতর্কিতে তার হাতটা চেপে ধরল বিকাশ, সেদিন বিপুল হর্ষ তার হৃদয়ের তল থেকে উঠে কাঁপিয়ে দিয়েছিল মিতার সর্বশরীর, কাঁপা ভীরু চোখে একবার বিকাশের জ্বালাভরা চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। ঠিক তখনি মেয়েদের সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি শক্ত করে দিয়েছিল তার বেপথু দেহ। এক ঝটকায় বিকাশের হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়েছিল সে।

কিন্তু ভালোলাগাটুকু ফেলে যেতে পারে নি।

তারপর আস্তে আস্তে কি করে যেন বিকাশের সঙ্গে মেলামেশা সহজ থেকে সহজতর হয়ে এল। অন্তরঙ্গতার একই সুরে দুজনার হৃদয় অনুরণিত হতে লাগল।

ছুটির পর কলকাতার কলেজে পড়তে চলে গেল বিকাশ আর নিশীথশয্যায় শুয়ে অশ্রুজলের অনেকগুলো মালা গাঁথল মিতা।

বিকাশের প্রথম চিঠিখানাও বুঝি তার প্রথম করস্পর্শের মতই মধুর। স্পর্শের স্মৃতি আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে কিন্তু কাগজের বুকে আঁকা হৃদয়ের বাণী প্রতি দৃষ্টিপাতেই নতুন সুর তোলে।

ভীরু পাখির কম্পিত কূজনের মত ছোট্ট চিঠি লেখে মিতা।

ছুটির দিন ঘনিয়ে আসে। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়। বিকাশ ফিরে আসে তার মফঃস্বল শহরে।

মেয়েদের মনের সহজাত বাধাগুলো কাটিয়ে কেবলই এগিয়ে যেতে চায় বিকাশ, শুধু আশ্লেষ চুম্বনের মায়াজালে আটকে থাকতে চায় না। তখন 'চাই না' 'চাই না' করলেও নিজে ভাল লাগার তীব্র যন্ত্রণা এখনো মনে পড়ে মিতার। প্রথম বলেই বুঝি সেই স্মৃতিগুলি এমন জ্বালার আখরে মনের পাতে আঁকা হয়ে রইল চিরদিনের মত।

কিন্তু তবু সেই চরম পরীক্ষার দিনে বিকাশকে ঠেকিয়েছিল সে। বন্য জন্তুর মত তার চোখের ক্ষুধার্ত চাহনি দেখে ভয় পেয়েছিল মিতা। বুঝি সেই চোখের আয়নায় দেখতে পেয়েছিল সর্বনাশের বিকট চেহারার প্রতিচ্ছবি।

রূঢ় প্রত্যাখ্যানে ফিরিয়ে দিয়েছিল বিকাশকে। আর মেঘের ভ্রূকুটি-আঁকা আরক্ত মুখে নিষ্ফল কামনার দাহে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে গিয়েছিল বিকাশ।

দু জনের বিয়ের প্রস্তাবও উঠেছিল। মেয়ের ভাব-সাব দেখে

তুলেছিলেন মিতার মা। কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না বিকাশের জবরদস্ত বাবা।

অসবর্ণ বিয়েতে মত নেই তাঁর, তা ছাড়া গরীব বিধবার মেয়েকে পুত্রবধূরূপে পাবার কল্পনাও করতে পারেন না তিনি। ছেলেকে ডেকে শাসন করলেন কঠোরভাবে।

বন্ধ হল তাঁর অনভিপ্রেত এই মেলামেশা।

মিতা শুধু স্তব্ধ হয়ে শুনল সব, দেখল সব। দুরন্ত অভিমান হল বিকাশের ওপর। কেন সে দৈনিন্দন জীবনের গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল না যে মিতাকে আমি ভালবাসি, হৃদয়লক্ষ্মীকে আমি গৃহলক্ষ্মী করতে চাই। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের অমিতবিক্রমে কেন সে ভেঙ্গে ফেলল না লোকাচারের তুচ্ছ হরধনু!

কিন্তু এর কদিন পরেই বিকাশের ব্যবহারে অবাক হয়ে গিয়েছিল মিতা। দিব্বি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে বিকাশ, কিছুই যেন ঘটে যায় নি তার জীবনে। মিতার সঙ্গে তার বিয়ে হোক বা না হোক, তার জন্য কোন মাথা ব্যথাই নেই তার। পাশের বাড়ির অষ্টাদশী লিলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ ভাব জমিয়েছে সে।

দুরন্ত ক্রোধে মিতার বুকের ভেতরটা যেন পুড়ে গিয়েছিল। স্বার্থপরতা আর শঠতার নগ্ন চেহারাটা দেখে ভয় পেল সে। গোটা পুরুষ জাতটাকেই মধুলোভী ভ্রমর বলে মনে করল।

কিন্তু তার বছরখানেক পরেই, কল্যাণের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে মিতা বুঝেছে যে একটিমাত্র পুরুষকে দিয়েই সমস্ত পুরুষ জাতটাকে বিচার করা চলে না। এতদিন পরে সুখের তৃপ্তি আর শান্তির ছায়াতে বসে কল্যাণের গভীর প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে

পেরেছে মিতা।

আর ঠিক তখনি তার শান্তি-সুখের নিস্তরঙ্গ জলে বিকাশের আগমন বার্তাটা একটা ঢিলের মত পড়ে ভয়ের কাঁপা ঢেউ তুলে দিয়েছে মিতার মনের চারধারে।

আতঙ্কে হিম হয়ে আসে তার সর্বশরীর।

মনে পড়ল বিয়ের ঠিক আগের দিনে তাদের শেষ নির্জন সাক্ষাতের কথা।

ভয় দেখিয়েই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল বিকাশ। নিরুপায় হয়ে তাতে রাজী হয়েছিল মিতা।

নিষ্ফল ক্রোধে সমস্ত বুক খাণ্ডবদাহনের মত জ্বলছে। গম্ভীর থমথমে মুখে দেখা হওয়া মাত্র প্রশ্ন করেছিল বিকাশকে, "কেন আমাকে বিরক্ত করছ বারে বারে? সে সব তো চুকে গেছে কবে। এবারে শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে—"

উত্তরে দাঁত বার করে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল বিকাশ, বলেছিল, "তোমার ও সতীপনার দর্প এক সেকেণ্ডে ভেঙ্গে দিতে পারি, তা জান?"

"কেমন করে?" অন্ধকারে অবোধ্য ভয়ে কাঁপাস্বরে বলেছিল মিতা।

"এই করে—" পকেট থেকে লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বার করেছিল বিকাশ। কলকাতায় পড়তে গেলে এক বছর আগে যত চিঠি বিকাশকে লিখেছিল মিতা তার একটাও হারায় নি বিকাশ। লাল ফিতেটা যেন একটা বিষাক্ত সাপের মত ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর চোখে অপলক চেয়ে আছে মিতার দিকে।

তার প্রথম প্রেমের অন্তহীন আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরা চিঠিগুলির দিকে তাকিয়ে হিম হয়ে গিয়েছিল মিতার বুকের রক্ত। হাত-পা এসেছিল অবশ হয়ে।

সেদিন আর প্রতিরোধ করতে পারে নি মিতা, ফেরাতে পারে নি বিকাশকে অন্য একদিনের মত। নারীত্বের চরম অবমাননাকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিল।

কিন্তু সর্বস্ব বিকিয়েও সেই চিঠির তাড়া ফেরত পায় নি মিতা। ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেগুলো নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল বিকাশ।

এতদূরে, নিষ্কাশনপুরে পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করেছে বিকাশ।

ঘোর দুঃস্বপ্নের মত সে-রাত্রের স্মৃতি তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে ফুটে ওঠে মিতার বিড়ম্বিত মনে। দিনের উজ্জ্বল আলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসে চোখের সামনে থেকে, মুছে যায় রান্নাঘরের তাক, জিনিসপত্র, উনানে বসানো ভাতের হাঁড়ি।

অনেকক্ষণ পরে পোড়া লাগা ভাতের গন্ধে নিজের মধ্যে ফিরে আসে সে। তাড়াতাড়ি হাঁড়ির পোড়া ভাতগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে কল্যাণ আসবার আগেই আবার নতুন করে ভাত চাপিয়ে দেয় উনানে।

বিকেল বেলা।

চা খাওয়ার পর কল্যাণ প্রস্তাব করে, "চল, সিনেমায় যাই। ভাল বই এসেছে—তীর্থাঞ্জলি—"

"না না, আমি যেতে পারব না, তুমি যাও—" তাড়াতাড়ি বলে

ওঠে মিতা।

ভূতের মুখে রামনাম! আশ্চর্য হয়ে মিতার মুখে তাকায় কল্যাণ। নিজে থেকে সিনেমায় যাব না বলছে সিনেমা-পাগল মিতা! নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না কল্যাণ।

কিন্তু সত্যিই গেল না মিতা। বিকাশের সঙ্গে পথে বা সিনেমা-হলে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না সে।

শুধু সিনেমা বলেই নয়, বাইরে বেরুনো একেবারেই ছেড়ে দিল মিতা, ছেড়ে দিল মহিলা-মহলে যাওয়া।

আগে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই কাছাকাছি পরিচিত বাড়িতে বেড়াতে যেত ওরা দুজনে। কখনো বা যেত বরাকর নদীর ওপর ব্রীজে বেড়াতে, কখনো বা সাহেবদের গলফ খেলার মাঠে সবুজ ঘাসের গালিচায় পা ডুবিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াত ওরা দুজনে।

বন্ধ হল সেসব। নিভে গেল সে সব আনন্দদীপ্ত ক্ষণমুহূর্তগুলি। বন্ধ হল কাপড়ের বা মনোহারী দোকানে গিয়ে শৌখিন কিছু কেনা-কাটা।

সব কিছুই ত্যাগ করে মিতা। তবু অন্ধ, বোবা ভয়টা পিছু ছাড়ে না তার, বুকের ওপর চেপে-বসা ভীষণ পাষাণ ভারাটা নামে না।

বিকাশের সঙ্গে হঠাৎ দেখার আগুনে তার সুখের নীড় বুঝি বা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে একদিন—দুশ্চিন্তার এই তীক্ষ্ণ কাঁটাটা মিতার মর্মে বিঁধতে থাকে অবিরাম।

চিন্তিত হয়ে পড়ে কল্যাণ। পাখির মত কাকলিমুখর মিতা

কেন হঠাৎ এমন স্তব্ধ হয়ে গেল ? কোথায় গেল তার কথায় কথায় ঝরণাধারার মত উচ্ছল আনন্দমুখর হাসি,—হালকা পাখির মত সব সময়ে এঘর ওঘর ঘুর-ঘুর করা !

দুবার না ডাকলে আর সাড়া পাওয়া যায় না তার। আবার অচমকা ডাকলে হঠাৎ যেন দারুণভাবে চমকে ওঠে সে। তার অন্তর্লোকের গভীরে কী যেন এক বিপুল পরিবর্তন এসেছে যার নাগাল পায় না কারখানায় খেটে-খাওয়া শ্রমক্লান্ত কল্যাণ।

কিন্তু শরীরের দাবি পূর্ণ না করলে ক্ষুণ্ণ হয় স্বাস্থ্য, স্বেচ্ছাবন্দীত্ব ডেকে আনে রোগ। হজমের গোলমাল, বুকের ধড়ফড়ানি বেড়েই চলে মিতার। দিনে দিনে রোগা হতে থাকে সে। তার স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি মলিন থেকে মলিনতর হতে থাকে।

কোথাও যে একটা কিছু ঘটেছে তা স্পষ্ট অনুভব করে কল্যাণ। কিন্তু তার বোধের বাইরেই থেকে যায় সে রহস্য। শত প্রশ্নেও নির্বাক থাকে মিতা।

বিভ্রান্ত কল্যাণ তার এতদিনের সুখী দাম্পত্য-জীবনের অবিরত ছন্দ-পতনের মূল হাতড়ে বেড়ায় অন্ধকারে।

"মিতা কী হয়েছে তোমার বলবে না আমাকে ?" অনেকবার-করা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে কল্যাণ। অন্ধকারে মিতার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততর ছন্দ বুঝতে পারে কল্যাণ। আরও কাছে টেনে নেয় মিতাকে, তার ঘন চুলে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, "বল মিতা,—আমার কাছে লুকিও না তুমি—"

হঠাৎ শক্ত হয়ে যায় মিতার শরীর। একটু পরে কাঁপা সুরে বলে, "ওগো আমার একটা কথা রাখবে ? বল রাখবে—"

আশ্চর্য হয়ে কল্যাণ বলে, "তোমার কোন্ কথাটা রাখি না বল তো?"

"এ জায়গাটা বিচ্ছিরি, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—দূরে, অনেক দূরে—" ফিস ফিস করে মিতা বলে।

"সে কি! চাকরি?"

"চাকরি কি আর পাবে না আর কোথাও?" আহত স্বরে মিতা বলে।

হো হো করে হেসে ওঠে কল্যাণ, বলে, "খেপেছ, দেখছ না চাকরির বাজার—একটা খালি হলে পাঁচ হাজার দরখাস্ত পড়ে, তা ছাড়া নিষ্কাশনপুর দোষ করল কি? খাসা স্বাস্থ্যকর জায়গা, তুমিই তো এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলে—"

আর কথাটি বলে না মিতা। নিশ্বাস চেপে পাশ ফিরে শোয়।

পরদিন সকালে উঠেই ডাক্তার-বন্ধুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে কল্যাণ। মিতার স্বাস্থ্য তার এক মহা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা ছাড়া তার খাপছাড়া সব কথাবার্তাগুলোও যেন কেমন-কেমন।

ডাক্তার আসেন একদিন। ভাল করে পরীক্ষা করেন মিতাকে ভিজিটের টাকা পকেটে নিয়ে চলে যাবার আগে মৃদু হেসে কল্যাণকে লক্ষ্য করে বলেন, "মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন কবে?"

"মিষ্টি?"

স্মিত হাসির সঙ্গে কল্যাণের কানে কানে যে কথাটি তিনি বলেন তা শুনে বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে যায় কল্যাণের দেহে-মনে।

ভাবনা আর আনন্দের দ্বিমুখী স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় কল্যাণ। তার পরেই ছুটে যায় মিতার কাছে। নীল আকাশের শীর্ণ চন্দ্রলেখার মত খাটে শুয়ে আছে মিতা। মুখে তার বিচিত্র হাসির রেখা।

তা হলে মিতাও জানে! আনন্দের ঢেউ বুক থেকে গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে কল্যাণের। মিতার শুষ্ক অধরপুটে প্রাগাঢ় চুম্বনের রেখা এঁকে দেয়। অজস্র আদর করেও মন ভরে না তার।

কিন্তু শুধু আনন্দই নয়, দায়িত্বও আছে। নানা মাপের ওষুধের শিশি জড়ো হয়। ডাক্তারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে কল্যাণ।

এর পরের কয়েকটা দিন যেন আগের সেই ভাবনাহীন আনন্দ-মুখর মৃত দিনগুলিই তাদের প্রেতশয্যা ছেড়ে উঠে আসে। সবই ভাল, সবই ঠিক, তবু যেন কোন এক দুর্নিরীক্ষ্য বাধা তীক্ষ্ণধার অসির মত তাদের নিবিড় মিলনের মাঝখানে জেগে থাকে।

কেটে যায় আরও কয়েকটি দিন।

এই প্রথম। তাই মিতাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যেতে চান মিতার মা।

টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্সে তুলছিল মিতা। এই শ্বাস-রোধকারী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনায় মন তার প্রসন্ন। গুন গুন করে দু-একটি গানের কলি আবৃত্তি করছে কাজের সঙ্গে সঙ্গে।

বিকাশের সঙ্গে দেখা হয় নি তার, কিন্তু দেখা হবার ভয়টা রয়েছে। এখান থেকে দূরে সরে গেলে সে ভয়টাও আর থাকবে না। ভাবনামুক্ত মনে আবার জাগবে প্রসন্নতার আভা। কল্যাণকেও

তখন অন্য জায়গায় চাকরি নিতে রাজী করাতে পারবে। হুঁঃ, পুরুষ-মানুষের আবার চাকরির ভাবনা!

বাইরের আকাশে তখন শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ উজ্জ্বল বিকেলকে সন্ধ্যার ম্লান ধূসতরা দিয়ে ঢেকে দিয়েছ। থেকে থেকে ফুলঝুরির মতো এক-আধ পশলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ রাস্তার দিকের বারান্দা থেকে কাকে যেন আহ্বান করে কল্যাণ. "চলে আসুন, ছুটে চলে আসুন আমার বারান্দায়—চেপে বৃষ্টি আসছে, ভীষণ—"

ভারী পায়ের অপরিচিত শব্দ শুনতে পায় মিতা, শুনতে পায় চেয়ার টানার কর্কশ শব্দ।

পরক্ষণেই কল্যাণ বলে, "এঃ হে, একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি, জামা-জুতো সব সপসপ করছে ; ওগো শুনছ—বাইরে এস তো একবার—"

দরজার পর্দার ওপারে মিতার শাড়ির ঝিলিক দেখে আবার বলল কল্যাণ, "বিকাশবাবু এসেছেন, ভিজে ঢোল একেবারে—একটা তোয়ালে-টোয়ালে—"

"না না, কেন আবার বিরক্ত করছেন ওঁকে, এই তো বেশ আছি—" বিকাশের মৃদু কথাটি কানে যায় না মিতার। তুমুল ঝড়ে বেতস-পাতার মত কাঁপতে থাকে ওর শরীর, জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্য সব কিছু আচ্ছন্ন করে একটা কথাই দুন্দুভিনাদে কানের কাছে বাজতে থাকে—এসেছে, বিকাশ এসেছে, তার সব সতর্কতা, সব সাবধানতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হানা দিয়েছে তার সুখের মন্দিরে।

একটা দুরন্ত ভয় প্রবল ঝটিকার ওপার থেকে তার কালো পাখায়

ভর করে ঝাপ্টা মারতে মারতে উড়ে আসছে জ্যা-মুক্ত তীরের মত।

প্রাণপণে নিজেকে সামলায় মিতা। মুঠো করে পর্দা চেপে-ধরা হাতটা নামিয়ে নেয়। কোথা থেকে যেন প্রবল সাহস জমা হয় তার বুকে। ভাবে, যা হবার হোক, খসে পড়ুক সব অনিশ্চয়তার নাগপাশ তার মন থেকে। কিন্তু বিকাশকেও ছাড়বে না সে আজ, অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়বে, দেখবে আজ কল্যাণের দৃপ্ত পৌরুষ তাকে রক্ষা করে কি না।

পর্দাটা তুলে বারান্দায় পা বাড়ায় মিতা। রক্তহীন পাংশু মুখে অন্ধ চোখে তাকায় অদূরে দাঁড়ানো মনুষ্যমূর্তির দিকে। চোখে বুঝি আর পলক পরে না তার।

"মিতা, ইনিই আমাদের প্রতিবেশী বিকাশবাবু—ও কি ও কি—"

একলাফে ছুটে এসে মিতার পতনোন্মুখ দেহখানা ধরে ফেলে কল্যাণ। পাঁজা কোলা করে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটে শুইয়ে স্মেলিং সল্টের শিশিটা নাকের কাছে ধরে।

কিন্তু অজ্ঞান হবার পূর্ব-মুহূর্তে যা দেখবার যা জানবার দেখে জেনে গেছে মিতা।

ভয় করবার আর কিছু নেই তার, কারণ বারান্দায় দাঁড়ানো ভদ্রলোকটিকে কস্মিন্‌কালেও দেখে নি মিতা।

এ এক অন্য বিকাশ রায়।

× আশ্রয়
×
×
×
×
×
×
×
×
×

আকাশের আঙিনায় তারার বাতিগুলো জ্বলে উঠবার একটু আগে খস্‌স্‌ শব্দ ক'রে নৌকার গলুইটা বিলের ধারের নরম মাটিতে গেঁথে গেল। গলুই-এর কাছেই কাঠের তক্তার ওপর লগি হাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ইয়াদালি। হঠাৎ নৌকা থামার তালটা সামলে নিয়ে লগিটা নরম কাদায় গেঁথে ফেলে লাফ দিয়ে পড়ল সমুখের নরম মাটিতে। নৌকার পেটে জমে থাকা জলের আন্দোলন থামে নি তখনও, অল্প অল্প কাঁপছে নৌকাটা। মাটিতে নেমেই গলুইটা দু'হাতে চেপে ধ'রে একটানে প্রায় আধখানা নৌকা ডাঙায় তুলে নিল ইয়াদালি. তারপর বিলের বুক থেকে উঠে আসা প্রবল বাতাসে কম্পিত কালো দাড়িভর্তি মুখ ফিরিয়ে বলল, "আসেন ডাক্তারবাবু, ডাইন দিকে লামেন—কাদা লাগবো না—"

নতুন নিউকাট জুতোয় যেন কাদা না লাগে, অতি সন্তর্পণে কোঁচা সামলে নৌকা থেকে ডাঙায় নামে ডাক্তার অধীর বোস। পেছনে পেছনে চেক চেক লুঙ্গি পরা, খালি গা কাসেম আলি নেমে আসে কালো রং-এর ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে।

মন্দা তাল গাছটার বাঁ-পাশ দিয়ে, দু'ধারের পাট গাছের

অরণ্যের ভেতর দিয়ে, আলের সরু পথটা দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা তিন জন। অধীরের মাথা ছাড়িয়ে আরও আধ হাত উঁচু পাট গাছগুলো যেন একটা দুর্ভেদ্য যবনিকার মত সমস্ত পৃথিবী ঢেকে দিল ওদের চোখের সুমুখ থেকে। পাট গাছের বড় বড় পাতায় জমা জলবিন্দুগুলি অধীরের ধোপদোস্ত পাঞ্জাবী আর ধুতি দিল ভিজিয়ে। ক্ষণ-পূর্বের এক পশলা বৃষ্টির স্মৃতি সর্বাঙ্গে বহন ক'রে অসংখ্য পাট গাছের উর্দ্ধভাগ আন্দোলিত ক'রে বেলাই বিলের বুক-জুড়ানো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আপন মনে।

কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার মতো মনের অবস্থা নয় এখন অধীরের। সন্দেহ-কুটিল চোখে বার বার ষণ্ডামার্কা চেহারার সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকায় সে, মনে মনে বেশ জানে যে এখানে যদি তাকে মেরে পুঁতে রাখে মাটিতে কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। অত্যন্ত উর্বর জমিতে আরও একটু সারের সঞ্চার হবে শুধু।

ডাইনে বাঁয়ে দু'টি পুকুর পদ্মপাতায় ঢাকা। তার পর একেবারে ফাঁকা মাঠ। নধর-পুষ্ট গরুগুলো ফিরে যাচ্ছে গোয়ালে। তারও পরে পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট আঙিনায় ঢুকল ওরা।

ব্যাগটি মাটিতে রেখে ভেতর থেকে একটা ভাঙা চেয়ার নিয়ে এল কাসেম।

"বসেন ডাক্তারবাবু—" আপ্যায়নমুখর ইয়াদালির পানের ছোপলাগা দাঁত ক'টা কালো দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে একবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যায়।

চুপচাপ চেয়ারে ব'সে একটা সিগারেট ধরায় অধীর। ইয়াদালি চলে গেল অন্দরে—রুগী দেখাবার ব্যবস্থা করতে।

পাঁচ-সাতটা মুরগী এক পাল বাচ্চা নিয়ে ধান খুঁটে খাচ্ছে সমস্ত আঙিনাময়। কক্ কক্ শব্দ করছে ওরা। অধীরের পেছন দিকে খড়ের চালের তিন-চারটি মাটির ঘর। মাটির দেওয়াল, ছোট ছোট জানলাগুলি চ্যাটাই-এর আবরণে ঢাকা। তারই ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোকের কয়েকটা বাঁকা-চোরা রশ্মি মাটিতে এসে পড়েছে।

বাইরে বেশ ঘন হয়ে নেমেছে সন্ধ্যা-উত্তর অন্ধকার।

ধোঁয়ায় কালো লণ্ঠনটি হাতে ইয়াদালি বেরিয়ে আসে, অধীরের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বলে—"আসেন ডাক্তারবাবু—"

পাট-শোলার বেড়ার ওপারে এই আঙিনারই ক্ষুদ্রতর অংশ। এখানে-ওখানে উচ্ছিষ্ট আর ভাঙা ডিমের খোলা ছড়ান। ছাই ছাই রং-এর একটা বেড়াল এটা-ওটা ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে।

পূব-দুয়ারী বড় ঘরটায় ঢুকল ওরা। দেয়াল-ঘেঁষা নড়বড়ে তক্তাপোশের ওপর শুয়ে আছে রোগী নয়, রোগিণী। লম্বা ঘোমটায় মুখখানা ঢাকা।

কাছে এসে দাঁড়িয়ে নাড়ী ধরে অধীর। দু'একটা প্রশ্ন করে। রোগিণীর মৃদু কণ্ঠের জবাব শোনামাত্র চমকে ওঠে সে, তার হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে রোগিণীর জ্বরতপ্ত হাতখানি।

অধীরের মনের বিস্মৃতির কালো পর্দাটা ন'ড়ে উঠল যেন।

অধীরের একচেটিয়া প্র্যাক্‌টিস এই সব মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলোতে। তা ছাড়া পাকিস্থান হবার পর ক'ঘর হিন্দুই বা আছে এ তল্লাটে। তাই মুসলমান মেয়েদের বাক্যবিন্যাস আর উচ্চারণভঙ্গী তার অতি পরিচিত। কিন্তু এ মেয়েটির কথা ত মোটেই তাদের মত নয়

মনে যদি বা সন্দেহ জাগল, বাইরে সেটা প্রকাশ হতে দিল না অধীর। পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াদালি শেখ, বাঘের মত দু'চোখ দিয়ে লক্ষ্য করছে অধীরের প্রত্যেকটি আচরণ।

রোগ সামান্য। অল্পক্ষণেই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

ফিরবার সময়ে—ইয়াদালি যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে দরজার দিকে মুখ করে, তখন শেষ বারের মত রোগিণীর মুখের দিকে একবার তাকাল অধীর। আর ঠিক সেই সময়েই শয্যাশায়িনীর নিরাভরণ হাত দু'টি উঠে মুখের ঘোমটাটি সরিয়ে দিল ক্ষণকালের জন্য।

কিন্তু অধীরের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ করে দেবার জন্য ওটুকু সময়ই যথেষ্ট।

কি ক'রে যে বাইরে এল, কি ক'রে যে ভিজিটের টাকা পকেটে নিয়ে নৌকায় এসে বসল ফের, মনে করতে পারে না অধীর। প্রেস্‌ক্রিপশনখানা লিখে দিল যেন স্বপ্নের ঘোরে।

লালে হলুদে মেশা একটি সুকুমার মুখের মস্ত চোখ দু'টো তার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে রইল।

"আদাব ডাক্তারবাবু—" কাল রং-এর ডাক্তারি ব্যাগটা নৌকার মাঝখানে সাবধানে বসিয়ে ডান-হাতের কয়েকটা আঙ্গুল কপালে ঠেকিয়ে ইয়াদালি বলে, "ভয়ের কিছু দেখলেন না ত বিবিজানের ?"

"না না, চিন্তার কোন কারণ নাই"—গ্রামোফোন রেকর্ডের মত নিষ্প্রাণ আবৃত্তি করে অধীর—"ওই পুরিয়াটা দিনে চাইরবার খাওইয়াইবা। দু'ই চাইর দিনের মধ্যেই জ্বর ছাইড়া যাইবো—" প্রসন্ন কণ্ঠে পাশে দাঁড়ানো কাসেম আলিকে ইয়াদালি বলে,—"অ কাসেম মিঞা, তুমি তাইলে ডাক্তার বাবুরে পুবাইল পৌঁছাইয়া

দেও, আমি বিবিজানেরে ওষুধ খাওয়াই গিয়া—”

নৌকা ছেড়ে দেয়।

লগি রেখে বৈঠা ধরেছে কাসেম আলি। বেলাই বিলের মাঝ-খান দিয়ে নৌকা চলেছে। দু'দিকে বোরো ধানের ঘন সবুজ গালিচাটি দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। দূরে দূরে দু'একটি বাতি ঘন অন্ধকারে দ্বীপের মত ছোট ছোট গ্রামগুলির অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। জল-ছোঁয়া ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া অধীরের চুল নিয়ে খেলা করছে—কিন্তু তার মস্তিষ্কের আগুন নেভাতে পারছে না। স্মৃতিচারণ শীল মনে চলে যায় কয়েক বছর আগের গা-ছম ছম, ভয়-ভয় দিন গুলোর মাঝে।

পাকিস্তান হবার পর সেই প্রথম দাঙ্গা। এর আগে এখানে-ওখানে ছুট্‌কো-ছাট্‌কা যা কিছু হয়েছে তা সব ছিল এর তুলনায় নস্যি। এ দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ল শহর থেকে গ্রামে, পরগণায় পরগণায়। পুবাইলও অক্ষত রইল না।

পুবাইলের মস্ত জমিদার হৃষীকেশ চৌধুরী। তাঁর পূর্বপুরুষদের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত বলে শোনা যায়। প্রজারা প্রায় সবাই মুসলমান, কিন্তু তবু পীরের চেয়ে কম সম্মান পেতেন না তাঁরা। এ হেন বংশের হৃষীকেশ চৌধুরী পাকিস্তান হবার পর একেবারে ঢোঁড়া সাপ।

ভোর না হ'তে হাজার হাজার লোক জমায়েৎ হয়েছিল তাঁর বিরাট প্রাসাদের সিংহদরজায়। বেগতিক দেখে দেউড়ির দারোয়ানরা কোথায় যেন গা ঢাকা দিল। ফটক ভেঙ্গে রৈ রৈ শব্দে লোক ঢুকল

ভেতরে। সবার হাতেই লাঠি, টাঙ্গি বা বল্লম, কারুর হাতে জ্বলন্ত মশাল।

আধ ঘণ্টাও লাগল না, শেষ হয়ে গেল সব। আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিশিখার দীপ্ত দাহে প্রভাত-সূর্যের মহিমাও যেন ম্লান হয়ে গেল।

বাড়ী-ভর্তি লোকজন আর দাঙ্গার ভয়ে অন্য গ্রাম থেকে পালিয়ে-আসা আশ্রয়প্রার্থীরা যে কোথায় গেল কেউ জানতে পারল না।

শুধু একজনের কথা জানতে পারল অধীর ডাক্তার। দাঙ্গা-বাজরা যত হাঙ্গামাই করুক. ডাক্তারের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিল না। এ তল্লাটে অধীর ডাক্তারের মত জমাট প্রাকৃটিস আর কোন ডাক্তারের নেই। তার এই পেশাই দুর্ভেদ্য বর্মের মত সব আঘাত থেকে রক্ষা করল তাকে।

জমিদার বাড়ী লুটের দিন ব্রাহ্মণ-গাঁ গিয়েছিল একটা জরুরী কল-এ। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। পূবাইল বাজারে নৌকা থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল রোগীর বাড়ীর লোকজন।

সেদিন হাটবার নয়। জনহীন-পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড বাজারটি যেন একটা ভূতুড়ে বাড়ীর মতই অবাস্তব। বড় বড় চালাগুলোকে আশ্রয় ক'রে তরল ফিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। তারই পাশ দিয়ে এগিয়ে নির্জন কাঁচা রাস্তা দিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরল অধীর। ষ্টেশনের কাছেই তার বাড়ী।

নির্জন পথের দু'ধারে মস্ত মস্ত গাছের বিশাল ছায়া প'ড়ে অন্ধকার রাস্তাটিকে আরও অন্ধকার ক'রে তুলেছে। দিগন্ত রেখার অল্প ওপরে-থাকা বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ আলোটুকুও যেন শুষে নিয়েছে

ওরা। মাঝে মাঝে মট্‌খুইল্যার ঝোপ, বেত-বন আর বাঁশ-ঝাড়।

এমনি একটা বাঁশ-ঝাড়ের কাছাকাছি আসতেই পা দুটো আপনা থেকেই থেমে গেল অধীরের।

কান খাড়া ক'রে দাঁড়াল সে চুপ ক'রে।

ঠিক। ভুল হয় নি তার। মৃদু গোঙানির শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে বাঁশ-ঝাড়ের নিবিড় অন্ধকারের ভেতর থেকে।

সাবধানে এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে গেল অধীর। আন্দাজ ক'রে টর্চের আলো ফেলল,—একটা রুপালি তীর যেন জমাট অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

চোখ আর ফেরাতে পারল না সে।

প্রস্ফুটিত পদ্মের জীবন-রসবাহী মৃণালটি আধাআধি কেটে ফেললে তার যে দশা হয়, এ মেয়েটিরও ঠিক সেই দশা। তবু কি আশ্চর্য রূপ তার। কাদা মাখা হীরকখণ্ডের মত বনতল আলো করে রয়েছে।

আরও কাছে এগিয়ে গেল অধীর।

চোখ দুটো বোঁজা, মৃতের মত বিবর্ণ মুখ, মাঝে মাঝে বিভক্ত ওষ্ঠাধর থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ উঠছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটি। পরণের দামী শাড়িটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া আর রক্তমাখা। অধীরের মনে হ'ল, যেন তার সিঁথির জ্বলজ্বলে সিন্দুর-টুকুই পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার সমস্ত শাড়িতে।

উবু হয়ে ব'সে নাড়ী দেখল অধীর। চোখ টেনে তার ভেতরটা দেখল। তারপর তার বিপর্যস্ত শাড়িটা ঠিক ঠাক ক'রে অতি সন্তর্পণে তাকে তুলে নিয়ে বাড়ী এল অধীর।

শোবার ঘরে বিছানায় শুইয়ে জলের ঝাপ্টা দিয়ে দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনল মেয়েটির। ইন্‌জেকশন দিল দুটো, কয়েক ফোঁটা ভাইনামগেলিশিয়া ঢেলে দিল মুখে।

ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্নতা কেটে যায়, জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে অধীরকে সামনে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চায় মেয়েটি।

"উইঠো না, উইঠো না"—ব্যস্ত হয়ে অধীর বলে, "এখনও খুব দুর্বল তুমি—"

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে থেকে এদিক-ওদিক তাকায় মেয়েটি, ক্লান্ত সুরে বলে, "আমি কোন্‌খানে? আপনি কে? এইখানে আইলাম কেমনে?"

"আমি অধীর বোস. রাস্তায় অজ্ঞান পাইয়া তোমারে তুইলা আনছি আমার ঘরে।"

"অধীর বোস? ডাক্তার?" ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি বলে।

"হ, হ,—চেন নাকি আমারে?" মেয়েটির মুখের ওপর ঝুঁকে অধীর বলে. "কিন্তু তোমারে ত চিনলাম না?"

বিহ্বল বিমূঢ় চোখের পাতা দুটি তির তির করে কাঁপে, সারা দিনের অকথ্য অত্যাচারের স্মৃতির বেদনায় বিবশ হয়ে যায় তার মন, বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে দু'চোখ থেকে, অসীম মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মেয়েটি। তারপর হঠাৎ উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে যায় অধীর।

অধীরের সুচিকিৎসায় আর শুশ্রূষায় দিন-তিনেকের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে মেয়েটি। আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে তার আগুনের মত

রূপ। আস্তে আস্তে তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসটুকু সংগ্রহ করে অধীর।

জমিদার হৃষীকেশ চৌধুরীর ছোট ছেলের বউ এই বেলা। অনেক খুঁজেপেতে রূপসী বউ ঘরে এনেছিলেন হৃষীকেশ। সে বিয়ের ভোজের কথা আজও মনে আছে অধীরের।

দাঙ্গা হাঙ্গামার পুরো ছবিটি ফোটাতে পারল না বেলা। তবু যেটুকু বলল তা শুনেই অধীরের শরীরের রক্ত টগ বগ করতে থাকে প্রত্যেকটি সক্ষম পুরুষকে মেয়েদের আতঙ্ক বিহ্বল চোখের সুমুখে দা, টাঙি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছে গুণ্ডারা, তার পর লুটের মালের মতো ভাগ ক'রে নিয়ে গেছে মেয়েদের।

কিন্তু বেলার বেলায় ঘটল ব্যতিক্রম। পর পর অনেকে মিলে বেলার নারীত্বের চরম অবমাননা ঘটাবার পর কে তাকে দখল করবে এ নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া। সে মামলা মিটবার আগেই চারদিকে রব উঠল—"পুলিস—পুলিস!"

বেলাকে একটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল নরপশুর দল, আর তার একটু পরেই ভগবৎ-প্রেরিত দূতের মত আবির্ভাব হ'ল অধীরের।

দু'চোখ-ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে অধীরের মুখে তাকায় বেলা। সে সময়ে অধীর তাকে উদ্ধার না করলে আরও যে কত দুর্গতি হ'ত তার তা কল্পনা ক'রে ভয়ে শিউরে ওঠে সে।

কয়েক দিনের মধ্যেই অধীর লক্ষ্য করে যে, ভিন্ গাঁয়ের কয়েকটি মুসলমান ছোকরা পূবাইলে এসে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘোরাঘুরি

করছে, শিকারী কুকুরের মত কিসের যেন সন্ধান করছে। ব্যাপার বুঝতে আর বাকী থাকে না অধীরের। বেলাকে পাবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে ছোকরাগুলো। যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে যে বেলা বর্তমানে তারই আশ্রয়ে আছে, তা হলেই ত সর্বনাশ!

আতঙ্কে রাত্রে ঘুম হয় না অধীর ডাক্তারের। বহুদিন বিপত্নীক সে। সংসারে এক ভোলার মা ছাড়া আর কেউ নেই তার। তবু প্রাণ আর সম্পত্তির মায়া বড় বেশী অধীর ডাক্তারের।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে যায়।

আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে বেলা। নতুন জীবনযাত্রার প্রণালীতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সে। কিন্তু ভাবনায় পড়ে অধীর। কোথায় কার কাছে পাঠাবে তাকে? তার এই নির্জন বাড়ীতেই বা কি ক'রে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়া তরুণীকে রাখবে সে? মেয়ে ত নয়, এ যে আগুনের ফুল্‌কি। কখন প্রলয় ঘটাবে কে জানে! চারদিকের গ্রাম থেকে রোজই নতুন নতুন দাঙ্গা আর লুঠের খবর আসছে, এর মধ্যে বেলাকে পথে বার করাও বিপজ্জনক।

ভয়ে দিনের বেলা ঘর থেকে বার হয় না বেলা। জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ ক'রে ঘরের অন্ধকার কোণে ব'সে ব'সে আকাশ পাতাল ভাবে। সীমাহীন আতঙ্ক তার দুঃসহ শোককে গ্রাস করে ফেলেছে। তার সুখ আর শান্তির নিকেতনটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য, কিন্তু চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে তার দেহে আর মনে। অন্য সবার মত মৃত্যু এসে তার সব ভাবনার ইতি করে দিল না কেন, মনে মনে ভাবে বেলা; কেন তাকে রেখে গেল নিষ্ঠুর পৃথিবীর কুটিল স্রোতে খড়কুটার মত ভেসে যেতে।

অধীর ডাক্তারের কাছে তার এ আশ্রয়টুকু যে নিতান্তই সাময়িক, মনে মনে এ কথাটি কেমন ক'রে যেন বুঝে নিয়েছে বেলা। তাকে নিয়ে ভদ্রলোক বিব্রত, সন্ত্রস্তা।—শুধু তাঁর বিবেকের অনুশাসনের স্থায়িত্বের ওপরেই নির্ভর করছে তার এখানকার স্থিতিকাল। ভয় আর আতঙ্কের সর্বনেশে চেহারাটা কয়েকদিন আগে বেশ ভাল করেই দেখেছে বেলা, তা' থেকেই বুঝে নিয়েছে যে ধর্ম, বিবেক আর কর্তব্য-জ্ঞান পুষ্ট হয়ে ওঠে নিশ্চিন্ত শান্তির বারি সেচনেই। কিন্তু পৃথিবীর ক্রূর, আদিম বৃত্তিগুলির রক্তচক্ষুর সামনে এলে ভয়ে কুঁকড়ে যায় তারা, লুপ্ত হয়ে যায় দগ্ধ মরুর হাহাশ্বাসে এক বিন্দু শিশিরকণার মত।

আর ঠিক এই কথাগুলিই ক' দিন ধ'রে ভেবেছে অধীর। তার চারদিক্ ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার মানুষ, যাদের সঙ্গে ধর্ম এবং আচারের বিপুল পার্থক্য রয়েছে তার। যে বৃহৎ মানবতাবোধ পৃথিবীর সব মানুষকেই এক ব'লে ভাবতে শেখায়, তা' যেন এদের মনের অন্ধকার গুহায় হারিয়ে গেছে। নিছক নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরেই অধীরকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারা—জিয়ল মাছের মত যত্ন ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছে। যে মুহূর্তে ওরা টের পাবে যে, তাদের মুখের গ্রাস বেলা এসে লুকিয়ে আছে তার বাড়ীতে, সেই মুহূর্তে তাদের অমায়িকতার মুখোশ খসে পড়বে, আর তখনি অন্য সব ক্ষেত্রের মত মশাল জ্বেলে দল বেঁধে—আর ভাবতে পারে না অধীর। বোবা অন্ধ আতঙ্কের সাঁড়াশি-হাত দুটো তার মনের টুঁটি চেপে ধরে। নিদ্রা-বিহীন শয্যায় শুয়ে ছট্‌ফট করতে থাকে অধীর।

সকাল বেলা।

বাইরের ঘরের ডিস্‌পেনসারিতে বসে আছে অধীর।

গাছের লম্বা ছায়াগুলো ক্রমে ছোট হয়ে আসছে, এমন সময়ে ইন্‌জেকশন নিতে আসে বুড়ো হাসিম শেখ। বাইরের রুগী দেখবার ঘরে অধীরের মুখোমুখি কাঠের বেঞ্চিটার যেখানটায় বসল হাসিম, সেখান থেকে অধীরের ভেতরের উঠানের সামান্য অংশ চোখে পড়ে খোলা দরজা দিয়ে।

এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকিয়ে একটু ইতঃস্তত করে হাসিম শেখ। মেহেদী-রাঙানো লম্বা দাড়িতে হাত বুলায় কয়েকবার। তারপর একটু কেশে সামনে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে, "আবার বিয়া করলেন নাকি ডাক্তারবাবু?"

"এ্যাঁ?" একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখছিল অধীর, হাসিমের কথা শুনে ভয়ানক চমকে মুখ তুলে তাকায়। মুখের বিবর্ণতাকে চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, "কৈ—না ত!"

মৃদু মৃদু হাসে হাসিম, বলে, "আমাগো খাওয়ান লাগবো বুইলা বুঝি চাইপা যাইতাছেন? কই যে, বিয়া না করলে উঠানের ঐ শাড়িখান আইল কইথিকা?"

হাসিমের কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে তার পাশে বসা হাসান আলি মোল্লা আর চেরাগ আলি। ঘাড় বেঁকিয়ে ও-পাশ থেকে শাড়িটা দেখবার চেষ্টা করে আবদুর রউফ।

ত্রস্তে পেছনে তাকিয়ে দেখে অধীর। অন্দরে যাবার ভেজানো দরজাটা কখন যেন খুলে গেছে হাওয়ায়। উঠানে লম্বালম্বি টাঙানো দড়িতে সত্যি সত্যিই ঝুলছে বেলার চান ক'রে ধুয়ে মেলে-দেওয়া

শাড়িখানা।

কম্পিত পদে এগিয়ে দরজাটা দড়াম্ ক'রে বন্ধ ক'রে দিল অধীর। ফিরে এসে চেয়ারে ব'সে রুমাল দিয়ে ঘাড় আর কপালের ঘাম মোছে সে। শুষ্ক স্বরে হাসিম শেখকে বলে, "ও, এই শাড়িটা? ঐটা আমার আগ-পক্ষের বউ-এর শাড়ি। বাক্সের মইধ্যে বেশীদিন থাকলে পোকায় কাটে, তাই মাঝে-মধ্যে বাক্স খুইলা রইদে দেই।"

ঘাড় নেড়ে তার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার ক'রে নেয় হাসিম শেখ আর হাসান আলি মোল্লা। কিন্তু নিদারুণ সন্দেহে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যুবক চেরাগ আলি আর আবদুর রউফের চোখ। মাথা নীচু ক'রে থাকলেও কি ক'রে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে অধীর।

দুপুরে খেতে ব'সে সকাল বেলার কথাটা খুলে বলে বেলাকে। শুনে মুখের সমস্তটুকু রক্ত স'রে যায় তার, মনে হয়, যেন জয়পুরী পাথরে গড়া নিটোল সুন্দর একখানি মুখ, রক্তমাংসের গড়া মুখ ব'লে মনেই হয় না তখন।

"এখন উপায়? এতক্ষণে ত জাইনা গেছে যে, আমি এইখানে আছি।"

প্রশ্নটা যেন অধীরকে নয়, নিজেকেই প্রশ্ন করে বেলা।

"উপায় আর কি—আইজ রাতেই হামলা করতে পারে,—" শুষ্ক স্বরে অধীর বলে, "করলেই বা কি করুম, পলাইয়া যাওনেরও ত কোন জায়গা নাই।"

বেলার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে। কিছুদিন আগের সেই আগুন-রাঙা রাত্রি তার সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। মনে প'ড়ে যায় সেই দুঃসহ নির্যাতন ও

অত্যাচার। যা হোক্ একটা আশ্রয় ত পেয়েছে সে, নাই বা রইল তার ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত নিশ্চিন্ত-নির্ভর। এর থেকেও কি বিচ্যুত হতে হবে আবার ?

আর কোন কথা হয় না ওদের মধ্যে। নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে থাকে ওরা। ভাত ক'টি আঙ্গুল দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে এক সময়ে উঠে পড়ে অধীর। খাবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে তার।

অনেক রাতে কোন এক দূর গ্রামে প্রচণ্ড হল্লা শুনে তন্দ্রা ছুটে যায় অধীরের। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরের বারান্দায়। দূর উত্তরের আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা যেন আকাশকে ছুঁতে চায়। দেখে হিম হয়ে আসে তার শরীর। দূরাগত ভয়ার্ত চীৎকার ও "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে যেন মৃত্যুর ডম্বরু বাজে।

হঠাৎ চোখে পড়ে, কখন যেন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বেলা। মৃতের মত পাণ্ডুর মুখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। খোলা বিস্রস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠে।

তাকে দেখে চমকে ওঠে অধীর, কঠিন স্বরে বলে, "আবার বাইরে আইলা ক্যান ? লুকাইয়া না থাকতে কইছি তোমারে ?"

দ্রুতপদে অধীরের পাশে এসে দাঁড়ায় বেলা। শাড়ির আঁচল খ'সে পড়েছে মাটিতে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ওঠা-পড়া করছে তার উত্তুঙ্গ বুক। হিম হাতে, অধীরের হাত চেপে ধ'রে অস্ফুট শব্দে বলে, "ভয় করতাছে আমার, ঠিক এই রকম, এই রকম আগুনে জ্বইলা গেছে আমার শ্বশুরের ভিটাবাড়ী। না-জানি ওই গাঁয়ের

মানুষগুলারে কি করতাছে গুণ্ডারা—উঃ, কী ভীষণ, কী ভীষণ…”

বেলার সুন্দর মুখের দিকে তাকায় অধীর, চোখের ভেতরে যেন ভয়ের সমুদ্র। অধীরের চোখে পড়ে তার স্তন দুটির আশ্চর্য সুন্দর রেখা।

ভীতা এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী আশ্রয় চাইছে তার কাছে, তার পৌরুষের কাছে। তার দেহে আছে দুর্বার আকর্ষণ, কিন্তু ভয়ে হিম রক্তে কামনার অগ্নিকণা জ্বলে না। আর্তস্বরে অধীর বলে, “এই ভাবে একদিন আমার এই বাড়ীটাতেও আগুন লাগাইবো, কেউ বাচুম না, তুমি না, আমিও না, তোমারে না পাওয়া পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইবো না অরা—তোমারে লইয়া কি করি আমি কও ত, কোনখানে পাঠামু তোমারে ?”

“যাওনের জায়গা নাই আমার,” ফিস্‌ফিস্ ক'রে বেলা বলে, “সোয়ামী নাই, শ্বশুর নাই, শ্বশুরবাড়ীর কেউ বাইচা নাই। বাপের বাড়ীতেও কি হইছে কে জানে! কই যামু আমি, কও? এইখান থেইকা বাইর হওয়া মাত্র শ্যাষ কইরা ফ্যালাইব আমারে।”

“কিন্তু আমিই বা কেমনে রাখি তোমারে কও ? অরা একবার ট্যার পাইলে কি আর ছাইড়া দিব আমারে ? তখন আর ডাক্তার বইলা খাতির করব না—” বিরক্ত হয়ে অধীর বলে।

তার এ কথা শুনে এতটুকু হয়ে যায় বেলা। অধীর তার জীবনদাতা। শুশ্রূষা ক'রে, ওষুধ দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে তাকে। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তার।

হঠাৎ সব সমস্যা সমাধানের চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎরেখাটি চোখে পড়ে বেলার। এই ত, হাতের কাছেই ত মীমাংসা রয়েছে,—ফিস্-

ফিস্ ক'রে অধীরকে বলে, "বিয়া কর আমারে।"

"বিয়া!" হঠাৎ যেন সাপ দেখে অধীর। অন্যোপভুক্তা মেয়েটির বড় বড় চোখের ভেতর তাকিয়ে তার কথার সম্যক্ অর্থ আহরণের চেষ্টা করে।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করে অধীর, সুমুখে-দাঁড়ানো রূপসী মেয়েটি নিজে যেচে তার কাছে সর্বস্ব নিবেদন করতে এসেছে কিন্তু তার বুকে উল্লাসের জোয়ার উঠছে না কেন? কেন শোনামাত্র বেলাকে বুকের ভেতর চেপে পিষে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না?

যেন কিসের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে এক ছুটে নিজের-ঘরে এসে দাঁড়ায় অধীর, হাঁপাতে থাকে।

না, প্রেম, ভালবাসা নয়, শুধুমাত্র বাঁচবার তাগিদে, সব কিছু বিকিয়ে নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি চায় তার কাছে বেলা। এ নারী কিছুই দিতে পারবে না তাকে, এ শুধু নিতে চায়।

অধীরের পেছনে পেছনে আসে বেলা। তার দু' চোখভরা প্রত্যাশা ও বাঁচবার অবলম্বনের আশার আলো জ্বলছে।

আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে অধীর—"না, না—তুমি তোমার, —তোমার ঘরে যাও বেলা—এ আমি পারুম না—এ আমি পারুম না—"

অধীরের উত্তেজনায় বিকৃত মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে বেলা, কি যেন খোঁজে সেখানে।

কিন্তু আশ্রয়ের কোনও আশ্বাসই নেই সেখানে।

অপমানে কালো হয়ে যায় বেলার মুখ, অল্পক্ষণ নত-মুখে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চ'লে যায় নিজের ঘরে।

ততক্ষণে বক্তারপুরের ঘর-জ্বালানো আগুন নিভে গেছে। থেমে গেছে সব চীৎকার আর কোলাহল। শান্ত পৃথিবী রাত্রির কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে।

সারারাত ঘুম হয় না অধীরের। প্রত্যুষের প্রস্ফুট আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সংকল্পের দৃঢ়তা জাগে ওর মনে। ভাবে, ক্ষতি কি? ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীকে আশ্রয় দিয়ে, স্নেহ ও প্রেম দিয়ে কি পোষ মানানো যাবে না?

ঠিকই বলেছে বেলা। ওকে বাঁচাবার একমাত্র পথই হচ্ছে তাকে বিয়ে করা। ডাক্তার নিজে যদি রেহাই পেতে পারে তবে তার স্ত্রীও রেহাই পাবে নিশ্চয়। হাসিম শেখ বুঝি সেই ইঙ্গিতই করে গেল গতকাল। আশ্চর্য! এ বিষয়ে মনস্থির করতে এত সময় লাগল তার?

কিন্তু বেলাকে আর খুঁজে পায় না অধীর। ঘরে নেই, উঠানে নেই।

আতি-পাঁতি ক'রে সমস্ত সম্ভাব্য জায়গা খুঁজল অধীর পাগলের মত। পুকুর পাড়, বিলের ধার, কোন জায়গা বাদ দিল না।

কোথাও নেই বেলা।

নিজেকে সরিয়ে দিয়ে অধীরের ভীরু প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে বেলা, তার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেছে।

জলো-বাতাসে ধান গাছের পাতাগুলো কাঁপছে। কচুরীপানার পাশ ঘেঁষে নৌকা যাবার শব্দ হচ্ছে—সর্ সর্—সর্ সর্—সর্ সর্···

ইয়াদালীর 'বিবিজানের' লালে হলুদে মেশা মুখখানা অধীরের চোখের সুমুখে ভেসে উঠল, তার মনে হ'ল, যেন তার জীবনের শান্তি আর সুখ চিরদিনের জন্য স'রে গেছে তার কাছ থেকে। অসহ্য মর্মদাহ তার বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খেতে থাকে।

তবু, এ কথাটা ভেবে তৃপ্তি পেল অধীর যে, এতদিনে নির্ভর করবার মত আশ্রয় পেয়েছে বেলা।

ভালোবাসা

ভোঁতা নাকের দু' পাশে ছোট চোখ দুটো পিট পিট করছে। লম্বা কান দুটি তীরের মতো তীক্ষ্ণ ঋজুতায় খাড়া হয়ে আছে; মখমলের মতো নরম, হালকা-খয়েরী বড়ো বড়ো লোমে ভর্তি সারা গা। দেখে খুব ভালো লাগলো সাবিত্রীর, টপ করে তুলে নিয়ে চেপে ধরল বুকের কাছে। ছোট টকটকে লাল জিভ বার করে ওর হাতটা ছোঁবার চেষ্টা করে বাচ্চাটা।

"নৈকষ্য কুলীন বংশ, বুঝলি সাবিত্রী, খাঁটি এ্যালসেশিয়ান—" বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার দাদা সামনে দাঁড়িয়ে শক্ত-ক্রীজ্ প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গর্বদীপ্ত মুখে বলে চললেন,—"শুধু তোর মুখ চেয়েই চেয়ে নিলাম আমাদের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিষ্টার হাড্স্পেথের কাছ থেকে—"

ঈজিপ্সিয়ান সিগারেটে লম্বা টান দেন সেন সাহেব। বারান্দায় সারি সারি টবে ফোটা নীল ক্রিসেন্থিমামের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় নীলাভ ধোঁয়া, সে দিকে তাকিয়ে বলেন,—"য়ু-কে থেকে এই বাচ্চাটার মাকে নিয়ে এসেছিল মিসেস হাডস্পেথ, এখানে এসে বাচ্চা হ'ল,—সবে তো দিন পনেরোর হ'ল, এক বছর পরে দেখবি

কি চেহারা হয় এটার—"

শুনে হাসি মুখে উজ্জ্বল চোখে সেন সাহেবের মুখে তাকায় সাবিত্রী, তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো বাচ্চাটার মাথার ঘন লোমের ওপর দিয়ে খেলতে থাকে।

কুঁই কুঁই করছিল বাচ্চাটা সাবিত্রীর কোলে, মাটিতে নামিয়ে দিতেই গুটি-গুটি হেঁটে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বাগানে ঢুকলো, তারপর ব্ল্যাকপ্রিন্সের ঝিরি ঝিরি ছায়াতে বসে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে।

ভাই-বোনে সস্নেহে চেয়ে রইল সে দিকে। সাবিত্রীর মুখে চোখে খুশীর দীপ্তি খেলা করতে লাগলো।

ঠিক ঠিক ফলে গেল সেন সাহেবের ভবিষ্যৎ-বাণী। এক বছরের পল এখন যেন ছোটখাটো একটা বাঘ। তার ভয়ে সাবিত্রীদের বিরাট বাগানের ত্রি-সীমানায় আসে না কেউ। সাবিত্রী ছাড়া আর কাউকে পরোয়াই করে না পল। সাবিত্রী ওকে নিজের হাতে নাওয়ায়, খাওয়ায়। কলেজ থেকে ফিরে এসে চেনে বেঁধে পল কে নিয়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, আর তখন প্রচণ্ড টানে সাবিত্রীকে রীতিমতো দৌড় করিয়ে ছাড়ে পল।

মিষ্টার সেন ব্যারিষ্টারী সুলভ তিতিক্ষাভরে আদরিণী কন্যার পল-প্রীতি লক্ষ্য করেন আর তার ছোটখাটো দৌরাত্ম্যগুলো সহ্য করেন, কিন্তু মিসেস সেনের মোটেই ভালো লাগে না এ সব। এই দুর্দান্ত বাগ না-মানা কুকুরটার ওপর আন্তরিক বিরাগ তাঁর প্রথম থেকেই। বাগানে একটু বেরুবার উপায় নেই, হুশ্ করে

কোত্থেকে একছুটে সামনে এসে দাঁড়ায় পল, পেছনের দু' পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো তাঁর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, ভীষণ ভয় পান তিনি।

সহজাত হিংস্রতা যেন কুকুরটার সর্বাঙ্গে লিপ্ত। এই তো সে দিন, ডাইং-ক্লিনিং এর ছোকরাটা কাপড় নিয়ে আসছিল। সিঁড়ির কাছে বারান্দায় চেনে বাঁধা পল ছিল বসে। ছোকরাটা বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র এক লাফে সামনে এসে গ্যাঁক করে কামড়ে ধরল ওর পায়ের মাংসল ডিম। পরিত্রাহি চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল ছোকরাটি। বাবুর্চি বেয়ারা সবাই এলো ছুটে, মিষ্টার সেন তাঁর চেম্বার থেকে নেমে এসে কতো চেষ্টা করলেন ছাড়াতে, কিন্তু এ যেন কুমীরের কামড়, ছাড়ে না কিছুতেই। গোটা বারান্দা রক্তে গেল ভেসে। গোলমাল শুনে ওপরের পড়ার ঘর থেকে সাবিত্রীও এলো ছুটে আর তার এক ধমকেই নিতান্ত নিরীহ জীবের মতো মাথা নীচু করে সরে গেল পল।

এক শ' টাকা দণ্ড দিয়ে আর ছোকরার হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে রেহাই পান সেন-দম্পতি।

কতোবার মিসেস সেন সাবিত্রীকে বলেছেন,—"সাবি, দিয়ে দে যার কুকুর তাকে, শেষটায় একটা অঘটন ঘটাবে তোর পল—"

কিন্তু এ সব কথা কানেই তোলে না সাবিত্রী। এমন একটা হিংস্র দুর্দান্ত পশু ওর একটু চোখ রাঙানীতেই স্তব্ধ হয়ে যায় আবার ওর সামান্য ইঙ্গিতেই ছুটে আসে, এই অনুভূতিটা যেন ওর মনের গোপন প্রভুত্ব-প্রয়াসী সত্তার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

যেমন তাকে ভয় করে তেমনি আবার ভালোও বাসে পল।

মৌন ভালোবাসা ফুটে ওঠে ওর হাঁটা, চলা আর চাউনীর ভেতর দিয়ে।

পুজোর ছুটিতে হাইকোর্ট বন্ধ। সস্ত্রীক সকন্যা দার্জিলিং গেলেন সেন সাহেব। সঙ্গে গেল পল।

এর আগেও দু' তিনবার দার্জিলিং এসেছে সাবিত্রী, কিন্তু পলের পক্ষে দার্জিলিং একেবারে নতুন। পশুসুলভ অতীন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে বুঝিবা পেল অদেখা মাতৃভূমির তুষার শীতল আবহাওয়ার ঘ্রাণ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল সে। মহাকাল পাহাড়ের চারপাশের পথে চক্কর দিয়ে, নর্থ পয়েন্ট কলেজ পর্যন্ত ধাওয়া করে, জলা-পাহাড়ের খাড়াই ধরে তীরবেগে ছুটে দু' চার দিনেই হাঁফ ধরিয়ে দিল সাবিত্রীকে। জোড়ায় জোড়ায় খাঁটি ইংরেজ নরনারী আর আধা ভারতীয়রা বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, ঈর্ষা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে সাবিত্রী আর পল্‌কে। তাদের চোখের তারায় যে অকুণ্ঠ প্রশংসার বাণী ফুটে ওঠে, তা পড়ে নিতে একটুও দেরী হয় না সাবিত্রীর। আনন্দে-গর্বে ভরে ওঠে তার মন, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার শ্রম-রক্তিম মুখ।

টাইগার হিল এ সূর্যোদয় দেখতে গিয়েই শুভদৃষ্টি হল ওদের দু' জনের। সত্যবান রায়ও এসেছিল সূর্যোদয় দেখতে, কিন্তু সাবিত্রীর দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি আর ফেরাতে পারল না সে।

বোতল-সবুজ মহীশূর সিল্কের সাড়ির ওপর হাতায় কাজ করা টকটকে লাল ওভার কোট, পায়ে লাল রং এর হাই হিল্ জুতো,

এতটা খাড়াই ভেঙ্গে আসার গুরু পরিশ্রমে গাল দুটিও টুকটুকে লাল,—যেন নবোদ্ভাসিত সূর্যের কিরণ-বন্যায় ভেসে-আসা কোন লাল পরী।

দূর উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার সর্বাঙ্গ তখন স্বর্ণরেণুতে লিপ্ত, নিচের কালো পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায় শ্বেতশুভ্র কুয়াসার গুণ্ঠন। স্বল্পপত্র দীর্ঘ পাইনের শ্রেণী চারদিকে এক মৌন অবরোধ রচনা করে রেখেছে।

সাবিত্রীর দিকে এক পা এগিয়ে গেল আত্মবিস্মৃত সত্যবান। হঠাৎ গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল, তাকিয়ে দেখল সাবিত্রীর পায়ের কাছে প্রকাণ্ড এক এ্যালসেশিয়ান জিঘাংসু চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

অনির্ণেয় ক্রূরতা মাখা সেই চোখ দুটি দেখে ধড়াস করে উঠলো সত্যবানের বুক।

"এই পল, কি হচ্ছে?" সুস্মিত হেসে নত চক্ষে পল্‌কে ধমক দিল সাবিত্রী।

"আপনার কুকুর বুঝি? হাউ লাভ্‌লি—" জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে সতর্ক চোখে কুকুরটাকে লক্ষ্য করতে করতে সত্যবান বলল।

কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল সাবিত্রী, এমন সময়ে নিচে থেকে ভেসে এলো মিসেস সেনের কণ্ঠস্বর,— "সাবি, চা খাবি আয়—"

টাইগার হিলের চূড়ার ওপর ওরা তিন জন, সেন দম্পতি নিচের চারদিক খোলা ঘরখানায় কাঞ্ছাকে নিয়ে চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত।

আড়চোখে সত্যবানের দিকে তাকিয়ে নামবার জন্য পা বাড়িয়েও

দাঁড়িয়ে থাকে সাবিত্রী আর শিষ্টাচারের চরম ত্রুটি ঘটিয়ে বলে ওঠে সত্যবান,—"আপনার মা ডাকছেন বুঝি? চলুন, নামা যাক—"

নীচে নেমে মিষ্টার সেনের অনুরোধ আর এড়াতে পারে না সত্যবান। ধূমায়িত সোনালি চা-এর পেয়ালাটা সাবিত্রী এগিয়ে দেয় তার দিকে। চোখে চোখে চেয়ে একটু হেসে পেয়ালাটা হাতে নেয় সত্যবান।

গল্প জমে ওঠে, প্রকৃতি, বিশ্ব সমস্যা, স্পুৎনিক, এ সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে ব্যক্তিগত গণ্ডীর দিকে মোড় নেয় ওদের আলোচনা। ধরা পড়ে যে মিষ্টার সেনের বড়ো ছেলে দিব্যেন্দুর সঙ্গে গ্লাসগোতে পরিচিত হয়েছিল সত্যবান।

"তাই নাকি? বেশ বেশ, বড়ো খুশী হলুম তোমার দেখা পেয়ে—" চুরুট ধরিয়ে অনুমোদনের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়েন মিষ্টার সেন।

"কলকাতায় থাকো নিশ্চয়ই—" টিপট থেকে আর এক কাপ চা ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করলেন মিসেস সেন।

"না, আমি থাকি ম্যালাড্, বোম্বে—" বিনীত সুরে জবাব দিল সত্যবান।

তার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ দুটি একবার তুলেই আবার নামিয়ে নিল সাবিত্রী।

সামান্য দু' চারটা ব্যারিষ্টার-সুলভ জেরায় সত্যবানের হাড়হদ্দ জেনে নেন মিষ্টার সেন। এই তরুণ বয়েসেই প্রখ্যাত এক বিলিতি ফার্মের ওয়ার্ক্‌স্ ম্যানেজার সত্যবান। অনুমোদনের হাসিটুকু প্রশস্ততর হয়ে ওঠে মিষ্টার সেনের সৌম্য মুখে।

নিজের ট্যাক্সিকে বিদায় দিয়ে মিষ্টার সেনের সঙ্গে তাঁরই ট্যাক্সিতে দার্জিলিং ফিরল সত্যবান। সেন দম্পতির অনুরোধ এড়ানো বড়োই কঠিন।

'ঘুম' পার হবার সময়ে সত্যবানের মনের ঘুমও যেন ভেঙ্গে গেল। দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো তার পাশে বসা সাবিত্রীর মুখের একাংশ মাত্র দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু তা-ই যেন মুগ্ধ বিস্ময়ের মায়া অঞ্জন বুলিয়ে দিল ওর দু' চোখে। এতদিনে ও যেন খুঁজে পেয়েছে ওর পরম শ্রেয়।

মাউন্ট এভারেষ্ট হোটেলের পাশাপাশি দুটি স্যুইটের অস্থায়ী বাসিন্দা দু' জনের মধ্যে সুমধুর পরিচয়ের কলিকাটি আস্তে আস্তে ফুল হয়ে ফুটে উঠলো। তার মৃদু সুগন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল দুটি মুগ্ধ হৃদয়। দীর্ঘ দেহ, সৌম্য ফিটফাট সত্যবানের অজস্র হাসি আর কথায় কথায় তীক্ষ্ণ পরিহাসের স্রোতে যেন ভেসে যায় সাবিত্রী। নব অনুরাগেব গাঢ় দীপ্তিতে ঝলমল মনে আবেশ ঘনায়। শীতের শহরেও বসন্তের বাণী শুনতে পায় ওরা। দুটি হৃদয়ের কাছাকাছি আসার চিরন্তন কাহিনী রচনার মাঝে সময় যায় হারিয়ে।

বার্চ হিলের গুল্ম বিতানের নিভৃতে বসে সাবিত্রীর একটা হাত ধরে সত্যবান বলে,—"কিন্তু একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে সাবিত্রী, বলো রাখবে--" দুরু দুরু কাঁপে সাবিত্রীর বুক। বারে বারে রং পাল্টায় তার মুখ।

সত্যবানের ফর্সা মুখও লাল হয়ে ওঠে। একটু যেন দ্বিধা করে

কিন্তু পরক্ষণেই সব সংশয় সবলে কাটিয়ে উঠে জোর দিয়ে বলে ওঠে, "আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মাঝে পলের যেন কোনো স্থান না থাকে—"

সাবিত্রীর আবেগে থরো থরো মনে চমক লাগে, কিন্তু আশ্চর্য হতে গিয়েও হতে পারে না সে। তার মনের অস্পষ্ট অন্ধকারে সে যেন সত্যবানের এই অনুরোধটিই প্রত্যাশা করছিল।

পল্-এর অনুরাগ বা বিরাগের অভিব্যক্তি অতিশয় স্পষ্ট। প্রথম দিন থেকেই সত্যবানকে বিষ নজরে দেখেছে সে। কোথাও সাবিত্রী আর সত্যবানকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে বা দাঁড়াতে দেখলেই রাগে গোঁ গোঁ শব্দ করে ওঠে, মাঝে মাঝে সত্যবানকে আক্রমণ করবার তালে থাকে, শুধু সাবিত্রীর সতর্কতার জন্যই পারে না। তার প্রতি সাবিত্রীর ক্রমবর্ধমান ঔদাসীন্য আর অবহেলার ভাবটিও টের পেয়েছে পল, কি ভাবে যেন বুঝতে পেরেছে যে সত্যবানের আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গেই রয়েছে এর একটা নিগূঢ় যোগ। পল আর এখন বেড়াবার প্রিয় সঙ্গী নয়, সাবিত্রীর সঙ্গী হয় সত্যবান। চেন্-এ বাঁধা পল আক্রোশ ভরা দুই চোখে তাদের বাগান পেরিয়ে রাস্তায় পা দেওয়া দেখে। সাবিত্রীর যতো হালকা হাসির টুকরো, পাগলা-ঝোরার মতো স্বতঃ উৎসারিত আনন্দধারা, তার দুই চোখের চাপা বিদ্যুৎ সব কিছুই দখল করেছে সত্যবান। পল এখন আর তার ছিটে-ফোঁটাও পায় না, তাই উৎকট ক্রমবর্ধমান ক্রোধের আবেশে ছটফট করে সে,—হ্যাঁচ্কা টানে ছিঁড়ে ফেলতে চায় শেকলটা।

সত্যবানও পছন্দ করে না পল্‌কে। প্রথম প্রথম দু' এক দিন

যদিও সাবিত্রীর সঙ্গে সদ্য স্থাপিত সখ্যসূত্রের খাতিরে পলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আদর করতে চেয়েছে, কিন্তু পলের উগ্র চোখ দুটো দেখে আর এগুতে সাহস পায় নি, আর সে দৃশ্য দেখে সাবিত্রীর লুটিয়ে লুটিয়ে হেসে গড়াগড়ি খাওয়াটাও মনে মনে সমর্থন করে নি।

সত্যবানের মনের সেদিনের সেই মৃদু অপছন্দই আজ ঘোর বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। এখন সাবিত্রী যদি এক মুহূর্তও পল্‌কে আদর করে তাহলেও অন্ধকার ঘনায় সত্যবানের উজ্জ্বল ঝকঝকে মুখে।

তাই বার্চহিলের গুল্মবিতানের নিভৃতে এই প্রেমবিহ্বল মদির মুহূর্তেও এমন একটা নিরেট গদ্য প্রস্তাবের অবতারণা করতে এক-টুকুও ইতস্ততঃ করে না সত্যবান।

আর, আজই হোক বা কালই হোক, এ ধরনের একটা প্রস্তাব যে সত্যবান করবে,—দুই প্রিয়র মধ্যে প্রিয়তরটিকে বেছে নিয়ে অপর প্রিয়কে যে চিরকালের মতো বিদায় দিতে হবে,—এ আশঙ্কা বাসা বেঁধে ছিল সাবিত্রীর মনেও।

তবু সত্যবানের প্রস্তাব শুনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উদ্বেলিত চিত্তকে শান্ত করবার চেষ্টা করল সাবিত্রী। মনের পটে ছায়াছবির মতো পল্-এর অসংখ্য দুষ্টুমী, তার ভালোবাসার হাজার অভিব্যক্তি, তার অভিমান, আনন্দ-বেদনার ছবি ভেসে ওঠে,—মিলিয়ে যায়।

বহুদূরে অটল-মহিমা কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র শিখরদেশে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানিমা ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে,—একটু পরেই

চোখের আড়ালে চলে যাবে স্বর্ণ-শিখর তুষার কিরীট। কাছে দূরে সারি সারি পাইন গাছের দীর্ঘ অরণ্য লেপে মুছে একাকার হয়ে আসে।

তখন মুখ ফিরিয়ে ধরা গলায় সাবিত্রী বলে,—"বেশ তো, তোমার যখন তা-ই ইচ্ছে, তখন তাই হবে। কিন্তু এখনি না, বিয়ের পরে,—বোম্বে যাবার আগে পল্‌কে রেখে যাবো দাদার কাছে—"

বলতে বলতে কেঁপে ওঠে সাবিত্রীর গলা।

অধীর উল্লাসে তাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে সত্যবান, জোর করে ওর ফেরানো মুখটি ঘুরিয়ে আনে নিজের দিকে, তারপর ওর থরথর কাঁপা অধর পুটে একটি সোহাগ চুম্বন এঁকে দিয়ে গভীর সুরে বলে—"আজ তুমি দুঃখ পেলে জানি, কিন্তু আমাকে যে নিশ্চিন্ত শান্তি দিলে তার তুলনায় এ দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যাবে একদিন। আমাদের দু'জনার মাঝখানে যে ছোট্ট কাঁটাটি অবিরাম খচ্‌খচ্‌ করত, আজ তাকে নিজের হাতেই তুলে দিলে তুমি সাবিত্রী!"

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজেকে সত্যবানের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নেয় সাবিত্রী।

হোটেলে ফিরে পল্‌-এর কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল সাবিত্রী। বসে ছিল পল, উঠে দাঁড়াল, সাবিত্রীর কোটের সঙ্গে নিজের গা ঘসতে লাগল, তার গলা দিয়ে আনন্দের আওয়াজ বার হতে লাগল।

সাবিত্রীর দু চোখ জলে ভরে গেল।

এর পর কয়েক দিনের জন্য হারানো সুখরাজ্য ফিরে পেল পল।

অন্তর নিংড়ে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহরসটুকু পলের তৃষিত লোলুপ হৃদয়ে ঢেলে দিল সাবিত্রী। ঝিমিয়ে পড়া পল আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ছুটি ফুরিয়ে গেল। খেয়াল খুশীর পুলক হাসির ঘটল অবসান। হৃদয়ের আনন্দ-পাত্রটি সুধারসে পূর্ণ করে সত্যবান চলে গেল বোম্বে।

সাবিত্রীকে নিয়ে মিষ্টার ও মিসেস সেন ফিরে এলেন চির পরি-চিত কলকাতায়।

সেন দম্পতি আর বিলম্ব করলেন না। স্বল্প বিরহের পরেই এসে গেল সাবিত্রী-সত্যবানের মিলনের ক্ষণটি।

বিয়ের দিন চারেক পরে।

বিকেল বেলা পল্‌কে বারান্দায় চেন দিয়ে বেঁধে রেখে ঝলমল শোভন সজ্জায় সত্যবানের সঙ্গে বেড়াতে বার হ'ল সাবিত্রী। পুষ্পসার সুরভির অণুপরমাণুগুলি গোটা বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ল। হাত ধরাধরি করে বাগানে পা দিল ওরা, কাঠের গেট খুলে নির্জন রাস্তায় পড়ল।

বাড়ির কাছাকাছি ঘন ছায়ায় ঢাকা জনবিরল পথে বেড়াতে বেড়াতে পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু নিবিড়তর ভাবে পেতে চায় ওরা, উপভোগ করতে চায়।

তীক্ষ্ণ চোখে ওদের একত্রে বেরিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে পল, সুখ আর তৃপ্তি ভরা ওদের দু'জনের উজ্জ্বল পরিতৃপ্ত মুখ দেখে কী যেন ভাবে, যতক্ষণ দেখা যায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তারপর চঞ্চল পায়ে শেকল বাঁধা থামটার চারপাশে ঘুরপাক খায়, হঠাৎ বসে

পড়ে, পায়ের ওপর সজোরে ঘসতে থাকে নাকটা।

মাইল খানেক চক্কর দিয়ে ফিরছিল ওরা। রাত্রি তার কালি-মাখা হাতখানা বুলিয়ে দিয়েছে কলকাতা শহরের বুকে। বিপরীত দিক থেকে চোখ বাঁধানো হেড লাইট জ্বেলে ছুটে আসা একটি সাদা প্লিমাথ কার হঠাৎ তাদের পাশে এসে থেমে যায়, ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে আসে ঝর্ণাধারার মতো উচ্ছল মেয়ে রীণা,—সাবিত্রীর কলেজী বন্ধু রীণা, হাস্যলাস্যময়ী।

সাবিত্রীর হাত দুটো নিজের হাতে বন্দী করে সত্যবানের দিকে একটা চঞ্চল কটাক্ষ ছুঁড়ে বলে,—"ওরে পাজী মেয়ে, চুপি চুপি বিয়ে সারা হয়েছে, আমার দিল্লী থেকে ফিরে আসা তক সবুর সইল না, না?"

হাসিমুখে সাবিত্রী বলে,—"তুই যে তোর দিল্লীওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে এত শিগগির ফিরে আসবি তা কে জানতো বল্?"

কলকল করে ওঠে রীণা,—"তোকে আর কিছুতেই ছাড়ছি না এখন—" বলে সত্যবানের মুখে তাকিয়ে রীণা বলে,—"একা একাই আপনাকে ফিরতে হবে মিষ্টার রয়, এক ঘণ্টার জন্য আমি বন্দী করলাম আপনার সাবিত্রীকে। এখন আমাদের মধ্যে যে সব কথা হবে সেগুলো হাজার অন্তরঙ্গ হলেও আপনার শোনা নিষেধ—"

"মুক্তিপণ লাগবে না তো?—যেভাবে গ্রেপ্তার করেছেন—" হালকা হাসির সুরে প্রশ্ন করে সত্যবান।

মাথা ঝাঁকিয়ে বেণী দুলিয়ে রীণা বলে,—"লাগবে বৈকি, আদায় করব কাল ফিরপোতে—"

তিন জনের সম্মিলিত হাসির শব্দে মুখর হয়ে ওঠে স্তব্ধ রাজপথ।

প্রিমাথ খানার দিকে এগিয়ে গেল পরিহাসরতা দুটি তরুণী।

এক রাশ পোড়া পেট্রোল ছড়িয়ে ছেড়ে দিল রীণার কার।

হাসিমুখে একা একাই বাড়ির পথ ধরল সত্যবান।

সূর্য ডুবে গেছে বহুক্ষণ। বহু দূরের রাস্তার ম্লান বিদ্যুতালোক সাবিত্রীদের বাগানটার সুমুখটুকু আলো-আঁধারিতে ঘিরে রেখেছে। গেট খোলার জন্য হাত তুলতেই কেন যেন সমস্ত শরীরটা একবার শিউরে উঠল সত্যবানের। দ্বিধাভরে চুপ করে দাঁড়াল একটু, তার-পর গেট খুলে বাগানের অন্ধকার পথে পা বাড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে কী একটা যেন লাফ দিয়ে উঠে ওর কণ্ঠনালী কামড়ে ধরল, আগুন-তাতে লাল হওয়া লোহার সাঁড়াশীর মতো একসার তীক্ষ্ণ হিংস্র দাঁত গলার নরম মাংসের গভীরে ডুবে গেল!

অবরুদ্ধ চীৎকারে, নিদারুণ যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে গেল সত্যবান।

* * * * * *

আশা আর সুখ ভরা মন নিয়ে, ছোট্ট একটি গানের কলি গুঞ্জরণ করতে করতে বাড়ি ফিরল সাবিত্রী। গাড়ি বারান্দায় সারি সারি লাল ক্রশ আঁকা ডাক্তারের গাড়িগুলো দেখে পলকের জন্য চলন্ত পা দুটি নিশ্চল হয়ে গেল তার। বুকটা ধড়াস্ করে উঠল।

ঘর দুয়ার সব আলোয় আলোময়। চারদিকে লোকজনের ব্যস্ততার ছুটোছুটি।

সামনেই আয়া। সাবিত্রীকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো সে, বলল,—"দিদিমণি, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ, শিগগির

ওপরে যান ; সর্বনাশ হয়ে গেল বুঝি.—দাদাবাবুর—"

পাংশু মুখে স্পন্দিত বুকে এক ছুটে দোতলায় তাদের সাজানো শোবার ঘরে পৌঁছে গেল সাবিত্রী।

তিন চার জন ডাক্তার অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন বিছানায় শোয়ানো রক্তাপ্লুত হতচেতন সত্যবানের সর্বাঙ্গে।

সাবিত্রীকে দেখেই কেঁদে উঠলেন মিসেস সেন। মিষ্টার সেন নত করলেন তাঁর বেদনাবিদ্ধ গম্ভীর মুখ।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতেই সবাই মিলে ধরাধরি করে সত্যবানের শরীরটা নিচে নামিয়ে ডাক্তার চক্রবর্তীর গাড়িতে তুলে দিল।

মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতাল লক্ষ্য করে তীর বেগে ছুটতে লাগল ডাক্তার চক্রবর্তীর গাড়ি। তার পেছনে পেছনে ছুটলো তিনটি কার।

যাবার আগে মিষ্টার সেনের মুখে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন ডাক্তার চক্রবর্তী ও ডাক্তার চৌধুরী। কণ্ঠনালী প্রায় দু' টুকরো হয়ে গেছে। কোনো ভরসাই দিতে পারলেন না তাঁরা।

পরদিন প্রত্যুষেই উলঙ্গ সত্যের মতো মৃত্যুর বার্তা এসে পৌঁছুলো।

সারারাত যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে সর্বাঙ্গে পরাজয়ের গ্লানি মেখে গাড়ী থেকে নামল সাবিত্রী।

বারান্দায় উঠতে যাবে, নজরে পড়ল থামে বাঁধা ছেঁড়া চেনটা।

আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে যেন পুড়ে গেল বুকের ভেতরটা, অশ্রুর ধারা শুকিয়ে গেল নিমেষে, বিদ্যুতের নীল শিখায় জ্বলে উঠল সাবিত্রীর দু' চোখ।